প্রকাশক—
মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী
কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৬০

মুদ্রাকর—
শ্রীগৌরহরি দাস
তারকনাথ প্রেস
২নং শিবদাস ভাদুড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

বৈদিক সাহিত্য

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে আর্য-সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে এদেশে যে সাহিত্য বিকাশলাভ করেছিল তাই বৈদিক সাহিত্য। ভারতের, শুধু ভারতের কেন পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য-সৃষ্টি ঋগ্বেদ। ঋক্‌সংহিতা ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রের সমষ্টি, কোনো ব্যক্তি এর রচয়িতা নয়। এই ঋগ্বেদের সূক্তগুলির আবির্ভাবের কাল থেকে বেদাঙ্গ রচনার শেষ পর্যন্ত সময়ে যে বিশাল সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার সবই বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে পড়ে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও শিক্ষা, কল্প (শ্রৌত, ধর্ম, গৃহ্য, শুল্ব-চারটি কল্পসূত্র,) ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি ছয়টি বেদাঙ্গ এবং বেদের সংহিতাকে অবিকৃত রাখার জন্য পদপাঠ, জটাপাঠ মালাপাঠ প্রভৃতি অষ্টবিকৃতি পাঠ ও অনুক্রমণী।

'বেদ' শব্দের অর্থ জ্ঞান (Knowledge)। এই শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে বিদ্‌ধাতু থেকে। এই ধাতুর অর্থ 'জানা'। কিন্তু বেদ শব্দের দ্বারা আমরা গ্রন্থ বিশেষকে বুঝি অর্থাৎ সেই বিশেষ গ্রন্থের সহায়তায় আমরা জ্ঞান লাভ করি। সেজন্য বিদ্‌ধাতুর উত্তর করণে ঘঞ্‌ প্রত্যয় করে বেদ শব্দ

নিষ্পন্ন করতে হয়। সায়ণাচার্যের মতানুসারে যে গ্রন্থ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের জন্য অলৌকিক কোন উপায় বলে দেয় তাই বেদ। বেদের কোন লেখক নেই। শব্দ যেমন নিত্য, বেদও শব্দস্বরূপ বলে বেদও নিত্য—বেদ স্বয়ম্ভূ।

বেদের দুটি অংশ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের তিনটি ভাগ—শুদ্ধব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। বেদ বললে মন্ত্র বা সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ—এই উভয়কেই বোঝায়। এর মন্ত্রাংশ পদ্য, ব্রাহ্মণাংশ গদ্য। বেদে আর্যাবর্তের প্রাচীনতম মহর্ষিগণের সাক্ষাৎ উপলব্ধ সত্য বিধৃত আছে। বেদের মন্ত্রগুলি যে যুগে ঋষিমানসে সত্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিল, তখন লেখন-শিল্প ছিল মানব-সমাজে অজ্ঞাত। এই মন্ত্রগুলি দীর্ঘকাল ধরে গুরুশিষ্য-পরম্পরায় স্মৃতিপথে আবর্তিত হতে থাকে। গুরুর কাছে শুনে শিষ্য মন্ত্রগুলি স্মৃতিতে বহন করত বলে বেদের আর একটি নাম শ্রুতি। বেদ অপৌরুষেয়, কারণ কোন মানুষই এর স্রষ্টা নয়- ঋষিরা দ্রষ্টা মাত্র। ঋষিমুখ থেকে প্রকাশ পেয়েছে বলে বেদমন্ত্র আর্ষেয়।

পণ্ডিতগণের মতানুসারে বেদের মন্ত্রভাগ ব্রাহ্মণভাগের অনেক আগে রচিত। এই মন্ত্র ব্রাহ্মণ মিশ্রিত বেদ চারটি—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব।

বেদ প্রথমে অখণ্ড ছিল। যজ্ঞানুষ্ঠানে হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা, এই ঋত্বিক্ চারজনের প্রয়োজনানুসারে সমগ্র বেদমন্ত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এক একটি ভাগের নাম এক একটি সংহিতা। হোতার পঠনীয় মন্ত্রে ঋক্সংহিতা,

অধ্বর্যুর জন্য যজুঃসংহিতা ও উদ্গাতার পাঠ্য মন্ত্রের সংকলন সামসংহিতা। বেদের সমগ্র মন্ত্রকে তিন ভাগে ভাগ করার জন্য বেদের অন্য নাম ত্রয়ী।

ত্রয়ী

অনেকের ধারণা প্রথমে অথর্ববেদ বেদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কারণ যজ্ঞে অথর্ববেদ ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু এতে অথর্ববেদ বেদ নয় বলে প্রমাণিত হয় না। সমগ্র বেদমন্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত থাকার জন্য বেদের নাম ত্রয়ী হয়েছে। অথর্ব ঋষির নামানুসারে চতুর্বেদ অথর্ববেদ। এতে ঋক্, সাম ও যজু—এই তিন শ্রেণীর মন্ত্রই স্থান পেয়েছে। যিনি যজ্ঞের সময় ঋত্বিক্‌দের মন্ত্রপাঠে ভুল ধরেন তিনি ব্রহ্মা, তিনি ত্রিবেদজ্ঞ অথর্ববেদী পুরোহিত।

বেদের মন্ত্র দুই শ্রেণীর—এক শ্রেণীতে বিভিন্ন দেবতার স্তব ও অপর শ্রেণীতে বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনা। প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রকে স্তুতি আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রকে প্রার্থনা বলা হয়।

মন্ত্র

বেদের ব্রাহ্মণাংশে মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও তাদের বিভিন্ন যজ্ঞে বিনিয়োগের কথা আছে। ব্রাহ্মণাংশ আবার দুভাগে বিভক্ত। যে অংশে যজ্ঞের বিধি দেয় সেই অংশের নাম বিধি আর যে অংশ বিধির প্রশস্তি জ্ঞাপন করে সেই অংশের নাম অর্থবাদ। বেদের মন্ত্রাংশে জ্ঞানের কথা আর ব্রাহ্মণাংশে আছে কর্মের কথা।

ব্রাহ্মণ

ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের নাম ঋক্ এবং ঋগ্বেদ কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি মাত্র। ঋকের যে অংশ গান করা হয়, তা সাম। ছন্দোবিহীন গদ্য মন্ত্র যজুঃ আর ছন্দোবদ্ধ কতকগুলি বিশেষ

ঋক্ অথর্বাঙ্গিরস। অথর্ববেদে ঋক্ সাম ও যজুঃ, এই তিন শ্রেণীর মন্ত্র আছে।

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ দুটি—ঐতরেয় ও কৌষিতকী আর দুটি আরণ্যক—ঐতরেয় ও কৌষিতক বা শাঙ্খায়ন।

যজুর্বেদের দুটি রূপ—শুক্ল ও কৃষ্ণ। শুক্ল যজুর্বেদ যাজ্ঞবল্ক্যের প্রচারিত ও পদ্যে রচিত আর কৃষ্ণ যজুর্বেদের অধিকাংশই গদ্য এবং বৈশম্পায়নের সমর্থিত। এই কৃষ্ণ যজুর্বেদে ভারতের প্রাচীনতম গদ্যের নিদর্শন পাই। শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণের নাম—শতপথব্রাহ্মণ।

ঋগ্বেদের যে মন্ত্রগুলি যজ্ঞে সুর-সংযোগে গান করা হত সেইগুলি সাম। এই বেদের ব্রাহ্মণ আটটি। এদের মধ্যে তাণ্ড্যব্রাহ্মণ বা মহাব্রাহ্মণ সবচেয়ে বড়।

অথর্ববেদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আগেই বলা হয়েছে। এতে ঋক্, যজুঃ সাম,—এই তিন শ্রেণীর মন্ত্র তো আছেই, তাছাড়া এতে অভিচার, ভৈষজ্য ও আরো অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে নানা ধরনের মৌলিক মন্ত্র আছে।

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সমগ্র বেদকে সাধারণভাবে বিষয়বস্তু অনুসারে ন'ভাগে ভাগ করেছেন,—যেমন, কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ড। বৈদিক সাহিত্যের যে অংশে কর্মের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তা জ্ঞানকাণ্ড। সেই হিসাবে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ মোটামুটিভাবে কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ড।

এইবার আমরা বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত প্রত্যেক বিষয় নিয়ে তাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে পৃথক পৃথক আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

ঋগ্বেদ

আর্যসভ্যতার, শুধু আর্যসভ্যতার কেন,—মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীনতম সাহিত্যকীর্তি ঋগ্বেদ। ভিণ্টারনিৎসের মতে সর্বপ্রাচীন ঋক্‌মন্ত্রের রচনা কাল ২৫০০ থেকে ২০০০ খৃঃ পূঃ অব্দে এবং মাক্সমূলারের মতে ১২০০-১০০ খৃঃ পূঃ। ডঃ রাধা-কৃষ্ণন ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বেদের সময় আন্দাজ করেন ১৫০০ খৃঃ পূঃ অব্দ। আর বালগঙ্গাধর তিলকের মতে খৃঃ পূঃ ৬০০০ অব্দ।

শাখা

বাষ্কল ও শাকল ঋগ্বেদের দুটি শাখা। কিন্তু বর্তমানে শাকল শাখাই প্রচলিত। ঋক্‌সংহিতার সূক্তগুলিকে 'অষ্টক ও মণ্ডল'—এই দুই ভাগে বিভাগ করা হয়েছে। অষ্টক বিভাগে সমগ্র ঋক্‌মন্ত্র আটটি সমান অষ্টকে বিভক্ত। মণ্ডল বিভাগে দশটি মণ্ডল। সেগুলিতে মন্ত্রের সংখ্যা সমান নয়, কম-বেশি আছে। ঋগ্বেদের সূক্ত সংখ্যায় ১০১৭ এবং এগারটি বালাখিল্য নিয়ে মোট ১০২৮টি সূক্ত আছে। খিলের অর্থ পরিশিষ্ট। মণ্ডল বিভাগই প্রাচীন।

ঋগ্বেদ কোন মানুষের বা কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে রচিত গ্রন্থ নয়, এটি সূক্তি সংকলন গ্রন্থ; এতে প্রাচীনতম থেকে পরবর্তী যুগের রচিত সূক্ত আছে।

ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডলে দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল পর্যন্ত সূক্তগুলি এক শ্রেণীতে সাজানো। এগুলির অধিকাংশ সূক্ত প্রাচীন ও এদের গোষ্ঠীমণ্ডল বলা হয়। এই মণ্ডলগুলির এক

একটির অন্তর্গত মন্ত্রগুলি এক একটি বিশেষ বিশেষ ঋষি-পরিবারে দৃষ্ট হয়েছিল। তাই এই ছয়টি মণ্ডলের সূক্তগুলি যথাক্রমে গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ ও বশিষ্ঠ—এই ছয়জন ঋষি বা তাঁদের বংশধরদের দ্বারা দৃষ্ট বা রচিত হয়েছিল মনে করা হয়।

গোষ্ঠীমণ্ডল

অষ্টম মণ্ডলের মন্ত্রগুলি কণ্ব ও অঙ্গিরা নামে গায়ক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে আরোপিত। প্রথম, অষ্টম, নবম ও দশম মণ্ডল পরবর্তীকালের রচনা বলে মনে হয়। অষ্টম মণ্ডল ঋষি-গোষ্ঠীদৃষ্ট মণ্ডল নয়, এটিকে প্রগাথ মণ্ডল বলা হয়। কারণ এর মন্ত্রসমূহ প্রগাথ নামে একটি বিশেষ ছন্দে রচিত। এই মণ্ডলের মন্ত্রগুলি কণ্ব ও অঙ্গিরাবংশীয় গায়ক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে আরোপিত। প্রথম, অষ্টম, নবম ও দশম মণ্ডলকে পরবর্তী-কালের রচনা বলে মনে করা হয়। নবমমণ্ডল সোমপবমানের স্তব ও স্তুতিতে পরিপুর্ণ। সোমরস একপ্রকার মাদকদ্রব্য পানীয়বিশেষ, এটির যাগযজ্ঞে বিশেষ ব্যবহার ছিল সেই প্রাচীন যুগে। ঋগ্বেদের প্রাণস্বরূপ ও প্রাচীনতম অংশ দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল।

দশম মণ্ডল ঋগ্বেদে সর্বশেষে সংযোজিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। এতে নানা বিষয় আছে ; যেমন—বিশ্বের উৎপত্তিতত্ত্ব, দর্শন, গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, নানাধরনের তুক্‌তাক, জাদুমন্ত্র প্রভৃতি। এই মণ্ডলের ছন্দ ও ভাষা অন্যান্য মণ্ডলের থেকে ভিন্ন ধরনের ও পরবর্তীকালের। এখানে প্রদত্ত সামাজিক রীতিনীতি ও

দশম মণ্ডল

সমাজচিত্র অন্যান্য মণ্ডলের সমাজচিত্র থেকে অনেকাংশে উন্নত। এতে পারিবারিক জীবনের ছবিও কিছু কিছু পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদ প্রধানতঃ আর্যদের বিভিন্ন দেবতাকে আহ্বানের মন্ত্র-সংকলন ও ধর্মবিষয়ক। কিন্তু দশমমণ্ডলে বহু ধর্মনিরপেক্ষ মন্ত্র আছে এবং সেগুলিতে এই মন্ত্র রচনার সমসাময়িক কালের বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

ধর্মনিরপেক্ষ মন্ত্র

এই মণ্ডলে রাজা, সমাজের প্রধান, বিভিন্ন জাতির পরিচয়, এমন কি যুদ্ধের বর্ণনাও আছে। এখানকার অক্ষসূক্তে প্রদত্ত দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত ব্যক্তির শোচনীয় পরিণতি ও তার বিলাপের মধ্য দিয়ে সেযুগের সমাজের আর একটা দিক আমাদের নজর পড়ে। দানস্তুতির মধ্যে দাতা ও গ্রহীতার উল্লেখের দ্বারা সেই প্রাচীন যুগের কোনও একটি ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দানস্তুতি

এই স্তুতিগুলিতে কোন যজ্ঞানুষ্ঠাতা বা যজ্ঞের পৃষ্ঠপোষকের স্তুতির মাধ্যমে বদান্যতার প্রশংসা করা হয়েছে।[১] এগুলি গভীর উচ্চভাবমণ্ডিত ও এর সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি। এগুলি নিশ্চয়ই কোন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করে, তবে এখন এসব মন্ত্রের ঠিকমত ব্যাখ্যা করা শক্ত। কারণ এখন বৈদিক ভাষার ওপর সম্পূর্ণ দখল খুব কম লোকেরই আছে। এমন কি বৈদিক যুগেই ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের অর্থ দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছিল। সেই প্রাচীন যুগ থেকেই

১ ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল—১১৬

বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বোঝার ও ব্যাখ্যা করার প্রভূত চেষ্টা হয়ে আসছে। তখন নিঘণ্টুর সহায়তায় মন্ত্র-ব্যাখ্যার চেষ্টা হতো। যাস্ক তাঁর নিরুক্তে প্রথম ঋগ্বেদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন।

বর্তমানে যে বৈদিক ভাষ্য ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সেটি বিজয়নগর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সায়ণাচার্যের লেখা।

অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত আবার ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে বেদ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সীতারাম শাস্ত্রী মহাশয় ছাত্রদের কাছে বেদের সূর্যপরত্বে ব্যাখ্যা করতেন। সেই প্রাচীনযুগে বৈদিক ঋষিদের সূর্যই একমাত্র দেবতা ছিল—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ঐভাবে ব্যাখ্যা করা হতো। শুধু তাই নয়, গণিত ও জ্যোতিষের সহায়তায় তিনি প্রমাণ করতেন বেদে সূর্যই একমাত্র দেবতা।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত ধর্মনিরপেক্ষ মন্ত্রগুলির একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং সেগুলির মধ্যে নানা-ধরনের বিষয় রয়েছে। কতকগুলি সূক্তে (১০ মণ্ডল—১৪-১৮) সেযুগে মৃতদেহ সংকার কিভাবে করা হত তার পরিচয় পাই। ঐ মণ্ডলের ৮৫ সূক্ত তখনকার বিবাহরীতি ও পাত্রপাত্রীর সম্পর্ক ও পরিবারে পারস্পরিক স্থান সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিয়ে দেয়। এই মণ্ডলের কতকগুলি সূক্তকে সংবাদসূক্ত বলা হয়। এগুলির একটি বিশেষ মূল্য আছে।

সংবাদসূক্ত

এদের পরবর্তীকালের মহাকাব্য, পুরাণ ও নাটকের উৎস বলা যেতে পারে। ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে

পুরুরবা ও উর্বশীর কথোপকথন। পৃথিবীর রাজা পুরুরবার কাছে স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী চার বছর বাস করার পর স্বামীকে ত্যাগ করে যাবার সময় দুজনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, তা আঠারটা মন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। এই মণ্ডলে যমযমীর কথোপকথন অবলম্বন করে আর একটি সূক্ত আছে। ভাইবোনের এই কথাবার্তার মধ্যে মানবজাতির উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনী অন্তর্নিহিত আছে। এখানে যমী যাতে মানব সমাজ ধ্বংস না হয় সেজন্য তার ভাই যমকে তাদের দুজনের অবাধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পীড়াপীড়ি করছে। অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় কামনাপীড়িতা হয়ে ভগ্নী ভ্রাতাকে প্রেম নিবেদন করছে। কিন্তু রক্তসম্পর্কের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন শাশ্বত নীতি-বিরোধী বলে যম যমীকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

এই দুইটি সূক্তের মধ্যে যথেষ্ট নাট্যরস আছে। সেই কারণে এদের পরবর্তী কালের নাট্য-সাহিত্য ও কাহিনী-কাব্যের আদিম রূপ এবং উৎস বলা যেতে পারে। ভিণ্টারনিৎস্ পুরুরবা ও উর্বশীর কথোপকথনের সূক্ত সম্বন্ধে বলেছেন—This ancient ballad poetry is the source, both of the epic and of the drama, for these ballads consist of a narrative and of a dramatic element.

পরবর্তীকালে যে দর্শনশাস্ত্র গড়ে উঠেছে তারও বীজ রয়েছে এই ঋগ্বেদে—বিশেষভাবে দশম মণ্ডলে। ভিণ্টারনিৎস্ বলেছেন—There are about a dozen hymns in the Rgveda which can designate as philosophical

hymns, in which, along with speculations on the universe and the creation, that the great pantheistic idea of the universal soul which is one with the universe, appears for the first time—an idea, which since that time has dominated the whole of Indian philosophy.

দেবতা

বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিগণের আবাসভূমি ছিল উদার প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় শান্ত সুন্দর সজল উগ্র প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁদের মনে আনন্দ বিস্ময় ভয় প্রভৃতি ভাবের সৃষ্টি করত। প্রকৃতির, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির রূপান্তর লক্ষ্য করে প্রকৃতিকে তাঁরা সজীব মনে করতেন। তার ফলে তাঁরা প্রকৃতির এই বিভিন্ন রূপ ও দৃশ্যাবলির মধ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। সেইজন্য বেদে আমরা বহু দেবদেবীর সংগে পরিচিত হই। ভিণ্টারনিৎস্ বলেছেন—The songs of Rgveda prove indisputably that the most prominent figures of mythology have proceeded from personifications of the most striking natural phenomena.

যাস্ক স্থানানুসারে তিনটি দেবতার উল্লেখ করেছেন—অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র এবং সূর্য। অগ্নি পৃথিবীর, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক্ষের আর সূর্য স্বর্গের দেবতা। ঋগ্বেদে অন্যান্য যে সমস্ত দেবতা

আছে তাঁরা সকলেই এই তিনজনের নামান্তর মাত্র। কারণ কর্মান্তরের জন্য নামান্তর হয়। ঋগ্বেদে পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গলোকের প্রত্যেকটির জায়গায় এগারটি করে দেবতার উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে ব্রাহ্মণ—সাহিত্যে তেত্রিশটি দেবতার কথা আছে। এর দ্বারা মনে হতে পারে, ঋগ্বেদের ঋষিরা বহু ঈশ্বরে বা দেবতায় বিশ্বাসী ছিলেন, আসলে কিন্তু তা নয়। বিশ্বের নিয়ন্তা ও স্রষ্টারূপে এক ঈশ্বরেই তাঁরা বিশ্বাস করতেন আর সব দেবতাকেই একেরই ভিন্নরূপে প্রকাশ মনে করতেন। সেইজন্য এক ঈশ্বরকে তাঁরা 'প্রজাপতি' 'হিরণ্যগর্ভ' প্রভৃতি বলেছেন।

ঋগ্বেদের মধ্যে যে তেত্রিশটি দেবতার নাম আছে তার মধ্যে সূর্য, সোম, চন্দ্র, অগ্নি, দ্যৌঃ, মরুৎ, বায়ু, অপ্, উষস্, পৃথিবী প্রভৃতি নাম থেকে বোঝা যায় এদের উদ্ভব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি থেকে।

ঋগ্বেদে বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। ইন্দ্র যোদ্ধাদের দেবতা আর অগ্নি গৃহস্থের। সোম আর্যদের অত্যন্ত প্রিয় দেবতা, কারণ ইনি মানুষকে প্রেরণা ও অমরত্ব দান করেন। সূর্য, পর্জন্য, মরুৎ ও উষাকে উপলক্ষ্য করে যে সূক্ত আছে তার মধ্যে সুন্দর গীতিকবিতার মাধুর্য প্রতিফলিত।

দেবতা

অগ্নি মর্তবাসী, দেবতাদের সংবাদবাহক ও যোগাযোগকারী। অগ্নিতে আহুতি-প্রদত্ত দ্রব্য দেবতাদের কাছে পৌঁছায় এবং অগ্নিই দেবতাদের যজ্ঞে নিয়ে আসে। এই যুগে আর্যরা যে প্রকৃতির উপাসক ছিলেন

তার বিশেষ নিদর্শন অগ্নিপূজা বা যজ্ঞানুষ্ঠান। বরুণ অন্তরীক্ষের দেবতা এবং মিত্র তাঁর নিত্য সহচর। সূর্যের অপর নাম সবিতা। তিনিই জগৎস্রষ্টা। সবিতাকে এগারটি সূক্তে স্তুতি করা হয়েছে। ব্রাহ্মণদের গায়ত্রী সূর্যেরই স্তুতি।

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা ধ্যানে একটি তত্ত্ব উপলব্ধি করে যে সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে তা প্রকাশ করেছেন তার নাম সূক্ত। যে সূক্তে যে দেবতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে সে সূক্তের তিনিই দেবতা। যেখানে ইন্দ্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে তার দেবতা ইন্দ্র আবার যে সূক্ত ঋষি নিজে বলেছেন সেই সূক্তের দেবতা ও ঋষি তিনি নিজে।

সূক্ত

মানবজাতির ইতিহাস রচনায় ঋগ্বেদের গুরুত্ব অপরিসীম। এইটিই মানবজাতির প্রাচীনতম সাহিত্য। এতে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে আর্যদের ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মবোধ, রাজনীতি, শিক্ষাবিধি, তখনকার দিনের আনন্দ-উৎসব, দেশের ভৌগোলিক পরিচয় প্রভৃতি বহু তথ্য জানতে পারা যায়।

সামবেদ

সামবেদের নিজস্ব সত্তা খুবই কম, কারণ এর অধিকাংশ সূক্তই ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। সাম-সংহিতা আর কিছুই নয়—সোমযজ্ঞে গেয় ঋক্ মন্ত্রের সংকলন মাত্র। এই সাম-সংগীতের অপর নাম উদ্গীথ এবং বৈদিক যজ্ঞে সুর-সহযোগে যিনি সাম গান করতেন তাঁর নাম উদ্গাতা। ২৫০০ খৃঃ পূর্বাব্দ

থেকে ২০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত সংহিতা রচনার কাল নির্দেশ করেছেন ভিণ্টারনিৎস্। সামের মন্ত্রগুলি ঐ সময়েই রচিত, তবে তার সংহিতারূপ ঋগ্বেদসংহিতার পরবর্তী হওয়াই সম্ভব।

এই বেদের দুটি ভাগ—পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক। যোনি বা শ্লোকগুলি নিয়ে পূর্বার্চিক গঠিত এবং শ্লোকের প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি সুর যুক্ত আছে। উত্তরার্চিকে আছে বেশির ভাগ ত্রিচ ও প্রগাথ শ্লোক। ত্রিচ অর্থে তিনটি মন্ত্রের সমষ্টি আর প্রগাথ দুটি মন্ত্রের সমষ্টি। ভারতীয় সংগীতের আদিম রূপ এই সাম সংগীত। সাম গানে ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সাতটি অধুনা প্রচলিত সুরের প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। এই বেদের এক হাজারটি শাখা ছিল বলে জানা যায়। পতঞ্জলি বলেছেন—সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ। কিন্তু পণ্ডিতগণ তিনটি শাখার মাত্র খোঁজ পেয়েছেন। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হল কৌথুমীয় শাখা। এটি এখন প্রচলিত সামসংহিতা।

যজুর্বেদ

ঋগ্বেদের গেয় মন্ত্রাংশের সংকলন যেমন সামবেদ তেমনি ঋগ্বেদের অধ্বর্যুপাঠ্য মন্ত্রাংশের সংকলন যজুর্বেদ। শুক্ল ও কৃষ্ণ এর দুটি ভাগ। এই দুটি ভাগের কারণ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। বেদব্যাস বেদকে চার ভাগ করে তার শিষ্য বৈশম্পায়নকে শিক্ষা দেন যজুর্বেদ। বৈশম্পায়ন আবার যাজ্ঞ-বল্ক্যকে তা দান করেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য অতিরিক্ত বিদ্যাগর্বে

গর্বিত হয়ে সেই বেদ বমন করে আবার সূর্যের তপস্যা করে যে অংশ লাভ করেন তার নাম শুক্ল আর তার পরিত্যক্ত অংশ কৃষ্ণ যজুর্বেদ। বৈশম্পায়নের অন্য শিষ্যরা তিত্তির পক্ষী হয়ে এই অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে এই অংশ তৈত্তিরীয় নামেও পরিচিত।

যজুর্বেদের বহু শাখা। পাণিনি একশ শাখার কথা বলেছেন। তার মধ্যে পাঁচটি বিখ্যাত; যথা—কাঠক সংহিতা, কপিষ্ঠল কঠসংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা ও বাজসনেয়ী সংহিতা। এর মধ্যে শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার দুটি ভাগ—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন।

ঋক্‌সংহিতা রচনাকালেই যজুঃ মন্ত্র রচিত তবে যজুঃসংহিতা সংকলন পরে হয়েছে বলে মনে হয়; তার কারণ এতে ঋগ্বেদ থেকে পৃথক ধরনের ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া, এই সংহিতা আর্যসভ্যতার পূর্বভারতে অধিকতর বিস্তৃতির পরিচয় দেয়। এই বেদ যদিও ঋগ্বেদের পরবর্তীকালের সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করে তবু ঋগ্বেদের সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল আছে।

বিষয়বস্তু

যজুর্বেদের বক্তব্য বিষয় বিভিন্ন বৈদিক যজ্ঞ। কোন্ যজ্ঞ কোন্ সময়ে কার দ্বারা কি ভাবে অনুষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে এতে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। এই বেদের পুরোহিতের নাম অধ্বর্যু। ঋগ্বেদের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এতে শুধু যাগযজ্ঞের বিধিব্যবস্থা

আছে এবং এটি শুধু যজ্ঞেই সীমাবদ্ধ। ঋগ্বেদে যজ্ঞ ছাড়া আরো অনেক বিভিন্ন বিষয় আছে ও এর একটি সাহিত্যিক মূল্য আছে, কিন্তু যজুর্বেদের তা নেই। ঋগ্বেদের সমস্ত অংশই পদ্য; যজুর্বেদের কৃষ্ণ শাখা গদ্যে রচিত। যজুর্বেদের বহু মন্ত্র ঋগ্বেদের হলেও তার মৌলিক অংশ কম নয়। যজ্ঞের ব্যাপারে ঋগ্বেদ অপেক্ষা এর প্রাধান্য বেশী। ঋগ্বেদে যজ্ঞের বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নেই কিন্তু যজুর্বেদে যজ্ঞের শাস্ত্রীয় বিচার ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিশেষ বিধান আছে। যজুর্বেদের পুরোহিত অধ্বর্যু নামের দ্বারা বোঝা যায় যজ্ঞে পশুবধ শাস্ত্রসম্মত, হিংসাজনক নয়। কারণ অধ্বর শব্দের অর্থই হল অহিংস যজ্ঞ। পরবর্তীকালে যে বিশাল গদ্য-সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার প্রাচীনতম নিদর্শন পাই যজুর্বেদে। কৃষ্ণ যজুর্বেদ গদ্যে রচিত; এই গদ্য পরবর্তী গদ্য-সাহিত্যের উৎস।

ঋগ্বেদের সঙ্গে যজুর্বেদের সম্বন্ধ

যজুর্বেদের যুগে ঋগ্বেদের উচ্চ আদর্শ ও দার্শনিকতার ভাব লক্ষণীয়। এই সময় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ওপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে এবং অধ্বর্যু ও ঋত্বিক্‌রা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। এই বেদে আমরা দর্শপূর্ণমাস, অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয় প্রভৃতি বড় বড় যজ্ঞের পরিচয় পাই। এই বেদ বিশেষভাবে যজ্ঞের বিষয়েই পরিপূর্ণ। তাই বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে এই বেদের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী।

যজুর্বেদ যুগের বৈশিষ্ট্য

যজুর্বেদের ধর্মমত ঋগ্বেদ থেকে প্রকৃতপক্ষে পৃথক নয়। এখানে দেবতাবোধ প্রায় এক রকম, তবে তাদের চরিত্রে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন ঋগ্বেদে শেষের দিকের সূক্তে প্রজাপতির আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল মাত্র কিন্তু তিনি এখানে ক্রমশঃ দেবতার মধ্যে বেশ প্রাধান্য বিস্তার করেছেন। ঋগ্বেদের রুদ্র এখানে শিবে রূপান্তরিত। ঋগ্বেদ থেকে বিষ্ণুর প্রাধান্য এখানে বেশী। অসুররা দেবতাবিরোধী একটি দল হিসাবে পরিচিত হয়েছে। যে অপ্সরাদের উল্লেখ ঋগ্বেদে খুব কমই পাওয়া যায় তারা ক্রমশঃ এখানে বেশ প্রাধান্য লাভ করেছে। অনেক ধর্মবোধ পরিবর্তিত, অনেক নতুন ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়েছে দেখা যায়। ঋগ্বেদে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ভক্তি আর এখানে প্রার্থনার সার ও পবিত্রতা বোঝায়। ঋগ্বেদে সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত সর্পপূজা এখানে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। ঋগ্বেদে দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা তুষ্ট হয়ে মানুষের উপকার করেন আর যজুর্বেদে তাঁরা যজ্ঞের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুরোহিতের নির্দেশমত কাজ করতে বাধ্য হন। এখানে দেবতারা ব্রাহ্মণদের করায়ত্ত। এখানকার ধর্ম পুরোহিত সম্প্রায়ের যান্ত্রিক ধর্ম। বহু পুরোহিত মিলে বড় বড় জটিল ধরনের যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। জয়লাভ ও বৃষ্টির জন্য এই বেদে এক শ্রেণীর জাদুমন্ত্র আছে। এই সব অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় এই বিষয়ে বিশেষ দক্ষ পুরোহিতের দ্বারা। এই যুগে জাতিভেদ-প্রথা বেশ দৃঢ় হয়েছে এবং ব্রাহ্মণগণ সমাজে ও

ধর্মমত

ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য লাভ করেছেন। ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন শাখার আবির্ভাব ঘটছে দেখা যায়।

অথর্ববেদ

অথর্বসংহিতা বিভিন্ন জাতীয় জাদুমন্ত্রের সংগ্রহ। এই বেদের আদি নাম ছিল অথর্বাঙ্গিরস্। অথর্বন্ অর্থে মঙ্গলকর জাদুমন্ত্র আর অঙ্গিরস্ অর্থে অনিষ্টকর ইন্দ্রজাল মন্ত্র। এই বেদের কতকগুলি মন্ত্র রোগনিরাময়কারী আর কতকগুলি শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভৃতির অনিষ্টকারী। অতি প্রাচীনকালে অথর্বন্ অর্থে ঐন্দ্রজালিক পুরোহিতের মন্ত্র ও অঙ্গিরস্ অর্থে অগ্নি-পুরোহিতদের বোঝাত, পরে জাদুমন্ত্র অর্থেই প্রচলিত হয়। এই বেদের কুড়িটি কাণ্ড, ৭৩১ সূক্তে সর্বসমেত ৬০০০ মন্ত্র। এর মধ্যে বিংশ খণ্ডের সমস্ত মন্ত্রই প্রায় ঋগ্বেদের। অথর্বসংহিতার একসপ্তমাংশ ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বেদের প্রায় অর্ধেক মন্ত্র ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে আছে। এর বিংশ কাণ্ড নিশ্চিতভাবে পরবর্তী কালের।

এই বেদকে পূর্বে বেদের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। রাজার পক্ষে এই বেদজ্ঞান অপরিহার্য বিবেচিত হওয়ায় এর অন্য নাম ক্ষাত্রবেদ। গোপনীয়তা এর প্রধান শিক্ষা। রোগ-নিরাময়, শত্রুনাশ, হিংস্র জীবজন্তু, দৈত্য, প্রেতাত্মা, ব্রাহ্মণ-গণের অত্যাচারীদের দমন, দুর্ভাগ্য-দূরীকরণ, কারো অনুগ্রহ-লাভ প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যের জন্য এখানে বিভিন্ন মন্ত্র সংগৃহীত

আছে। সায়ণাচার্য এই বেদকে ইহলোক ও পরলোকে ফলপ্রদ বলেছেন—অন্যগুলি কেবলমাত্র পরলোকে ফলপ্রদ। এই বেদের আর একটি বিশেষ দিক হল রোগনিরাময়ের জন্য গান ও মন্ত্রের প্রয়োগ। এর দুটি শাখা—শৌনক ও পৈপ্‌পলাদ।

১৮৫৬ সালে রথ ও হুইট্‌নে দুজনে শৌনক শাখার অথর্ববেদ সম্পাদন করেন। ভূর্জপত্রে লিখিত পৈপ্‌পলাদ সংহিতার একটি মাত্র অসম্পূর্ণ পুঁথি কাশ্মীরে আছে বলে এতদিন জানা ছিল। কিন্তু কয়েক বছর মাত্র আগে অধ্যাপক গবেষক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য এই শাখার একখানা পুঁথি পুরী জেলার বাসুদেবপুর গ্রাম থেকে আবিষ্কার করেন। তারপরে বালেশ্বর জেলা থেকে ঐ শাখারই আরো দুটি পুঁথি পাওয়া যায়।

অথর্ববেদের প্রধান অংশ ঋগ্বেদ থেকে অধিক কুসংস্কারাপন্ন। এই বেদে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভাবনার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এখানকার সভ্যতার পরিচয় ঋগ্বেদের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ও দরকারি। এই বেদে কিছু অংশ গদ্য আছে (এক ষষ্ঠাংশ)। অথর্ববেদের প্রথম তেরটি কাণ্ড প্রাচীন।

ভাষার দিক দিয়ে বিচার করে অথর্ববেদের কাল নির্ণয় করা খুবই শক্ত ব্যাপার। কারণ এখানে অনেক প্রাচীন বিষয়েরও উল্লেখ আছে ; অথচ ভাষা ঋগ্বেদের পরবর্তীকালের বলে মনে করা হয়। তবে অথর্ববেদে বহু প্রাচীন মন্ত্র থাকলেও তার সংহিতারূপে সংকলন নিশ্চিতভাবে ঋগ্বেদ সংহিতার

পরবর্তী। এখানকার সমাজ, সভ্যতা ও ভৌগোলিক পরিচয় এই সাক্ষ্যই দেয়। এতে যে চিত্র আছে, তাতে জানা যায় বৈদিক আর্যগণ ভারতবর্ষের আরো দক্ষিণ-পূর্ব দেশে এগিয়ে এসেছে এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছে। ঋগ্বেদে অজ্ঞাত বঙ্গদেশের জলাভূমির বাঘ অথর্ববেদে সর্বাপেক্ষা হিংস্র জন্তু বলে উল্লেখিত আছে। এখানে চারটি জাতির পরিচয় তো আছেই, তার মধ্যে ব্রাহ্মণই সমাজে সবাপেক্ষা অধিক মর্যাদার অধিকারী।

অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি ঋগ্বেদের একই দেবতাদের এখানেও পাওয়া যায় তবে তাদের চারিত্রিক দীপ্তি ম্লান হয়ে গেছে।

দেবতা

দেবতাদের উদ্ভবের উৎস যে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি একথা এখানে বিস্মৃত। এখানকার ব্রহ্মবোধ ও সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণা পরবর্তী যুগেরই পরিচয় দেয়। এখানকার ধর্মমত অনেকাংশে উপনিষদীয় ধর্মাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

নানা কারণে ভিন্টারনিৎস্ সিদ্ধান্তে বলেছেন—It only follows that the latest hymns of the Atharvaveda are later than the latest hymns of the Rgveda.

এই বেদে রোগমুক্তির জন্য যে সকল জাদুসংগীত ও ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, তা ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার প্রাচীনতম রূপ। এই সংহিতার মন্ত্রগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিম্নে দেখান হল।

(১) **ভৈষজ্য মন্ত্র**—জ্বর নিরাময়ের জন্য এই মন্ত্রের প্রয়োগ করা হয়। এইসব মন্ত্রে জ্বরকে সম্বোধন করা হয়েছে বা যে সব অসুর জ্বর সৃষ্টি করে, মানুষকে কষ্ট দেয়, তাদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। অনেক জ্বরের লক্ষণ ও উপসর্গ পরিষ্কার করে বলা হয়েছে ও নাম দেওয়া হয়েছে। জ্বর আরোগ্যের জন্য বিভিন্ন লতাগুল্মের নাম করা হয়েছে ও তাদের কর্মক্ষমতার বিষয় উল্লিখিত আছে।

(২) **অনিষ্টকারী-বিতাড়ন-মন্ত্র**—সেযুগে মানুষের বিশ্বাস ছিল পিশাচ, রাক্ষস ও অসুররা জ্বর নিয়ে এসে মানুষের ওপর অত্যাচার করে। তাই এদের তাড়িয়ে গ্রাম ও নগর পাপমুক্ত করার জন্য এই শ্রেণীর মন্ত্র আছে।

(৩) **আয়ুষ্য মন্ত্র**—এই শ্রেণীর মন্ত্র দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করা হয়।

(৪) **পৌষ্টিক মন্ত্র**—সংসারে মানুষের ভোগসুখ ও উন্নতি প্রার্থনায় এই শ্রেণীব মন্ত্রের প্রয়োগ করা হয়। কৃষিকর্ম, ব্যবসায়, পশুপালন ও ঘরবাড়ি নির্মাণ প্রভৃতি কাজের সময় সকল রকম বিঘ্ন ও বিপদ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ও চোর ডাকাত বিতাড়নের কাজে এইগুলি প্রযুক্ত হয়।

(৫) **প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র**—এই শ্রেণীর মন্ত্র মানুষ জ্ঞানে অজ্ঞানে যে পাপ করে, তা ক্ষালনের জন্য প্রয়োগ করা হয়।

(৬) আর এক শ্রেণীর মন্ত্র আছে যেগুলো সামাজিক মনোমালিন্য, পারিবারিক মতানৈক্য, কলহ প্রভৃতি থেকে মুক্তিলাভের জন্য ব্যবহার করা হয়।

(৭) **নারীদের ব্যবহৃত কামনাপূর্তি মন্ত্র**— এই শ্রেণীর মন্ত্র মহিলারা তাঁদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রয়োগ করতেন তাঁদের মনোমত স্বামীলাভ, সুখে প্রসব, পুত্রপ্রাপ্তি, গর্ভধারণ প্রভৃতি কামনা পূরণের জন্য। বাঞ্ছিত পুরুষকে বা নারীকে নিজের বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য এবং স্বামীর ক্রোধ, অভিমান ও পরস্ত্রীতে আসক্তি দূর করার জন্য এই শ্রেণীর মন্ত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হতো।

(৮) **অভিচার মন্ত্র**—শত্রু নিধন এবং কারো ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ, নিজের অভিষ্ট পূরণ ও অন্যের অনিষ্ট-সম্পাদনের জন্য এই শ্রেণীর মন্ত্রের ব্যবহার ছিল।

(৯) **তত্ত্বমুলক মন্ত্র**—অথর্ববেদে কতকগুলি মন্ত্র আছে যা উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করেছে আর কতকগুলি মন্ত্রে সৃষ্টিরহস্য ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য

অথর্ববেদীয় পুরোহিতগণ গরীব ও অশিক্ষিত গ্রামবাসীর পূজা-পার্বণে সহায়ক ছিলেন। তাঁরা পূজা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিতেন আবার সেই সঙ্গে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতেন। রাজাদের সঙ্গে এদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ একাধারে রাজাদের পরম সুহৃদ্‌, ধর্মোপদেষ্টা, চিকিৎসাবিদ্যায় দক্ষ ও ঐন্দ্রজালিক। দার্শনিক তত্ত্বেরও তাঁরাই ব্যাখাতা ছিলেন। সেইজন্য রাজাদের ওপর ছিল এঁদের অসাধারণ প্রভাব।

অথর্ববেদের ধর্মমত অতি প্রাচীন। এই বেদ জনসাধারণের।

এটি অনার্য ধর্ম ও সংস্কৃতির মুকুর। এতে সাধারণ মানুষের সরল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও পূজা-পার্বণের কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় জাদুবিদ্যার উৎস এই বেদ।

ব্রাহ্মণ

বৈদিক সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তর ব্রাহ্মণাংশ। এর আয়তন বিরাট। পরবর্তীকালে বৈদিক যাগযজ্ঞ সমূহ যে বিশাল আকার লাভ করছিল এগুলি তাদের পরিচায়ক ও ধর্মতাত্ত্বিক গ্রন্থ। ব্রাহ্মণ গদ্য ও পদ্যে লিখিত এবং বৈদিক যাগযজ্ঞের ব্যাখ্যা এদের উদ্দেশ্য। এতে যজ্ঞের উদ্দেশ্য, উৎপত্তি ও ধর্মানুষ্ঠানের আলোচনা আছে। ঐতিহাসিকের কাছে এগুলির বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত। ঋগ্বেদের সমাজ অপেক্ষা এখানে যে সমাজ পাই তা অনেক অগ্রসর ও উন্নত। ঋগ্বেদের সর্বাপেক্ষা পরবর্তী কালের সূক্তে চারটি জাতির উল্লেখ মাত্র আছে কিন্তু ব্রাহ্মণ যুগে এগুলি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে ব্রাহ্মণের ভাষা উন্নতির দিকে সংহিতার ভাষার পরবর্তী স্তর। এখানে পদ্যাংশ কম, গদ্য ভাগই বেশী।

ব্রাহ্মণগুলি সাধারণ পাঠকদের নীরস বোধ হলেও সংহিতার পরবর্তী যুগের ধর্ম ও দার্শনিক মত জানতে এদের গুরুত্ব অপরিসীম। এতে আমরা বৈদিক যাগযজ্ঞের পূর্ণ বিবরণ, ইতিহাস, মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের কথা জানতে পারি। এখানে দেবতা অপেক্ষা যজ্ঞের অধিক মর্যাদা

দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণে দেবতারা যজ্ঞের অধীন। যজ্ঞই বিষ্ণু ও প্রজাপতির সমান মর্যাদা প্রাপ্ত। এখানে যজ্ঞই প্রধান। যজ্ঞে নির্দিষ্ট ও সঠিক ভাবে মন্ত্রপাঠের ওপর যজমানের মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করে। তাই ব্রাহ্মণের যজ্ঞধর্ম নির্ভেজাল ধর্ম নয়, মন্ত্রপাঠের সঙ্গে কল্যাণ অকল্যাণ যুক্ত। মন্ত্রপাঠের সামান্যতম ত্রুটিতে অমঙ্গল হয়।

যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ জাতিরই প্রাধান্য, কারণ তাঁরাই যজ্ঞের ঋত্বিক্ হবার অধিকারী। তাই ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ ও জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছিল।

প্রাচীনকাল থেকে বৈদিক মন্ত্রের তিন রকম ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল—অধিযজ্ঞ, অধিদৈব ও অধ্যাত্ম। ব্রাহ্মণে আমরা পাই অধিযজ্ঞ ব্যাখ্যা। প্রত্যেক বেদেরই ব্রাহ্মণ আছে।
ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ ঐতেরয় ও কৌষীতকি শাঙ্খ্যায়ন। যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ—শতপথ ও তৈত্তিরীয়। সামবেদের ব্রাহ্মণ—তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ, ষড়্‌বিংশ, সামবিধান, আর্ষেয়, দেবতাধ্যায়, উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ, সংহিতোপনিষদ ও বংশ ব্রাহ্মণ। অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ গোপথ ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ আবার তিন ভাগে বিভক্ত—শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। উপরে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে অলোচনা করা হয়েছে।

আরণ্যক

ব্রাহ্মণ সমূহের "যে অংশে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই সাঙ্কেতিক বা আধ্যাত্মিক আলোচনা আছে, তাহাকে আরণ্যক বলা হয়, কেননা ইহা অরণ্যে অর্থাৎ বনে পাঠ করা হইত, কারণ, এই সব কথা দুরূহ

বলিয়া যেখানে-সেখানে যাহাকে-তাহাকে শেখানো হইত না, এবং ইহা অবধারণ করিবার জন্য অতি নির্জন স্থান আবশ্যক।"*

বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী অরণ্যে গুরুর নিকট বাস করে যে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন ও গ্রহণ করতেন তাই আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ।

ঐতরেয় ও কৌষিতকি শাঙ্খায়ন, এই দুইটি ঋগ্বেদের আরণ্যক। তৈত্তিরীয় আরণ্যক কৃষ্ণ যজুর্বেদের। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ শুক্ল যজুর্বেদের। সামবেদ ও অথর্ববেদের আরণ্যক পাওয়া যায়নি। তবে সামবেদের আরণ্যক জৈমিনীয় শাখার অন্তর্গত।

যোগ্য পাত্র না হলে যে কোনো ব্যক্তি বা জনসাধারণের কাছে আরণ্যক প্রকাশ করা হতো না। প্রধান শিষ্য বা উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছে বলা হতো। সেইজন্য উপযুক্ত পাত্রের অভাবে অনেক আরণ্যক নষ্ট হয়ে গেছে।

ব্রাহ্মণের ভাষার চেয়ে আরণ্যকের ভাষা সহজ। আরণ্যক গদ্যে রচিত। এর অন্তর্গূঢ় অর্থ উপনিষদের মতো রহস্যময়। ব্রাহ্মণের শাখার সমসংখ্যক আরণ্যকের শাখা। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের শেষাংশই আরণ্যক। যেমন ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষাংশ ঐতরেয় আরণ্যক।

আরণ্যকগুলির মধ্যে ঐতরেয় আরণ্যকই বিশেষভাবে খ্যাত। এর পাঁচটি ভাগ। প্রথমভাগে—সোমযজ্ঞের যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা, দ্বিতীয়ভাগে—প্রাণ ও পুরুষতত্ত্বের আলোচনা আর তৃতীয় ভাগে আছে সংহিতা, পদ ও ক্রমপাঠের রূপকার্থ ও গূঢ়ার্থ।

* উপনিষদ্—বিধুশেখর শাস্ত্রী।

ব্রাহ্মণের অপর ভাগ উপনিষদ্। যাঁরা ব্রহ্মবিদ্যা বা গুরুর অতি সান্নিধ্যে বাস করে (উপ) নিশ্চয়তার সঙ্গে (নি) ঐ বিদ্যার চর্চা করেন তাঁদের সংসারে আগমনের কারণভূত অজ্ঞান বা অবিদ্যা প্রভৃতি ধ্বংস করে এই ব্রহ্মবিদ্যা। সেই কারণে এই বিদ্যার নাম উপনিষদ্। এর অন্য নাম বেদান্ত। "ইহা বেদের শেষ অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞান কাণ্ডের মধ্যে শেষ জ্ঞান কাণ্ডের অন্তর্গত।.........উপনিষদ্ শব্দের আর একটি অর্থ হইতেছে রহস্য। অতি গম্ভীর ও দুর্গম বলিয়া এই উপনিষদ্ বা ব্রহ্মবিদ্যাকে সাধারণ বিদ্যার ন্যায় নির্বিচারে যেখানে সেখানে সকলের নিকটে প্রকাশ করা হইত না, ইহা হইল রহস্য। এইজন্য উপনিষদ ও রহস্য, এই দুইটি শব্দ একার্থক হইয়া পড়ে।"* প্রত্যেক বেদের উপনিষদ্ আছে।

উপনিষদ্

পূর্বে বলা হয়েছে আরণ্যকের মধ্যে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই আলোচনা আছে এবং এগুলির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হতো অরণ্যে। অনেক উপনিষদ এই আরণ্যকের অন্তর্গত। উপনিষদ্ সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানবিষয়ক।

উপনিষদের মূল বক্তব্য হল—সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। জগতে একমাত্র সত্য বস্তু ব্রহ্ম, তিনি সর্বব্যাপী। তিনিই সকল জীবের মধ্যে বাস করছেন—'তৎত্বমসি'—তুমিই সেই। জীবে ও ব্রহ্মে কোনো ভেদ নেই। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই জীবনের চরম লক্ষ্য এবং একমাত্র সত্য জ্ঞানের দ্বারা এই লক্ষ্যে পৌঁছান যায়।

মূল বিষয়

---

* উপনিষদ (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ)—বিধুশেখর ভট্টাচার্য।

প্রথমদিকে ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান মানুষের শ্রেয়ো লাভের একমাত্র পন্থা বলে মনে করেছিলেন কিন্তু পরে তাঁরা জানতে পারলেন যজ্ঞের ফল সীমিত, যজ্ঞের দ্বারা যে পুণ্য হয় তাতে স্থায়ী কল্যাণ হয় না, পুণ্যফলক্ষয়ে আবার মানুষকে সংসারের দুঃখভোগ করতে হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁরা বুঝলেন যে মানুষের চিরস্থায়ী শ্রেয়োলাভ কর্মের দ্বারা হতে পারে না, জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব। উপনিষদ্ এই জ্ঞানের বিষয় নিয়েই রচিত।

উপনিষদের অন্তর্গত তত্ত্বগুলির মধ্যে কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ স্থান লাভ করেছে। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে নীতিবাদ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিষ্যের নিকট গুরুর উপদেশ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রজাপতির বাক্য—নীতিবাদের পরিচায়ক।

বিভিন্ন বেদের উপনিষদের সংখ্যা অনেক। একমাত্র ঈশোপ-নিষদ্ সংহিতা বা মন্ত্রের মধ্যে আর সব ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের অন্তর্গত। শঙ্করাচার্য মাত্র দশখানি উপনিষদের ভাষ্য লিখে-ছিলেন; তাদের নাম—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন (গদ্যে ও পদ্যে), মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয় (গদ্যে), ঐতরেয় (ঐতরেয় ব্রাহ্মণান্তর্গত গদ্য), ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক। উপনিষদ্গুলিতে গদ্য ও পদ্য উভয়ের ব্যবহার আছে। আবার কোনটি বা নিছক পদ্যে, কোনটি বা গদ্যে রচিত।

ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, কৌষিতকি ও কেন—এই ছয়টিতে বেদান্ত দর্শনের মূলতত্ত্ব বিশুদ্ধ মৌলিকভাবে

পাওয়া যায়। ভিণ্টারনিৎসের মতে এইগুলি অন্যান্য উপনিষদের চেয়ে প্রাচীন এবং পাণিনি ও বুদ্ধের আবির্ভাবের আগের রচনা। বৃহদারণ্যক সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উপনিষদ্। এর তিনটি কাণ্ড—মধু, যাজ্ঞবল্ক্য ও খিলকাণ্ড।

কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মহানারায়ণ, ঈশ, মুণ্ডক ও প্রশ্ন—এই ছটি উপনিষদের মধ্যে বেদান্ত মতবাদের সঙ্গে সাংখ্য ও যোগ মত যুক্ত হয়ে আছে।

উপনিষদগুলি বৈদিক সংহিতার পরবর্তী কালের রচনা হলেও এগুলিকে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দের আগে আনা যায় না। আরণ্যকগুলি এদের থেকেও প্রাচীন। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের আগেই এগুলি রচিত। ডঃ রাধাকৃষ্ণণের মতে উপনিষদের রচনাকাল খৃঃ পূঃ ১০০০ থেকে ৪০০-৩০০ খৃঃ পূঃ অব্দের মধ্যে।

উপনিষদগুলির মধ্যে সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অংশভূত ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ তত্ত্বালোচনার দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ছান্দোগ্য উপনিষদ

এতে সৃষ্টি, বিশ্ব ও আত্মবিষয়ক গভীর দার্শনিক চিন্তধারা লিপিবদ্ধ আছে। এখানে ওঙ্কারোপাসনা, সামোপাসনা, সূর্যোপাসনা ও প্রাণোপাসনা—এই চার প্রকার উপাসনার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। ব্রহ্মোপাসনা ও প্রতীকোপাসনা ভেদে উপাসনা দু' প্রকার। আত্মভিন্ন অন্যবস্তুতে দেবতাবোধে যে উপাসনা তার নাম প্রতীকোপাসনা। প্রতীক আবার দুরকমের—যজ্ঞাঙ্গ আর যজ্ঞভিন্ন। এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায় থেকে দ্বিতীয়

অধ্যায়ের দ্বাবিংশ খণ্ড পর্যন্ত যজ্ঞাঙ্গ বিষয়ক উপাসনার কথা বলা হয়েছে। পরমাত্মাকে গুণবান বা রূপবানরূপে উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা।

নানা ধর্মমত

গীতায় যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় দেখান হয়েছে তার নিদর্শন পাই ঈশোপনিষদে। ভারতে যে সমস্ত আস্তিক ধর্মমত আছে তার মূল উপনিষদ্। তা ছাড়া জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বাক প্রভৃতি নাস্তিক দর্শনের উৎসও উপনিষদ্। ব্রহ্ম ও আত্মা উপনিষদে একত্ব লাভ করেছে। উপনিষদের ধর্মের মূল কথা—ব্রহ্মত্ব লাভই জীবনের চরম লক্ষ্য।

বেদাঙ্গ

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি বেদাঙ্গ। বেদ অপৌরুষেয় কিন্তু বেদাঙ্গ মুনিঋষিদের রচনা। ব্রাহ্মণযুগে যখন নানা রকমের যাগযজ্ঞের আবির্ভাব ঘটল তখন এগুলির নিয়মনির্দেশ যথাযথভাবে পুরোহিতদের মনে রাখায় অসুবিধা ঘটার ফলে এই বেদাঙ্গ বা সূত্র সাহিত্যের সৃষ্টি। এগুলিতে বৈদিক যাগযজ্ঞের জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয় মনে রাখার সুবিধার জন্য সংক্ষেপে সূত্রাকারে নির্দিষ্ট আছে। এগুলি গদ্যে লিখিত। সূত্রের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য এই—'স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতো মুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।'

এই বেদাঙ্গ বা সূত্রগুলি উপনিষদের পরে খৃঃ পূঃ ৬০০ থেকে ২০০ খৃঃ পূঃ-র মধ্যে রচিত।

সায়ণাচার্যের মতে বেদের অর্থ সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য বলে তা বোঝার জন্য শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টি বেদাঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বর্ণজ্ঞান ও বর্ণোচ্চারণের পদ্ধতি জানা যায়, তা হল শিক্ষা-বেদাঙ্গ। বৈদিক মন্ত্র সঠিকভাবে উচ্চারণ ও পাঠ করার জন্য বর্ণ, স্বর, মাত্রা প্রভৃতি উচ্চারণের বিশেষ নিয়ম আছে। ঐ নিয়মানুসারে বেদপাঠ না হলে ত্রুটি ও অপরাধ হয়। বেদমন্ত্রপাঠে বিশুদ্ধির জন্য শিক্ষা-বেদাঙ্গের প্রয়োজন। অপিশলি শিক্ষা, ভারদ্বাজ শিক্ষা, নারদীয় শিক্ষা, পাণিনীয় শিক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাগ্রন্থ।

শিক্ষা

বৈদিক সাহিত্যের দ্বিতীয় অঙ্গ কল্প। শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম ও শুল্ব—এই চারটি কল্পসূত্র। এগুলির মধ্যে যাগযজ্ঞের বিধিব্যবস্থা আছে—সেইদিক দিয়ে ব্রাহ্মণ ও কল্পসূত্রের বিষয় এক। শ্রৌত সূত্রে বড় বড় বৈদিক যজ্ঞের প্রয়োগ ও নিয়মকানুন নিয়ে আলোচনা আছে। গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায় গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের পরিচয়। এর প্রথম ভাগে আছে অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুবন্ধ, সোমযাগ প্রভৃতি ও দ্বিতীয় ভাগে পাই হিন্দুদের অনুষ্ঠেয় সমস্ত সংস্কার—গর্ভাধান থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত। এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞ, গৃহনির্মাণ, কৃষি প্রভৃতি আরো অন্যান্য বিষয়ের

কল্প

শ্রৌত সূত্র

আলোচনাও রয়েছে। বৈদিক যুগের ঋষিদের ধর্মমত সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যায় এই সূত্র থেকে।

ধর্মসূত্র

ধর্মসূত্রের আলোচ্য বিষয় হল ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মানুমোদিত বিধি, আইন প্রভৃতি। আসলে ধর্মশব্দের অর্থ 'Dharma, however, signifies, right, duty, law, 'as well as religion, custom, usage. Therefore these works deal with secular law, which indeed are inseparable in India. They give rules and regulations for the duties of the castes and the stages of life (asrames)'.*

এই ধর্মসূত্রই আমাদের দেশের প্রাচীনতম আইন গ্রন্থ বলা চলে। এতে জাতিধর্ম ও বর্ণধর্মের নিয়মকানুন, বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সম্পর্ক, রাজা ও প্রজার পারস্পরিক কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ, ন্যায়বিচার ও আইনপ্রয়োগ-ব্যবস্থা প্রভৃতি বহুবিষয়ের আলোচনা আছে। এই সূত্রকে অবলম্বন করে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্র প্রধানতঃ ধর্মসূত্রের উপর ভিত্তি করে রচিত। ভারতের প্রাচীন সমাজের নিয়ম-কানুন গৃহ্য ও ধর্মসূত্র থেকে জানতে পারি।

শুল্বসূত্র

শুল্বসূত্র যজ্ঞবেদির মাপজোপ আকার প্রভৃতির নির্দেশ দেয়। ইহাতেই সর্বপ্রথম ভারতীয় জ্যামিতি শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। জ্যামিতির কর্ণ, ভুজ, লম্ব প্রভৃতি নাম এখানে আছে।

* A History of Indian Literature. Vol. I.— *Winternitz*

ব্যাকরণ

ব্যাকরণ তৃতীয় বেদাঙ্গ। ইহা শব্দ গঠন ও ভাষা নিয়ন্ত্রণের শাস্ত্র। প্রাচীনকালে বেদের প্রত্যেক শাখার প্রতিশাখ্য নামে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ ছিল। এতে কোন বেদে কোন শব্দ কিভাবে উচ্চারণ করা দরকার, স্বরসঞ্চার, সন্ধি, ছন্দ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিশাখ্যই পরবর্তীকালের ব্যাকরণের আদি রূপ। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী বর্তমান ব্যাকরণের প্রাচীনতম গ্রন্থ। ভিণ্টারনিৎসের মতে পাণিনির আবির্ভাব কাল খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী। অপিশলি, শাকল্য, গার্গ্য, শাকটায়ন, স্ফোটায়ন প্রভৃতি পাণিনির পূর্ববর্তী বৈয়াকরণিকের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এঁদের রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায়নি।

নিরুক্ত

নিরুক্ত চতুর্থ বেদাঙ্গ। নিঘণ্টুস্থিত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আছে নিরুক্ত গ্রন্থে। অর্থব্যাখ্যাবিহীন কতকগুলি পদসংকলন গ্রন্থের নাম নিঘণ্টু। পৃথিবীর প্রাচীনতম অভিধান নিঘণ্টু। নিঘণ্টুর যাস্ককৃত ভাষ্যই হল নিরুক্ত। এর তিন কাণ্ড—নৈঘণ্টুক, নৈগম ও দৈবত। এক একটি জিনিসের যত নাম হতে পারে সেগুলি সব একত্রে সাজানো আছে এই নিঘণ্টুতে। এখানে পদের বিশেষ অর্থে প্রয়োগের বিচারও আছে। নিঘণ্টু ও নিরুক্ত—খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা বলে মনে করা হয়।

ছন্দ

ঋগ্বেদে সাত রকম ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী। এই সব ছন্দ বোঝার জন্য যে সব গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে পিঙ্গলাচার্যের ছন্দসূত্র

প্রাচীনতম। এই গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন ছন্দের নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে পারি।

যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় স্থির করার জন্য জ্যোতিষের প্রয়োজন। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে দিন গণনা করা হ'ত। অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ করার নির্দেশ এখানে আছে। এই যজ্ঞ-সময় জানার জন্যই জ্যোতিষের সৃষ্টি।

জ্যোতিষ

বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য বেদাঙ্গ নয় এমন আর দুটি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন, সে দুটি হল—বৃহদ্দেবতা ও ঋগ্বিধান। এ দুটি শৌনক শাখার কোন ব্যক্তির রচনা। বৃহদ্দেবতা ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তস্থিত দেবতাদের তালিকা। এখানে ঐসব দেবগণের কাহিনী ও উপাখ্যান আছে। এজন্য এটি পরবর্তীকালের মহাকাব্যের উৎস বলা যেতে পারে। ঋগ্বিধান ঋগ্বেদসংহিতার বিভিন্ন ভাগ, সূক্ত ও ঋকের অলৌকিক শক্তির পরিচিতি।

অনুক্রমণী গ্রন্থসমূহ বেদাঙ্গের বহির্ভূত। এতে বৈদিক মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ প্রভৃতি আছে। এদের মধ্যে শৌনকের ঋগ্বেদানুক্রমণী ও কাত্যায়নের সর্বানুক্রমণী বিশেষভাবে খ্যাত।

রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ

মহাভারত

রামায়ণ ও মহাভারত, এই তুইটি ভারতের প্রাচীন মহাকাব্য। পাশ্চাত্য মতে এপিক তুই শ্রেণীর—Epic of Growth ও Epic of Art বা Literary Epic. এই মতানুসারে রামায়ণ ও মহাভারত Epic of Growth. Epic of Art কে রবীন্দ্রনাথ একলা কবির কাব্য বলেছেন। আর Epic of Growth যুগের ও জাতির সৃষ্টি।

আমাদের এই রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যরূপলাভের বহু পূর্ব থেকে এদের মূল কাহিনী গায়ক সম্প্রদায় ও কথক মুখে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় মতে মহাভারত আখ্যান ও ইতিহাস শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

উৎস

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত সংবাদসূক্ত ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের আখ্যান, ইতিহাস ও পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে মহাকাব্যের উৎপত্তির সূত্র নিহিত আছে। বাস্তবিক পক্ষে ঋগ্বেদের সংবাদ-সূক্ত, আখ্যানসূক্ত, দানস্তুতি, নারাশংসী, অথর্ববেদের কুন্তপা সূক্ত সমূহ মহাকাব্যের উৎস। বৈদিক ও গার্হস্থ্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেযুগে এই সব কাহিনী শোনান হ'ত। অশ্বমেধ যজ্ঞে বীরপুরুষ ও দেবতার আখ্যান গান এবং রাজসভায় রাজার

ও তাঁর পূর্বপুরুষদের স্তুতিগান করার নিয়ম প্রচলিত ছিল। এই কাজের জন্য কালক্রমে সূত, মাগধ, (বন্দী ও কুশীলব) নামে গায়ক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।' এরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে সেখানে সংঘটিত ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ বর্ণনা রাজার নিকট করত। যেমন মহাভারতে সূত সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। রামায়ণে দেখতে পাই, রামের দুই পুত্র কুশ ও লব মহর্ষি বাল্মীকির কাছ থেকে রামের কাহিনী শিক্ষা করে নানা জায়গায় রাজসভায় গান করে বেড়াত। তারাই অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় তাদের পিতা রামের সামনেই তাঁর জীবনের কাহিনী বর্ণনা সুরসংযোগে করেছিল। পুরাণগুলির কথক সূত লোমহর্ষণ বা তাঁর পুত্র সৌতি উগ্রশ্রবা। মহাভারতের বক্তা সূত সঞ্জয়।

তখন সমাজে সূত, মাগধ ও বন্দী প্রভৃতি নামে যে সব সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল তারাই রাজাদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী সংগ্রহ ও রচনা করত, রাজবংশের তালিকা মনে রাখত। রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যাকারে রচিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকে রাম-রাবণ ও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-কাহিনী এই শ্রেণীর গায়ক ও কথক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং তারা রাজসভায় ও বিভিন্ন জায়গায় যাগযজ্ঞানুষ্ঠানকালে সুর-সহযোগে এই সব কাহিনী গেয়ে বেড়াত। সেই অতি প্রাচীন কাল থেকে রাম-রাবণ ও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-কাহিনীর মত আরও বহু রাজা-রাজড়ার আখ্যান-উপাখ্যান এই সম্প্রদায়ের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এইগুলিকে বীর্যগাথা বলা হয়

রামকাহিনী ও কুরুপাণ্ডবের কাহিনী প্রথম সাহিত্যরূপ লাভ করার পর তাতে আস্তে আস্তে অন্যান্য বীর্য-গাথাগুলি এসে স্থান পায়। এই ঘটনা বেশী ঘটেছে মহাভারতে, তাই এর আকৃতি এত বৃহৎ।

বর্তমান মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ। এটি অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত এবং এর একটি পরিশিষ্ট আছে; তার নাম হরিবংশ। মহাভারতে নানাশ্রেণীর আখ্যান-উপাখ্যান, নীতি ধর্ম দর্শন ভক্তি ও মোক্ষবিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

মহাভারতের মূল কাহিনী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও মহাভারতের ভেতরের আরও অনেক কাহিনীর আভাস-উল্লেখ শেষের দিকের বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু রামায়ণের কাহিনী বা তার চরিত্রের কোন নাম বৈদিক সাহিত্যের কোন জায়গায় পাওয়া যায় না। এইজন্য রামায়ণের কাহিনী মহাভারত কাহিনীর পরবর্তী বলে অনেকে মনে করেন।

বাল্মীকি নামে কোনো এক প্রতিভাশালী কবি গায়ক কথক সম্প্রদায় ও লোকমুখে প্রচলিত রামকাহিনী অবলম্বন করে রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রথম রামকাহিনী ও বাল্মীকির নাম পাওয়া যায়। একটি পালিজাতকে দশরথের মৃত্যুর পর রামের নিকট ভরতের যাওয়ার কথা আছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষের রচিত বুদ্ধচরিতে বাল্মীকির নাম ও তাঁর কবিত্বলাভের কাহিনী আছে। রামায়ণের কাহিনী বেশ সুসসম্বদ্ধ ও সুসংহত।

বাল্মীকির মূল রামায়ণ গেয় কাহিনীরূপে রচিত। রামায়ণে পরবর্তীকালের সংযোজিত অংশ মহাভারতের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু মহাভারতের মূল অংশ কতটুকু ছিল তা এখন খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য। এটি তাই যুগের কালের সৃষ্টি। যে আকারে আমরা মহাভারত পেয়েছি তার বয়স হাজার দেড়েকের বেশী হয়।

মহাভারতের মূল কাহিনী ভ্রাতৃ-কলহ, কুরু ও পঞ্চালদের গৃহযুদ্ধ। যে ভরতবংশীয়দের কাহিনী অবলম্বনে মহাভারত রচিত তারা বৈদিকযুগের একটি জাতি। কুরু-পঞ্চালদের উল্লেখ যজুর্বেদে পাই। ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে মহাভারতের অনেক চরিত্রের নামোল্লেখ আছে। দেবকীপুত্র কৃষ্ণের কথা ছান্দোগ্য উপনিষদে, পরিক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়ের পরিচয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের রচনা বলে মহাভারত পরিচিত। আসলে কিন্তু সেই মৌলিক রচনা কালগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, আর আমরা মহাভারত-রূপে যা পেয়েছি তাকে কোনো ব্যক্তি- বিশেষের রচনা বলা চলে না। এটি বহুব্যক্তির বহু যুগের রচনা বহু গায়ক ও কথকের মুখে ঘুরে ঘুরে বহু লেখকের সংশোধন ও সংযোজনে বর্তমান গ্রন্থাকৃতি লাভ করেছে।

মহাভারত শব্দের অর্থ হল—ভরতবংশীয়দের কাহিনী। ঋগ্বেদে ভরতদের যুদ্ধপ্রিয় জাতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ বংশের একজন অধস্তন পুরুষের নাম ছিল কুরু, তদ্বংশীয়রা

কৌরব নামে পরিচিত এবং তাদের বাসভূমির নাম ছিল কুরুক্ষেত্র। এই কৌরবদের পরিবারিক কলহ এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণতি লাভ করে। সম্ভবতঃ এই যুদ্ধের কাহিনী ঐতিহাসিক এবং এই কাহিনী গানের মাধ্যমে গায়ক সম্প্রদায়ের মুখে মুখে প্রচার লাভ করে। এই বীরস্তুতিই মহাভারতের কাহিনীর মূল উপাদান। তারপর বহুকাল ধরে এই মূল কাহিনীতে বিভিন্ন শ্রেণীর নানা আখ্যান উপাখ্যান, নীতি ধর্ম বিষয়ক বহু কাহিনী যুক্ত হয়ে বর্তমান মহাভারতে পরিণত হয়েছে। একে গায়ক সম্প্রদায়ের মুখে প্রচলিত সমস্ত কাহিনীর একত্রীকরণ বলা যেতে পারে।

বীর ক্ষত্রিয় যোদ্ধৃ-সম্প্রদায়ের বীরত্বের কাহিনী মহাভারতের মূল উপজীব্য হলেও পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে অনেক নীতি ধর্ম ও ভক্তিমূলক রচনা এর মূল কলেবরকে পরিপুষ্ট করেছে। মহাভারত আসলে ক্ষত্রিয় বীরদের কাহিনী এবং সেই কাহিনী সূত সম্প্রদায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সুর সহযোগে প্রচারিত হয়ে থাকলেও পরবর্তীকালে এর উপর ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের প্রভাব এসে পড়ে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রভাবে আসার আগে রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুটি কাব্য ছিল শুধু ক্ষত্রিয় বীরদের ইতিহাস ও জনসাধারণের কাব্য। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবেই এগুলিতে এসেছে নীতি, ধর্ম, দর্শন, ভক্তি ও মোক্ষবিষয়ক আলোচনা।

জনপ্রিয়তার জন্য এই দুটি মহাকাব্যের উপর বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের দৃষ্টি পড়ে। মহাভারতের যে

সমস্ত কাহিনীর মধ্য দিয়ে মৈত্রী, ভূতে দয়া, অহিংসা, সংসারে অনাসক্তি প্রভৃতি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে, তা বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের প্রভাবের ফল বলে মনে হয়। এইজন্য *Winternitz* বলেছেন—'The Mahabharata is not one poetic creation at all, but rather a whole literature.'

এই মহাকাব্যটি প্রথমে জনসাধারণের জিনিস ছিল, বিশেষভাবে যোদ্ধৃসম্প্রদায়ের কাহিনী ছিল এর মূল উপাদান এবং এর প্রচারক ছিল সূত সম্প্রদায়। সূতরা যেমন ক্ষত্রিয় রাজাদের আশ্রয়ে থাকত, তেমনি ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণী ছিল তাদের মন্ত্রণাদাতা। তাই পরে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সূত সম্প্রদায়ের হাত থেকে এই কাব্য ব্রাহ্মণদের প্রভাবে এসে পড়ে এবং এর ফলে তাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায় নীতি ও ধর্ম। তাই এতে, সূত, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী—এই তিন সম্প্রদায়ের রচনা আছে।

বেদের মধ্যে যে ধর্ম তত্ত্বের আকারে আছে, মহাভারতে সেই তত্ত্ব গল্পের ভেতর দিয়ে সহজ সরল ভাবে সর্ববোধ্য করে প্রকাশিত হয়েছে। থাডানির মতে ভারতীয় ষড়দর্শনের মূল নীতির উপর মহাভারত রচিত। মহাভারত যুগ যুগ ধরে নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র ও ইতিহাসরূপে প্রাচীন ভারতের শাশ্বত ভারতের চিন্তাধারা তার সাধনা, আদর্শ, জীবনদর্শন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে নিয়ে আসছে।

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে মহাভারতের মূল কাহিনী স্মরণাতীত কাল থেকে গায়ক ও কথক সম্প্রদায়ের দ্বারা বাহিত ও প্রচারিত হয়ে আসছিল। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস এই কাহিনীকে সর্বপ্রথম কাব্যরূপ দান করেন, তিনিই মহাভারত-রচয়িতা বলে পরিচিত।

মহাভারতের তিনটি স্তর

মহাভারতের প্রারম্ভেই উল্লিখিত আছে, তিন পুত্র মারা গেলে মহর্ষি ব্যাস তাঁর রচিত কাব্য লোকসমক্ষে প্রচারিত করেন। তিনি প্রথমে এই কাব্য তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়নকে বলেন এবং বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের বিখ্যাত সর্পযজ্ঞে এটি আবৃত্তি করেন। এই সময় লোমহর্ষণের পুত্র সূত উগ্রশ্রবা এই কাব্য মুখস্থ করে ফেলেন এবং নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী যজ্ঞে উপস্থিত ঋষিদের শোনান। কাহিনীটির আবৃত্তিকারী সূত উগ্রশ্রবা এবং কাব্যে বৈশম্পায়নই বক্তা। বৈশম্পায়নের কথিত এই কাহিনীর মধ্যে আরও অনেক আখ্যান-উপাখ্যানের বক্তা দেখতে পাওয়া যায়। মহাভারতের মধ্যে গদ্যের রীতিতে মাঝে মাঝে যুধিষ্ঠির বললেন, দ্রৌপদী বললেন, বৈশম্পায়ন বললেন,—এই রূপ উল্লেখ আছে। এইভাবে বলার পদ্ধতি মহাভারতের প্রাচীনত্বের পরিচায়ক।

মহাভারতের আয়তন সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তার বিভিন্ন উক্তি পাই। উগ্রশ্রবা মাত্র এই কাব্যের ৮৮০০ শ্লোক জানতেন, আর ব্যাসের মতে এই কাব্যে ২৪০০০ শ্লোক ছিল আবার এই

কাব্যকে শত সাহস্রী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতে একটি শ্লোক আছে :—

অষ্ট শ্লোক-সহস্রাণি অষ্ট শ্লোক-শতানি চ।
অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি বা ন বা সঞ্জয়ঃ।

এর দ্বারা বোঝা যায় সর্ব প্রথমে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা ছিল ৮৮০০।

এই মহাকাব্যের প্রথমাংশের কয়েকটি শ্লোক থেকে জানা যায় যে এই কাব্যের তিনটি স্তর আছে। এক সময়ে এর শ্লোক সংখ্যা ছিল ২৪০০০ *

মহাভারত শব্দের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম উল্লেখ আছে খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দের আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে। এতে মনে হয় খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দের আগেই মহাভারতের প্রাচীনতম স্তর রূপ লাভ করেছে।

খৃঃ পূঃ ৪০০ শতাব্দী পর্যন্ত আর্যদের মধ্যে ব্রহ্মা পূজার প্রাধান্য ছিল। গ্রীক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিসের বিবরণানুযায়ী খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে বিষ্ণু ও শিবপূজা প্রাধান্য লাভ করে। বর্তমান মহাভারতে শৈবধর্মের অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে। তা ছাড়া শক ও যবনদের কথাও পাওয়া যায়। এরা খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের আগে ভারতে আসেনি। বৌদ্ধধর্মের উল্লেখও মহাভারতে আছে। এই সব বিষয় বিবেচনা করে মনে হয় খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের আগে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তর রূপ লাভ করেনি। ম্যাকডোনেলের

*চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্. (১.২.১৩১)

মতে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের মধ্যে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তর রূপ লাভ করে।

বর্তমান মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষ। ৪৬২ খৃষ্টাব্দ থেকে ৫৩২ খৃষ্টাব্দের একটি ভূমিদান-লিপি থেকে জানা যায় যে ঐ সময়ের মধ্যে মহাভারত বর্তমান রূপ লাভ করে। এই শেষ স্তরে মহাভারতের মধ্যে বহু নীতিকথা, নীতিমূলক উপাখ্যান ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের আদর্শ প্রচারক বহু কাহিনী স্থান পেয়েছে।

Winternitz সিদ্ধান্ত করেছেন খৃঃ পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগে মহাভারত নামে কোনো মহাকাব্যের অস্তিত্ব ছিল না। বর্তমানে অবস্থিত মহাকাব্যের আকারে মহাভারতের রূপান্তর প্রাপ্তি হয়েছে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী থেকে চতুর্থ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বর্তমান আকারে মহাভারত মহাকাব্য পাই, তবে তার পরেও কিছু কিছু সংযোজন ঘটেছে।

মহাভারত মূল কাহিনী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে করা হয়। যজুর্বেদে কুরু ও পঞ্চাল নামে দুটি জাতির নাম, ধৃতরাষ্ট্র ও বিচিত্রবীর্যের নাম পাওয়া যায়। কয়েকটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে জনমেজয়, ভরত, কুরু ও পঞ্চাল নামের উল্লেখ আছে। ভরতগণ বৈদিক যুগের এক যুদ্ধপ্রিয় জাতি। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীর পুত্র কৃষ্ণের কথা আছে। শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উল্লেখ পাই। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে ভারত ও মহাভারত দুটি নাম আছে।

প্রাচীনত্ব

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর বৈয়াকরণিক পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে যুধিষ্ঠির, ভীম, বিদুর, মহাভারত প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করেছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের কথা আছে। কৌটিল্য (৪র্থ শতাব্দী) মহাভারতের কথা বলেছেন। তাছাড়া এই গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের অনেক বিষয়ের আলোচনা আছে। সপ্তম শতাব্দীর বাণভট্টের কাদম্বরীতে মহাভারতের উল্লেখ পাই। ঐ শতকের কুমারিল তাঁর গ্রন্থে মহাভারতের বহু শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

এই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে অনেকে মনে করেন মহাভারতের মূল কাহিনীর উৎপত্তির উৎস খৃঃ পূঃ দশম শতক বা তৎপূর্বে। *Winternitz* এর মতে মহাকাব্যরূপ মহাভারতের উৎপত্তির ঊর্ধ্বসীমা খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক এবং এর সর্বশেষ রূপ-প্রাপ্তি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে হয়েছে বলে মনে করা হয়।

মহাভারতের উৎপত্তিকাল সম্বন্ধে *Winternitz* এর বক্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত করা হল।

1. Single myths, legends and poems which are included in the Mahabharata reach back to the time of the veda.

2. An Epic Bharata or Mahabharata did not exist in the Vedic period.

3. Many moral narratives and sayings which our Mahabharata contains belong to the ascetic poetry which was drawn upon from

6th century B. C. onwards also by Buddhists and Jains.

4. If an epic Mahabharata existed between the 6th and 4th centuries B. C. then it was but little known in the native land of Buddhism.

5. There is no certain testimony for an epic Mahabharata before the 4th century B. C.

6. Before the 4th century B. C. and 4th centnry A. D. the transformation of the epic Mahabharata into our present compilation took place, probably gradually.

7. In the 4th centuty A. D. the work alreary had, on the whole in its present extent, contents and character.

8. Small alterations and editions still continued to be made however in later centuries.

9. One date of the Mahabharata does not exist at all, but the date of every part must be determined on its own account.

নীতি, ধর্ম ও মোক্ষবিষয়ক আলোচনা ও কাহিনী

মহাভারতের শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্ব নীতি, ধর্ম ও মোক্ষবিষয়ক আলোচনায় পূর্ণ। এইগুলি পরবর্তীকালের যোজনা বলে মনে করা হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের কাছ থেকে যুধিষ্ঠির যে নীতি ধর্ম ও মোক্ষবিষয়ক

আলোচনা শ্রবণ করেন, তাই শান্তিপর্বের বিষয়। তা ছাড়া এখানে আরও নানা উপদেশ ও আলোচনা আছে,—যেমন রাজার কর্তব্য, বর্ণাশ্রম ধর্ম, জনক জননীর প্রতি পুত্রের কর্তব্য, আচার্যের প্রতি শিষ্যের কর্তব্য, দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা প্রভৃতি। অনুশাসনপর্বে পৌরাণিক কাহিনী ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিষয় আলোচিত হয়েছে। বনপর্ব, উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব ও শল্যপর্বে এই শ্রেণীর আলোচনা আছে।

এই ধরনের আলোচনার মধ্যে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভাগবত্-গীতা সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং উচ্চ-প্রশংসিত। এটি হিন্দুদের একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম ও দার্শনিক গ্রন্থ।

গীতা

এই শ্রেণীর দার্শনিক কবিতা বিশ্বসাহিত্যে আর নেই। ভীষ্মপর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যখন বিখ্যাত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বর্ণনা আছে, সেইখানেই ভগবদ্গীতার আরম্ভ। এই গ্রন্থে আঠারটি অধ্যায় এবং মোট ৬৫০টি শ্লোক। পণ্ডিতগণ মনে করেন, প্রথমে এটি সংক্ষিপ্ত আকারে মহাভারতে যুক্ত হয়েছিল, কালক্রমে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে এটি বর্তমান আকার লাভ করে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন কুরু ও পাণ্ডব দুই পক্ষের যোদ্ধারা রণক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, সেই সময় সারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথ দুই বাহিনীর মধ্যস্থলে এনে উপস্থিত করলে অর্জুন যুদ্ধে গুরুজন ও আত্মীয় বন্ধুগণকে হত্যা করতে হবে ভেবে খুব মানসিক দৌর্বল্য অনুভব করেন ও ধনুর্বাণ ত্যাগ করেন। সেই সময় তাঁকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য

শ্রীকৃষ্ণ বীরের ধর্ম, আত্মার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাই হল গীতার বিষয়বস্তু।

ভারতে যে সমস্ত দর্শন শাস্ত্র আছে তাতে মোক্ষলাভের বা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে মতের ও পথের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় কিন্তু গীতা সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করে বিভিন্ন দার্শনিক মত ও পথের এক সুষ্ঠু সমাধান করেছে। গীতাকে তাই সর্বদর্শন ও উপনিষদের সার বলা হয়। এতে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত মতের একত্র মিশ্রণ করে একটা সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ই গীতা।

আত্মার শাশ্বতত্ব, নিষ্কাম কর্মযোগ ও ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ—এই তিনটি বিষয় গীতার মূল কথা। এখানে অতি সুকৌশলে মোক্ষলাভের এই তিনটি উপায়ের একটি সামঞ্জস্য সাধন করা হয়েছে। গীতায় বলা হয়েছে একমাত্র ভক্তিপথে সাধনা করে ভগবানের সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা যায় এবং ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে ভগবানে ভক্তি রেখে সাধনা দ্বারা মন পবিত্র করলে ভক্ত ভগবানের সত্য স্বরূপ উপলব্ধি করার যোগ্য হয়।

অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখানর পর একাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন—

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥

হে পাণ্ডুনন্দন, যিনি আমার প্রীতির জন্য কর্ম করেন, আমিই যাঁর পরম পুরুষার্থ, যিনি আমারই আশ্রিত ভক্ত, বিষয়ে আসক্তিশূন্য এবং সর্বজীবে বৈরভাববর্জিত, তিনিই আমাকে লাভ করেন।

একাদশ অধ্যায়ে ভগবানের অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাবার মধ্য দিয়ে বেদান্তবাদের কথা বলা হয়েছে। এই মতে সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়—সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। জগতে একমাত্র সত্য বস্তু ব্রহ্ম আর সব মিথ্যা। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে ভগবান এই তত্ত্বটিই বোঝাতে চেয়েছেন। সত্যজ্ঞান হলেই সাধক মোক্ষ-লাভ করে।

গবেষকগণ মনে করেন গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত অংশ। এটি প্রথমে ছোট ছিল, পরে আঠার অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। গীতার রচয়িতা একজন কবি ও দার্শনিক। উপনিষদের ভাব ও ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার জন্য অনেকে মনে করেন এটি উপনিষদের যুগে উপনিষদরূপেই রচিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বাণভট্ট গীতার বিষয় জানতেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গীতার অস্তিত্ব ছিল, পরে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বর্তমান রূপ লাভ করে।

গীতার শিক্ষা

গীতা আমাদের জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। কর্ম যদি আসক্তি বর্জিত নিষ্কাম হয়, তা হলে জীবনের কাজ অনেক কমে যায়। সমস্ত কর্মফল যে ভগবানে সমর্পণ করতে পারে সেই যোগী। ভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, সে যেন সমস্ত কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে

সমর্পণ করে কাজ করে যায়, তা হলে সে যে কাজ করবে তা হবে ভগবানের কাজ আর অর্জুন হবে নিমিত্ত মাত্র. নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্। নিজের কাজ না হলেই আর সেই কাজের ফলের জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। অর্জুন এইভাবে নিরাসক্ত হয়ে ভগবানের জন্য কাজ করলে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করার ভয়বোধ থাকবে না। কারণ—যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। স হত্বাপি ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।

গীতার শিক্ষা এই যে মানুষ যদি ফলকামনা বর্জিত হয়ে অর্থাৎ কর্মের ভালমন্দ যা কিছু ফল সবই ভগবানে সমর্পণ করে কাজ করে যায়, তা হলে সে শেষ পর্যন্ত ভগবানকেই লাভ করে।

গীতার শেষ কথা—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

[গীতা ১৮ অ, ৬৫-৬৬]

ভগবান অর্জুনকে এখানে বলছেন —

তুমি আমাতেই চিত্ত নিবিষ্ট কর, একমাত্র আমার উপাসক হও, একমাত্র আমাকেই (ঈশ্বরকে) মন বাক্য ও কর্ম দ্বারা নমস্কার কর. তা হলে নিশ্চয়ই আমাকে পাবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তুমি আমার প্রিয়, অতএব তোমাকে প্রতিজ্ঞা করে এই কথা বলছি।

তুমি সমস্ত ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, শোক করো না, আমিই (আত্মস্বরূপ প্রকাশ দ্বারা) তোমায় সর্ববিধ ধর্মাধর্মবন্ধনরূপ পাপ থেকে মুক্ত করব।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ও অর্জুন জীবের প্রতিভূ। সুতরাং ভগবান অর্জুনকে যা যা উপদেশ দিয়েছেন—সেগুলি সমগ্র জীবেরই আচরণীয় এবং ঐরূপ আচরণের দ্বারা মানুষ জীবের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে।

রামায়ণ

রামায়ণ আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকির রচিত আদি কাব্য। অধ্যাত্ম রামায়ণে বাল্মীকির অতীত জীবনের ইতিহাস পাই। ক্রৌঞ্চদম্পতির মধ্যে ক্রৌঞ্চ বিদ্ধ হলে ক্রৌঞ্চীর বেদনায় ব্যথিতচিত্ত বাল্মীকির শোক শ্লোকচ্ছন্দে প্রথম বাঙ্ময়রূপে আত্মপ্রকাশ করে : এই জন্য তিনি আদি কবি। পরে তিনি ব্রহ্মার আদেশে অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে রামায়ণ রচনা করেন। রামায়ণের সাতটি কাণ্ড ; যথা :—বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, যুদ্ধকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড। তিনটি রূপে রামায়ণের পুঁথি পাওয়া গেছে ; যেমন :—পশ্চিমভারতীয়, বঙ্গদেশীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় রূপ। এই তিনটি রূপে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। রামায়ণের কাহিনী সর্বজনবিদিত, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

মহাভারত ইতিহাসধর্মী কিন্তু রামায়ণ অধিক পরিমাণে কাব্যধর্মী। রামায়ণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

যাবৎস্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥

যতদিন পৃথিবীতে গিরি ও নদী বর্তমান ততদিন রামায়ণ মানব-সমাজে প্রচলিত থাকবে।

এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। বাল্মীকির মত প্রতিভাবান কবির কল্পনার দীপ্তিতে রাম জগতে অমরত্ব লাভ করেছেন।

যে রামায়ণ যুগ যুগ ধরে ভারতমানস, ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতিতে অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করে আসছে, সেই সাত-কাণ্ডে সম্পূর্ণ রামায়ণের সমস্ত অংশ আদি কবির রচনা নয় বলে বর্তমান যুগের গবেষকগণ মনে করেন। তাঁদের মতে প্রথম ও সপ্তম কাণ্ড পরবর্তীকালের যোজনা। যে সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সেগুলি নিয়ে দেওয়া হল।

প্রক্ষিপ্ত অংশ

প্রথম : প্রথম ও সপ্তম এই দুই কাণ্ডের রচনারীতি ও ভাষা অন্য কাণ্ডগুলির তুলনায় নিকৃষ্ট।

দ্বিতীয় : অরণ্যকাণ্ডে আছে শূর্পনখা প্রথমে রামের কাছে এলে রাম তাঁকে লক্ষ্মণের কাছে যেতে বললেন কারণ লক্ষ্মণ তখন অবিবাহিত। কিন্তু বালকাণ্ডে রাম ও লক্ষ্মণ প্রভৃতি অন্যান্য ভায়েদের একই সঙ্গে বিবাহ হয়েছে বর্ণিত আছে।

তৃতীয় : প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডে রাম বিষ্ণুর অবতার, বিষ্ণুই চারভাগে বিভক্ত হয়ে রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি চার ভাই এর

দেহ ধারণ করেছেন, বলা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত রামকে কোথাও বিষ্ণুর অবতার বলা হয়নি। সেখানে রাম একজন মানুষ। তিনি বীর্যবান ক্ষত্রিয় সন্তান, সৎ, সত্যনিষ্ঠ, পিতৃভক্ত, ভ্রাতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল প্রভৃতি গুণসম্পন্ন।

চতুর্থঃ এই দুই কাণ্ডে মাঝে মাঝে নানা কাহিনী অবতারণা করার জন্য মূল কাহিনী প্রায়ই ব্যাহত হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত কোথাও মূল কাহিনী বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। এক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

পঞ্চমঃ প্রথম কাণ্ডে উল্লিখিত কোনো ঘটনার উল্লেখ অন্য কাণ্ডে নেই। এ ছাড়া ষষ্ঠ কাণ্ডের অন্তর্গত সীতার অগ্নি পরীক্ষার ব্যাপারটি পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে করা হয়। ভিণ্টারনিৎসের মতে রামায়ণের ২৪০০০ শ্লোকের মধ্যে ৪০০০ শ্লোক পরবর্তীকালের যোজনা।

বহু কাল ধরে রাম-কাহিনী গায়ক সম্প্রদায়ের গানের মাধ্যমে দেশের মধ্যে প্রচারিত হয়ে যখন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে সেই সময় সম্ভবতঃ গায়ক ও শ্রোতাদের রুচি অনুসারে মূল কাহিনীতে নানারূপ সংযোজন ও পরিবর্তন সাধিত হয়। তারপর যখন এই কাহিনী সাহিত্যিক রূপ লাভ করে তখন গ্রন্থলেখকগণ আসল ও প্রক্ষিপ্তের মধ্যে প্রভেদ করতে পারেননি। তাঁরা রামায়ণ নামে প্রচলিত যা পেলেন তাকেই লিখিত সাহিত্যিক রূপ দিলেন।

এ ছাড়া রামায়ণের যে সব পুঁথি পাওয়া গেছে তার মধ্যে এক শ্রেণীর পুঁথিতে দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত আর অন্য

শ্রেণীতে প্রথম থেকে সপ্তম পর্যন্ত কাণ্ডে সম্পূর্ণ রামায়ণের উল্লেখ আছে। লিখিত রূপলাভের পরও যে রামায়ণে অনেক নতুন জিনিস সংযোজিত হয়েছে এটা তার বিভিন্ন শাখাই প্রমাণ করে।

Lassen এর মত

রামায়ণের সংগঠনে চারিটি স্তব। প্রথম—হিমালয়ের দিকে রামের নির্বাসন এবং তার সঙ্গে লক্ষ্মণ ও সীতার অনুগমন। দ্বিতীয়—বনবাসের স্থান গোদাবরী তীর এবং সেখানে রাম মুনিদের রাক্ষসের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। তৃতীয়—রাম দক্ষিণ দেশবাসীদের পরাজিত করার চেষ্টা করেন। চতুর্থ—লঙ্কার রাজা রাবণের বিরুদ্ধে রামেব যুদ্ধযাত্রা।

তিন শ্রেণীর সমাজচিত্র

রামায়ণে আমরা তিনটি সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ দশরথ, সুগ্রীব ও রাবণ—এই তিন জনের তিনটি পরিবারের চিত্র দেখতে পাই।

আর্য রাজা দশরথের কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা তিন পত্নী ছিল। তাদের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা—বিশেষ ভাবে কৌশল্যা কৈকেয়ীয় মধ্যে। কৈকেয়ীই বেশি ঈর্ষাপরায়ণা রূপে চিত্রিতা। কৌশল্যার পুত্র রাম জ্যেষ্ঠ, কৈকেয়ীর পুত্র ভরত ও সুমিত্রার দুই পুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। দশরথ পুত্রবৎসল এবং কৈকেয়ী তাঁর প্রিয়তমা পত্নী। ঈর্ষাপরায়ণা পত্নী কৈকেয়ীকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য রাজা দশরথ তাঁর প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে বনবাস দেন ও সেই শোকে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

এই পরিবারের মধ্যে চিত্রিত পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ ও পত্নীপ্রেমের আদর্শ অতি মহৎ। ভাই ভাইএর জন্য কত বড় ত্যাগ করতে পারে তা ভরত ও লক্ষ্মণের চরিত্রের মধ্যে দেখান হয়েছে। পত্নীপ্রেম ও পতিভক্তির সুউচ্চ আদর্শ রাম ও সীতা চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত। রামায়ণ কাব্যের মধ্যে 'সীতায়াশ্চরিত মহৎ' এটিই যেন কবির প্রধান বক্তব্য। শত দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়ে এমন কি নির্বাসিত হয়ে সীতা পতি রামের উচ্চ আদর্শের প্রতি সমান বিশ্বাস রেখেছিলেন।

সুগ্রীব এবং বালি অন্য একটি সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রথমে গভীর ভ্রাতৃস্নেহ ছিল কিন্তু অবস্থা-বিপাকে ও ভ্রান্ত ধারণায় সেই ভ্রাতৃসৌহার্দ ভঙ্গ হয় এবং বড় ভাই বালি সুগ্রীবকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে তার পত্নী রুমাকে পত্নীরূপে ব্যবহার করে। কিন্তু আবার মৃত্যুর সময় সেই বালি তার পত্নী ও পুত্রকে সুগ্রীবের হাতে সমর্পণ করে শান্তিলাভ করে। বনবাসী এই (বানর) জাতির মধ্যে নর-নারীর সম্পর্ক অনেকটা শিথিল, অন্য সমাজের মত নয়।

তৃতীয় চিত্র রাবণের পরিবারের, রাক্ষস সমাজের। রাক্ষসরা প্রবঞ্চনাপরায়ণ, ধর্মাধর্মজ্ঞানহীন ও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির। রাবণের ভগিনী শূর্পনখা অত্যন্ত প্রগলভভাবে লক্ষ্মণের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে পারে। রাবণ নিজে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও দুর্ধর্ষ স্বভাবের। সে অবিবেকী ও খামখেয়ালী। সে যখন খেয়ালের বশে চলে তাকে স্ত্রী, ভাই, মন্ত্রী প্রভৃতি কেউই প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে না। এইসব অসৎগুণ সত্ত্বেও সে একজন বীর।

রচনা কাল

রামায়ণের রচনাকাল অতীতের অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে আছে। আমাদের কাছে যে রামায়ণ এসে পৌঁছেছে কাল-পরিক্রমা করে, তাতে তুই কাণ্ড প্রক্ষিপ্ত এবং ষষ্ঠ কাণ্ডের মধ্যেও কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে বলে অনেকে মনে করেন। প্রথম মৌল অংশ ও পরবর্তী যোজনার কাল এবং উভয়ের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান—এই সমস্ত বর্তমানে সঠিকভাবে নির্ণয় করা এক তুরূহ ব্যাপার।

দেখা গেছে, প্রক্ষিপ্ত অংশে রাম বিষ্ণুর অবতার কিন্তু মূল অংশে কোথাও তাঁকে অবতার বলা হয়নি। সেখানে তিনি একজন শৌর্যবীর্যবান ক্ষত্রিয় রাজকুমার। আবার উত্তর কাণ্ডে দেখা যায় রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকি ও রাম সমসাময়িক। এইসব পরিবর্তন ঘটতে নিঃসন্দেহে বহু বৎসর অতিবাহিত হয়েছে।

Weberএর মত

(১) *Weber* সাহেব রামায়ণকে পুরোপুরি একটি রূপক বলে মনে করেন। সেই কারণে এর ঐতিহাসিকতা অত্যন্ত কম। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, রামায়ণ আর্যসভ্যতা দাক্ষিণাত্যে—এমন কি সিংহল পর্যন্ত বিস্তারের পরিচয় দেয়।

(২) এই মহাকাব্যে তুই ক্ষেত্রে 'যবন' শব্দের প্রয়োগ দেখে অনেকে মনে করেছিলেন এটি গ্রীক প্রভাবজাত এবং ভারতে গ্রীকদের আগমনের পরে তাদের মহাকাব্যের আদর্শে রামায়ণ রচিত কিন্তু পরবর্তী গবেষকগণ এই মত খণ্ডন করেছেন। ঐ শব্দটি পরবর্তী সময়ে প্রক্ষিপ্ত বা ঐ শব্দের দ্বারা

একসময়ে প্রাচীনকালে যেসব বৈদেশিক জাতি উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করেছিল তাদের বোঝায়। এই কারণে বলা হয় ভারতে গ্রীক আগমণের আগেই রামায়ণ রচিত হয়েছে।

(৩) খৃঃ পূর্ব ৩৮০তে পাটলিপুত্র এক বিরাট সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় এবং তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে অথচ রামায়ণে তার কোনো উল্লেখ না থাকায় মনে হয় পাটলিপুত্র নগরী প্রতিষ্ঠার পূর্বে রামায়ণ রচিত।

(৪) রামায়ণে কোশলের রাজধানী 'অযোধ্যা' নামে উল্লিখিত। বৌদ্ধ ও জৈনদের সময়ে এর নাম হয়েছিল 'সাকেত'। রামায়ণে কোথাও 'সাকেত' নামের উল্লেখ না থাকায় মনে করা হয়, ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমত আবির্ভাবের বহুপূর্বে রামায়ণের উৎপত্তি।

(৫) রামায়ণে মিথিলা ও বিশালা নামে দুইটি পৃথক নগরীর উল্লেখ আছে কিন্তু বুদ্ধদেবের সময়ে এই দুইটি নগরী একই শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই মিলিত রাজ্যের নাম হয় বৈশালী। 'বৈশালী' নামোল্লেখ না থাকায় বৌদ্ধযুগের আগেই যে রামায়ণ রচিত—এই মত সমর্থিত হয়।

(৬) রামায়ণে কোনো চরিত্র ঐতিহাসিক নয়। সীতা আর্যদের কৃষির রূপক। রাবণের কবল থেকে সীতা উদ্ধার-কাহিনী আর্যদের কৃষিসভ্যতা রক্ষার কাহিনী।

তাছাড়া বৌদ্ধদের অনেকগুলি জাতক রচিত হয়েছে রাম কাহিনীর উপর ভিত্তি করে—বিশেষভাবে বৌদ্ধ ত্রিপিটকের

অন্তর্গত দশরথ-জাতক নামে যে জাতক আছে তাতে রামায়ণের মূল কাহিনী একটু পরিবর্তিত করে বলা হয়েছে। ত্রিপিটকের রচনা সময় খৃঃ পূর্ব তৃতীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে। এর পূর্বেই রামকাহিনী প্রচলিত ছিল কিন্তু রামায়ণ কাব্যকার পায়নি বলে ভিণ্টারনিৎস মনে করেন।

রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্বাপর্য

(৭) ভারতের ভাবধারানুযায়ী রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী, কারণ রাম অবতার ত্রেতা যুগের আর কৃষ্ণ দ্বাপর যুগের। তাছাড়া মহাভারতের কোনো চরিত্রের উল্লেখ রামায়ণে নেই অথচ রামায়ণের চরিত্রের নাম ও রামোপাখ্যান মহাভারতে আছে। (বনপর্ব ম. ভা)

ম্যাকডোনালের মতানুসারে মূল রামায়ণ খৃঃ পূর্ব ৫০০ অব্দের আগেই রচিত হয়েছে এবং অন্য অংশ খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বা তার পরে যুক্ত হয়েছে। য্যাকবি বলেন—মহাভারত শেষ মহাকাব্যাকৃতি লাভের আগেই রামায়ণ প্রাচীন কাব্যরূপে পরিচিত ছিল।

রামায়ণ মহাভারতের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য

রামায়ণ ও মহাভারত দুই মহাকাব্য ছন্দোবদ্ধ রচনা। কিন্তু মহাভারতে প্রাচীন উপজাতি ও বংশস্থ ছন্দের বহু শ্লোক আছে। এক লক্ষ শ্লোক বিশিষ্ট মহাভারতে নানা শ্রেণীর প্রাচীন কাহিনী, নীতি-ধর্মমূলক আখ্যান প্রভৃতি রয়েছে যেজন্য একে ইতিহাস পুরাণ বা আখ্যান বলে অভিহিত করা যায় কিন্তু রামায়ণ মহাকাব্য।

মহাভারত একজন কবির লেখা একটি সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ নয়। ইহা বহু লেখকের লেখা নানা শ্রেণীর কাহিনীর সংকলন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার আদি কবি বাল্মীকির রচিত মহাকাব্য রামায়ণ। মহাভারতে সঞ্জয় উবাচ, যুধিষ্ঠির উবাচ প্রভৃতি যে রীতির আশ্রয়ে বর্ণনা আছে রামায়ণে সেরূপ নেই।

ভিণ্টারনিৎস দুই মহাকাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করে বলেছেন রামায়ণ পরবর্তীকালের মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। এর ভাষা ও ভাব কাব্যের দিক থেকে অনেক উন্নত শ্রেণীর। মহাভারতের সঞ্জয় উবাচ, কুন্তী উবাচ, যুধিষ্ঠির উবাচ প্রভৃতি প্রাচীন লোকগাথার পরিচায়ক, রামায়ণে এরকম নেই। সেখানে শ্লোকের মধ্যে বক্তার উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই মহাকাব্যের মধ্যে প্রদত্ত সমাজচিত্রেও অনেক পার্থক্য। মহাভারতের মানুষ অধিক যুদ্ধ পরায়ণ (more warlike)। এখানে সূত শ্রেণীর লোক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে যুদ্ধ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে এবং তার বর্ণনা করে রাজরাজড়াদের কাছে। মহাভারতে দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর দৃষ্টান্ত দেখে মনে হয় সেই

দুই মহাকাব্যের সমাজচিত্র

যুগে নারীর বহুপতিগ্রহণের প্রথা বিদ্যমান ছিল কিন্তু রামায়ণে এমন কোনো নজির নেই। মহাভারতের নারীগণের চরিত্রে ক্ষত্রিয় রমণীসুলভ তেজস্বিতা ও শৌর্যের পরিচয় পাওয়া যায় আর রামায়ণের রমণীগণ পরবর্তীকালের মহাকাব্যে (court epics) চিত্রিত রমণীর ন্যায় কোমলস্বভাবা। রামায়ণের সীতা চরিত্রে যে কোমলতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়, মহাভারতের

দ্রৌপদী কুন্তী গান্ধারী চরিত্র তেমন নয়। তারা একটি বীর যুদ্ধপ্রিয় জাতির বীররমণী। রামায়ণের কৌশল্যা কৈকেয়ী পরবর্তীকালের সংস্কৃত নাটকের চিরাচরিত রাণীদের মত।

মহাভারত জনপ্রিয় মহাকাব্য ও পুরাণের মিশ্রণ। এতে বিভিন্ন আখ্যান উপাখ্যান ছাড়াও বহু ধর্মতত্ত্ব ও নীতিবিষয়ক কবিতা আছে, রামায়ণ এরূপ নয়। রামায়ণ একত্রে আলংকারিক ও জনপ্রিয় মহাকাব্য। রামায়ণ সত্যই জনসাধারণের কাব্য, কারণ এটি যুগ যুগ ধরে ভারতবাসীর চিন্তাধারা ও কাব্য-সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। জনমানসে মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণেরই প্রভাব যেন বেশী বলে মনে হয়।

ভিণ্টারনিৎস আলোচনা শেষে বলেছেন—মহাভারত পশ্চিমভারতের একটি জনপ্রিয় রুক্ষজাতির পরিচয় দেয় আর রামায়ণ পূর্বভারতের অপেক্ষাকৃত উন্নতশ্রেণীর সভ্যতার পরিচয় বহন করে। তাঁর মতে রামায়ণ ও মহাভারত রচনা কালের বিশেষ ব্যবধান নেই। তিনি বলেন—The Mahabharata reflects a rougher civilization of western India while the Ramayana reflects a more refined civilization of Eastern India, and that two epics do not represent the poetry of different periods, but off different regions of India.

রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্বাপর্য আলোচনা করতে গিয়ে গবেষকগণকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। য্যাকবি বলেন—মহাভারত মহাকাব্যকৃতিলাভের আগেই রামায়ণ প্রাচীন

কাব্যরূপে পরিচিত ছিল। রামায়ণ মহাভারত থেকে আকারে অনেক ছোট। দুটিতেই পরবর্তীকালে বহু অংশ সংযোজিত হয়েছে। মহাভারত আকৃতিতে রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ বলে তাতে সংযোজন যত বেশী রামায়ণে তত নয় এবং মহাভারতে বেশী সংযোজন হতে সময়ও বেশী লেগেছে। সেইজন্য পণ্ডিতগণ মনে করেন মহাভারত শেষরূপ লাভ করার অনেক আগেই রামায়ণ শেষরূপ লাভ করেছে এবং একথাও স্বীকৃত হয়েছে যে মূল রামায়ণ মূল মহাভারতের পূর্বকালীন। *Winternitz* বলেন—'If the Mahabharata already had on the whole its present form in the fourth century A. D. then the Ramayana must have received its final form at least one or two centuries earlier তিনি মূল রামায়ণের রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী বলে উল্লেখ করেছেন। আর ম্যাকডোনেল বলেছেন—'the kernal of the Ramayana was composed before 500 B. C *Winternitz* আবার একথা বলেছেন যে মহাভারত কাব্যের মূল ঘটনা রামায়ণের মূল ঘটনা থেকে সম্ভবতঃ প্রাচীনতম। যাই হোক, রামায়ণ মহাভারতের পৌর্বাপর্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে একথা স্বীকৃত যে মহাভারতের বর্তমান আকৃতিলাভের আগেই রামায়ণ বর্তমান আকৃতি লাভ করেছে।

পৌর্বাপর্য

মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণের প্রাচীনত্বের পক্ষে আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন মহাভারতে রাম-কাহিনীর স্থানলাভ, শৃঙ্গবেরপুর রামের পদার্পণে পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত। মহাভারতের চরিত্রগুলি দোষগুণসম্পন্ন পুরোপুরি মানুষ আর রামায়ণের ঘটনাবলীর মধ্যে অলৌকিকত্বের চিহ্ন আছে। যেমন বানরসেনার দ্বারা সমুদ্রের সেতুবন্ধন, লাঙ্গুল-যুক্ত হনুমানের অবিশ্বাস্য ক্ষমতা—একলাফে সমুদ্র পার, লাঙ্গুলের আগুনে লঙ্কাদাহ, গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন প্রভৃতি। দশরথের পরিবারের ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য যাদের কথা আছে তাদের অধিকাংশই অবিশ্বাস্য বা অলৌকিক ধরনের চরিত্র। এই সব অলৌকিক ও অতিশয়োক্তির বাহুল্য অধিক প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। এই সমস্ত নানা কারণে রামায়ণকে মহাভারতের পূর্ববর্তী বলে মনে করা হয়।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের অন্তর্গত দশরথ-জাতকে আছে যে ভরতের কাছে পিতা দশরথের মৃত্যুসংবাদ শুনে রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে মৃতপিতার উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিতে বলেছেন এবং মৃত্যুর জন্য দুঃখ করা বৃথা এই উপদেশ দিয়েছেন। এই জাতকটির মূল প্রাচীন রামগাথা। এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় যে জাতকে কোথাও রাবণ বা হনুমানের কথা নেই। জাতকের রামকাহিনী দেখে মনে হয় খৃঃ পূর্ব তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ত্রিপিটক রচনার সময়ে প্রাচীন রামকাহিনী প্রচলিত ছিল, তবে তখনও সেটা মহাকাব্যরূপ লাভ করেনি। যাাকবির মতেও রামায়ণ প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে রচিত। কারণ বৌদ্ধধর্মের

বাণী তখনকার জনসাধারণের ভাষা পালিতে প্রচারিত হয়েছে। বৌদ্ধযুগে সাধারণের চলতি ভাষারূপে সংস্কৃতের প্রচলন ছিল না। রামায়ণের ভাষা সংস্কৃত ও এটি জনপ্রিয় মহাকাব্য, সেই সময়ের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষাতেই রচিত। প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে যখন সংস্কৃত জনসাধারণের চলতি ভাষা ছিল রামকাহিনী সেই সময়ের রচনা। সে সময় এটি রামগাথা হিসাবে জনসমাজে প্রচলিত ছিল, রামায়ণ মহাকাব্যরূপ লাভ করেনি। অনেকে মনে করেন রামের অত্যধিক শান্তপ্রকৃতি ও শান্তিপ্রিয়তা বৌদ্ধপ্রভাবের ফল। খৃঃ পূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকের বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ রচয়িতাদের যদিও রামায়ণ মহাকাব্যের কোনো জ্ঞান ছিল না তবু তাঁরা প্রাচীন রামগাথার বিষয় কিছু জানতেন, সেই কারণে অপ্রত্যক্ষভাবে রামায়ণের ওপর কিছু বৌদ্ধপ্রভাব এসে থাকতে পারে।

বৌদ্ধযুগ ও রামায়ণ

মহারাজ কণিষ্কের সমসাময়িক বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত রামায়ণের আদর্শে সংস্কৃত রচনা। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমদিকে রাজা কণিষ্কের সময়ে রামায়ণ আদর্শ কাব্যহিসাবে গৃহীত হয় অর্থাৎ এই সময়ে রামায়ণকে মহাকাব্যরূপে পাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর সময়ে রামায়ণ একটি প্রসিদ্ধ জনপ্রিয় কাব্যহিসাবে বৌদ্ধদের মধ্যে পরিচিত ছিল।

পরবর্তী-কালের ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের উপর রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব অপরিসীম।

ভর্তৃহরি, কালিদাস, কুমারদাস প্রভৃতি কবিদের কাব্যের মূল কাহিনী রামায়ণের। বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত রামায়ণের আদর্শে লিখিত। এতে অনেক জায়গায় রামায়ণের ভাবসাদৃশ্য আছে। ভাস, ভবভূতি প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাট্যকারের কাহিনী রামায়ণের। অধ্যাত্ম-রামায়ণ ও বশিষ্ঠ রামায়ণের উৎস বাল্মীকি-রামায়ণ। যুগ যুগ ধরে রামায়ণ ভারত-মানসকে সরস ও সজীব করে রেখেছে। ভারতের ঘরে ঘরে রামায়ণ পাঠ হয়। ভারতের প্রায় প্রত্যেক উন্নত প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ অনূদিত হয়েছে। রাম রসায়ণ বা রামায়ণগাণ ভারতে এখনও পর্যন্ত, এই সিনেমা-থিয়েটারের যুগেও জনপ্রিয়তা হারায়নি। এখনও শহরে ও গ্রামে রামায়ণগানের সময় শত সহস্র দর্শকের ভিড় হয়। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত যাত্রা ও নাটকের অভিনয় বহু দর্শক আকর্ষণ করে। রামায়ণে চিত্রিত পুরুষ ও নারী চরিত্র ভারতীয় নরনারীর আদর্শ। সেখানে প্রদর্শিত পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, প্রভুভক্তি, পতিপত্নীপ্রেম ভারতবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণের চেষ্টা করে। রামায়ণের ভাবানুবাদ বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বিশেষ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। হিন্দী অনুবাদ তুলসী দাসের রামচরিত-মানস বিহার উত্তরপ্রদেশে ঘরে ঘরে পঠিত হয়। এ যুগেও রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে প্রাদেশিক ভাষায় রচিত বহু কাব্য নাটক আধুনিক মনেরও রসপিপাসা মেটাতে সমর্থ।

পরবর্তীকালের সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

ভারতীয় তথা সংস্কৃত সাহিত্যে রামায়ণের মতো মহাভারতেরও প্রভাব অপরিসীম। সংস্কৃত নাট্যকার ভাসের কয়েকটি নাটকের কাহিনী মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে।

মহাভারতের প্রভাব

মহাকবি কালিদাসের বিশ্ববিখ্যাত অমর নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ মহাভারতের অন্তর্গত শকুন্তলোপাখ্যানের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ভারবির মহাকাব্য কিরাতার্জ্জুনীয়ম, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতম্ ও মাঘের শিশুপালবধম্ এর কাহিনী মহাভারত থেকে নেওয়া। যুগ যুগ ধরে মহাভারতও রামায়ণের মতো ভারতবাসীর মনে প্রভাব বিস্তার করে আসছে। প্রাদেশিক সাহিত্যের উপরও এর প্রভাব এসে পড়েছে। বাংলা কাশীদাসী মহাভারত বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধবাসরে মহাভারতের কিছু অংশ (বিরাট পর্ব) পাঠ করার রীতি প্রচলিত আছে। মহাভারত সম্বন্ধে একটি কথা প্রচলিত। যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ। যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে—এই কথাটি ভারতবাসী অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে থাকে।

———

পুরাণ

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে পুরাণগুলির একটি বিশেষ স্থান আছে। পুরাণ শব্দের অর্থ প্রাচীন কাহিনী। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণ,—একত্রে উল্লিখিত হয়েছে। ইতি-হ-আস পুরাণম্-এর অর্থ একত্রে প্রাচীন কাহিনী এইরূপই ছিল।

বৈদিক যুগের পর এই প্রাচীন কাহিনী দ্বিধা বিভক্ত হয় ; বাস্তব ঘটনা ও মানুষ নিয়ে হল ইতিহাস আর পুরাণের বিষয় হল দেবতা, অসুর, কখনও কখনও বা মানুষ। পুরাণের

বৈশিষ্ট্য

মানুষকে ঐতিহাসিকরা বিশেষ গুরুত্ব দেন না। এখানে দেবতাদের বিভিন্ন অবতাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভাবের কথা আলোচিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাকডোনেল বলেছেন—closely connected with the Mahabharata is a distinct class of eighteen epic works, didactic in character and sectarian in purpose, going by the name of Puranas.

মহাভারতে এক জায়গায় বলা হয়েছে, পুরাণ দেবতাদের কাহিনী ও মুনিঋষিদের বংশ পরিচয়। ঋগ্বেদের সূক্ত ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে উল্লিখিত বহু কাহিনী পুরাণে পাওয়া যায়। পুরাণগুলির লিখনশৈলী অনেকটা মহাভারতের মত, তাই মহাভারত ও তার পরিশিষ্ট অংশ হরিবংশ পুরাণের লক্ষণাক্রান্ত, এমনকি

রামায়ণের কিছু অংশও সেইরূপ। পুরাণগুলিতে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের মতবাদ আলোচনা করা হয়েছে। তাই ম্যাকডোনেল আরো বলেছেন:—

Besides cosmogony they deal with mythical descriptions of the earth, the doctrine of the cosmio ages, the exploits of ancient gods, saints, ane heroes, accounts of the Avataras of Visnu, the geneologies of solar and luner race of kings and innumerations of the thousand names of Visnu and Shiva. They also contain rules about the worship of the god by means of prayers, fastings, votive offeriugs, festivals and pilgrimages.

ব্যাস নিজে মহাভারতকে পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেছেন। বৈদিক সাহিত্যে পুরাণ ও ইতিহাস একার্থক। পরে পৃথক করা হয়েছে।

বায়ুপুরাণে পুরাণের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে:— (:৪-১০-১১)।

লক্ষণ

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (প্রলয়ের পর নতুন সৃষ্টি), বংশ (দেবতা ও ঋষিদের বংশ পরিচয়), মন্বন্তর (মনুর শাসন সময়) ও বংশানুচরিত (নৃপতিগণের বংশের ইতিহাস)—পুরাণে এই

পাঁচটি বিষয় থাকতে পারে। তবে বহু পুরাণে সমস্ত বৈশিষ্ট্য-গুলি পাওয়া যায় না, তাতে মনে হয়, আমরা যে রূপে পুরাণ-গুলি পেয়েছি, তা পুরাণের নতুন সংস্করণ। সব পুরাণেই যে এই সব বিষয়গুলি আছে এমন নয়, কোথাও বা কয়েকটি বিষয় কম আবার কোথাও বা এগুলি ছাড়াও অন্যান্য বিষয় আছে। যেমন—ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, শারীরবিদ্যা, ব্যাকরণ, বাস্তুবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা অনেক পুরাণের মধ্যে পাওয়া যায়।

পুরাণগুলির এক একটিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই তিন দেবতার এক একজনের পূজার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এক একশ্রেণীর পুরাণে এদের এক একজনের দেবতাবাদ স্বীকৃত হয়েছে।

মৎস্য পুরাণে গুণানুসারে পুরাণগুলিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে আর দেবী ভাগবত সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণানুসারে তিন ভাগ করেছে। প্রধান শ্রেণীবিভাগে পুরাণগুলির সংখ্যা আঠারো।

শ্রেণীবিভাগ

যেমন ঃ—(১) রাজস্ পুরাণ (এখানে ব্রহ্মার দেবত্ব ও প্রাধান্য)—ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন।

(২) স্বাত্ত্বিক (বিষ্ণুর প্রাধান্য)—ভাগবত, নারদীয়, গরুড়, পদ্ম, বরাহ, বিষ্ণু।

(৩) তামস—(শৈব) শিব, লিঙ্গ, স্কন্দ, অগ্নি, মৎস্য, কূর্ম। কোনো কোনো জায়গায় শিব পুরাণের স্থলে বায়ু

পুরাণের নাম আছে। পুরাণগুলির সমসংখ্যক উপপুরাণ। রঘুনন্দন আঠারোটি পুরাণের নাম করেছেন।

পুরাণগুলির কাহিনী বহু প্রাচীন—এমন কি পুরাণোক্ত অনেক ঘটনা ও কাহিনীর উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যেও পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-উপনিষদে পুরাণের নামোল্লেখ থাকলেও ঐ যুগে পুরাণ নামে কোনো সাহিত্য ছিল বলে প্রমাণ নেই, তবে পরে সূত্র সাহিত্যে পুরাণের শ্লোকোদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে সূত্রযুগে পুরাণ নামে একশ্রেণীর সাহিত্য ছিল।

প্রাচীনত্ব

Winternitz মনে করেন—মহাভারত শেষ রূপ লাভ করার আগে পুরাণ নামে এক শ্রেণীর সাহিত্য ছিল। ভারতে প্রচলিত ধারণানুসারে ব্যাসদেব বেদের বিভাজক, মহাভারত রচয়িতা এবং পুরাণেরও তিনি রচয়িতা। মহাভারত ও তার পরিশিষ্ট হরিবংশ পুরাণের লক্ষণাক্রান্ত।

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর মত পুরাণের অনেক কাহিনী বহু প্রাচীন এবং এগুলি গায়ক সম্প্রদায়ের মুখে মুখে বহুকাল ধরে চলে এসেছে। অনেকে মনে করেন, মূল মহাভারতের মতো এককালে মূল পুরাণও প্রচলিত ছিল, কালক্রমে তা লুপ্ত বা সংক্ষিপ্ত হয়ে রূপান্তর লাভ করেছে।

সূত বা পেশাদারি গায়ক সম্প্রদায়ই দেবতা, ঋষি ও রাজ-বংশের কাহিনী স্মৃতিতে যুগ যুগ ধরে বহন করে এনেছিল। পরবর্তীকালে এগুলি সাহিত্যিক রূপ লাভ করে পুরাণের মধ্যে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় পুরাণগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত বেশি। খৃষ্ট পূর্ব যুগের ইতিহাসের প্রধান উপাদান

পুরাণ। এগুলির মধ্যে বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ, অন্ধ্র ও গুপ্তবংশ। তবে বর্ণনার মধ্যে বহু অতিরঞ্জন ও আতিশয্য আছে।

ঐতিহাসিক মূল্য

এককালে পুরাণ-সমূহ ভারতে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। এগুলি জনসাধারণের জন্য রচিত। কারণ ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর জাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার ছিল না। পুরাণ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পুরাণে ধর্মমত ও অন্যান্য তত্ত্ব অত্যন্ত সরলভাবে বোঝানো হয়েছে, তা ছাড়া এখানে উল্লিখিত ধর্মানুষ্ঠান সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

উপযোগিতা

পুরাণগুলি বেদকে অনুসরণ করেছে। পুরাণং বেদসম্মতম্। এগুলি সাধারণের মধ্যে বেদের দুরূহ তত্ত্বকে সহজ ভাবে প্রচার করেছে। পুরাণ বেদমন্ত্রের ভাষ্যের মত। বেদের অনেক দুর্বোধ্য মন্ত্রের অর্থ পুরাণ পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়েছে। সেই কারণে পুরাণকে বেদের পরিপূরক বলা চলে। পুরাণ বৈদিক ধর্মকেই সাধারণ্যে প্রচার করেছে, কখনও বেদকে অবজ্ঞা করেনি।

পুরাণগুলি প্রথমে সূত জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। তারাই ক্ষত্রিয় রাজাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তাদের বীরত্বের কাহিনী সংগ্রহ করত ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করত। এরা জনসমাবেশে পুরাণপাঠের সময় মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য অনেক বিষয় বাড়িয়ে বলেছে। প্রথমে তাই

পুরাণগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণদের কোন সম্পর্ক ছিল না, যতদিন এগুলি সূতশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সেই সময় এদের মধ্যে ধর্মানুষ্ঠান ও বৈদিক যাগযজ্ঞ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের বিষয় স্থান পায় নি। পরবর্ত্তী কালে যখন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরাণ প্রচারের ভার পড়ল তখনই এগুলির মধ্যে নানা যাগযজ্ঞ, ব্রতানুষ্ঠান ও অন্যান্য ধর্মগত বিষয় যুক্ত হয়।

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মপুরাণের অধিকাংশ অংশই পরবর্ত্তীকালের রচনা। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ বৈষ্ণবগণের পরম শ্রদ্ধেয় ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। পুরাণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে পঞ্চলক্ষণের কথা পূর্বে বলা হয়েছে তাদের মধ্যে বিষ্ণু, মৎস্য, বায়ু ও শৈবপুরাণ ওই পঞ্চ লক্ষণ অনুসরণ করেছে।

পুরাণগুলি আকৃতি ও বিষয়বস্তুতে মহাকাব্য ও আইন গ্রন্থগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। মহাকাব্য, আইনগ্রন্থ ও পুরাণ—এই তিন শ্রেণীর সাহিত্য প্রায় একই শ্রেণীর শ্লোক ও সংস্কৃতে লিখিত, অনেকগুলির বিষয়বস্তু একই ধরণের ; এমন কি অনেক ক্ষেত্রে শব্দে শব্দে মিল আছে। এতে মনে হয় একই উৎস থেকে এই তিন শ্রেণীর সাহিত্যের সৃষ্টি।

প্রচীনপন্থীরা পুরাণ সমূহের দৈব উৎস মনে করেন। পুরাণগুলির এক এক ঋষি বক্তা। এঁরা ব্যাসের কাছ থেকে কাহিনীগুলি পেয়েছেন, ব্যাস আবার ব্রহ্মার কাছ থেকে পেয়েছেন। কাহিনীগুলি প্রধান বক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যে কথোপকথনের আকারে দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বক্তা লোমহর্ষণ বা তার পুত্র উগ্রশ্রবা। লোমহর্ষণ একজন সূত

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের শঙ্কর জাতি। এরাই পুরাণ কাহিনীর সংগ্রহ কারী, রক্ষক, বাহক ও প্রচারক। পুরাণগুলি সূত সম্প্রদায়ের হাত থেকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এলে এতে ক্রমশঃ ক্ষত্রিয় রাজা ও রাজবংশের কথা কমে দেবতাদের কাহিনী, দেবোপাসনা, বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের বিষয় স্থান লাভ করে। যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে রচিত মহাভারত যেমন কালক্রমে ধর্মগ্রন্থে পরিণতি লাভ করেছে, পুরাণের ক্ষেত্রেও সেই একই গতি হয়েছে। পুরাণ-গুলির মুখ্য বিষয় শৈব ও বৈষ্ণব মতবাদ প্রচার।

এগুলির মধ্যে পুরাণ ও নতুন দুই শ্রেণীর উপাদান আছে। অথর্ববেদে উল্লিখিত ইতিহাস—পুরাণ শব্দে গায়ক (সূত) সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন কাহিনীকে বোঝায়। উপনিষদ্ (ছান্দোগ্য) ও প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে (সুত্তনিপাট) পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলা হয়েছে। পুরাণ কতকাংশে পৌরাণিক, কতকাংশ ঐতিহাসিক। ভবিষ্যপুরাণের নাম আপস্তম্বের ধর্মসূত্রে আছে, সেজন্য সেটি খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর আগের বলে ধরা হয় এবং হয়তো আরো পুরাণো হতে পারে। অথর্ববেদে ইতিহাস-পুরাণ এই শব্দের উল্লেখে মনে হয়, সেই অথর্ববেদের যুগেও এই রকম একশ্রেণীর সাহিত্য প্রচলিত ছিল। আবার এদিকে অনেক পুরাণের বহু বিষয় অনেক পরবর্তী কালের। যেমন ব্রহ্মপুরাণে কোণারকের সূর্য মন্দিরের কথা আছে। ঐ মন্দিরের নির্মাণকাল ১২৪১ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই পুরাণে ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনাও স্থান পেয়েছে।

আপস্তম্ব সূত্রে পুরাণের শ্লোকোদ্ধৃতি দেখে পণ্ডিতগণ মনে

করেন খৃঃ পূঃ পঞ্চম বা চতুর্থ শতকের পূর্বে পুরাণ নামে এক বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য প্রচলিত ছিল, আবার অনেক পুরাণে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মৌর্য, গুপ্ত প্রভৃতি রাজবংশের উল্লেখ দেখে মনে হয় প্রথম দিকের অনেক পুরাণ খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতকের আগেই রচিত হয়েছে। মহাকবি বাণভট্ট (খৃঃ ৬২৫), দার্শনিক কুমারিল (খৃঃ ৭৫০) শঙ্করাচার্য (খৃঃ নবম শতক) প্রভৃতি অনেকে পুরাণের কথা বলেছেন। তাতে পুরাণের রচনাকাল সম্বন্ধে উপরের মতই প্রমাণিত হয়।

রচনা কাল

পরবর্তী কালের সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্য এবং সংস্কৃতির উপর পুরাণের প্রভাব অপরিসীম। ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি ধর্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, পুরাণ এদের সহায়ক হয়েছে। ই পুরাণ সাহিত্য ভারতবাসীর ধর্মপিপাসা ও গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছে বহুকাল ধরে। পুরাণের কাহিনী যাত্রা ও কথকতার মাধ্যমে ভারতমানসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ঋগ্বেদের কাল থেকে পুরাণের পূর্ব পর্যন্ত বৈদিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ছাড়া অন্যজাতির অধিকার ছিলনা। বৈদিক সাহিত্য ও ধর্ম জনসাধারণের ছিল না, বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে (পুরোহিত বা ব্রাহ্মণদের) ছিল সীমাবদ্ধ। পুরাণ এই বৈদিক ধর্মবোধকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছে।

পরবর্তী কালের সাহিত্যে ও জীবনে প্রভাব

পুরাণগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব। পরবর্তীকালে সংস্কৃত কবি ও নাট্যকারগণ পুরাণের বহু কাহিনী অবলম্বনে

নতুন নতুন কাব্য নাটক রচনা করে সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। সংস্কৃত-অলংকারিকদের লক্ষণ অনুসারে নাটক ও মহাকাব্যের মূল কাহিনী হবে খ্যাতবৃত্ত পুরাণ-প্রসিদ্ধ। এদের নায়ক হবে পুরাণোক্ত বীর পুরুষ। পরবর্তীকালে ভারতীয় সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত। কালিদাসের বিশ্ব-বিখ্যাত নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের কাহিনী পদ্মপুরাণের এবং মহাভারতের। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্ভুক্ত চণ্ডী ভারতীয় ধর্ম-জীবনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছে। এটি হিন্দুদের ঘরে ঘরে পঠিত একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সাহিত্য ভাগবৎ পুরাণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এই প্রভাবের অনবদ্য ফলশ্রুতি, সংস্কৃত গীতিকাব্যের মহার্ঘ রত্ন। বৈষ্ণবগণের অতি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবৎ। ভাগবৎ একদিকে যেমন পরবর্তীকালের সংস্কৃত-সাহিত্য অপরদিকে তেমনি প্রাদেশিক সাহিত্য, বিশেষভাবে বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত ও ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ করেছে।

তন্ত্র

তন্ত্র বলতে এক শ্রেণীর ধর্ম গ্রন্থকে বোঝায়। আগম, তন্ত্র ও সংহিতা—এই তিন শ্রেণীর রচনা তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। বৈদিক যুগের অবসানে বৌদ্ধযুগে তন্ত্রের আবির্ভাব। অনেকের মতে তন্ত্রমত বেদ-বহির্ভূত। যে সময় জটিল-পদ্ধতির বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সাধারণের কাছে কষ্টকর হয়ে ওঠে

সেই যুগে অর্থাৎ বৈদিক যুগের পরবর্ত্তীকালে তন্ত্র ভারতবর্ষে প্রচার লাভ করে। তন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে অবৈদিক বলা ঠিক নয়। কারণ এদের কতকগুলি বেদ অনুসরণ করে আর কতকগুলি করে না।

শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবতন্ত্রগুলি বৈদিক আর বৌদ্ধ, জৈন তন্ত্রগুলি অবৈদিক।

তন্ত্রগুলির বক্তব্য বিষয় চারটি—জ্ঞান, যোগ, ক্রিয়া ও কার্য্য। বৈদিকযুগে যখন বৌদ্ধধর্মমত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার-লাভ করে সেই সময় বহু তন্ত্র রচিত হয়।

বৈশিষ্ট্য

তন্ত্রগুলি বৌদ্ধ মহাযান মতের সঙ্গে হিন্দু-ধর্মমতের একটা সমন্বয়-সাধনের ফল। এই আদর্শে বহু তন্ত্র রচিত হয়। পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধমত-প্রভাবিত অনেক তন্ত্র হিন্দুদের সাহিত্যে স্থান পায়। কতকগুলি আবার সম্পূর্ণরূপে বেদ-বিরোধী। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তন্ত্রের সঙ্গে পুরাণের একটা সাদৃশ্য আছে।

শৈব তন্ত্র

শৈবতন্ত্রগুলি আগম নামে পরিচিত। এগুলির সংখ্যা আঠাশ। অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ—এই তিন রকমের মতবাদ আগম-গুলিতে পাওয়া যায়। মালিনীবিজয়, স্বচ্ছন্দ, বিজ্ঞানভৈরব, আনন্দভৈরব, মৃগেন্দ্র, স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি আগমের নাম উল্লেখ-যোগ্য। প্রত্যেকটি আগমের আবার উপ-আগম আছে।

বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়েব তন্ত্রগুলি সংহিতা নামে অভিহিত। ২১৫টি সংহিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের

মধ্যে ঈশ্বর-সংহিতা, পৌষ্কর-সংহিতা, পরম-সংহিতা, অহির্বু্ধ্ন্য-সংহিতা, সাত্বত-সংহিতা, বৃহদব্রহ্ম-সংহিতা, জ্ঞানামৃতসার-সংহিতা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অহির্বু্ধ্ন্যসংহিতা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ের কাশ্মিরী রচনা।

বৈষ্ণব তন্ত্র

তন্ত্র শাক্তসম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ। শাক্তদের মতে ব্রহ্ম হলেন সেই শাশ্বত আদ্যাশক্তি এবং তিনিই জগতের উৎপত্তির উৎস। এই শক্তিকে নারী জগন্মাতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। সকল বস্তু ও জীবজগতের উৎপত্তির মূল প্রধানা প্রকৃতি, তিনিই শক্তি, তাঁকে উমা দুর্গা কালী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

শাক্ত তন্ত্র

তন্ত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহানির্বাণ-তন্ত্র। বেদান্ত ও সাংখ্য মতের সঙ্গে এখানকার দার্শনিক মতের পার্থক্য অতি সামান্য। এখানে উল্লিখিত নীতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের সঙ্গে মনুর আইনগ্রন্থ, ভগবদ্গীতা ও বৌদ্ধদের ধর্মোপদেশের যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান।

তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এই সাধনা বেশ কষ্টকর, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে সাধকের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়; তাছাড়া ধর্ম আরাধনার অন্ধবিশ্বাসে সাধক অনেক সময় ব্যভিচার ও নিন্দনীয় কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়।

তন্ত্রমত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়, বিশেষভাবে কাশ্মীর ও বাংলাদেশে। তন্ত্রমত বাঙালীর চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে পরবর্তীকালে বাঙালীর প্রাণের

অতুল্য সম্পদ বিরাট শাক্ত-সাহিত্যের সৃষ্টি। বৌদ্ধগান ও দোঁহা তন্ত্র-প্রভাবিত। বাংলার বাউলগীতি বাঙালীমানসে তন্ত্র-প্রভাবের ফল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই বাউল গানের মধ্যে বাঙালীর আপন প্রাণের সুর শুনতে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্র পরবর্ত্তী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মোহিতলালের কাব্যে তন্ত্রপ্রভাব দেখা যায়। বাংলার লৌকিক কাব্যগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে তান্ত্রিক মত অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে।

বাংলা সাহিত্যে তন্ত্র প্রভাব

তন্ত্রের প্রাচীন পুঁথিগুলির সময় সাধারণত খৃষ্টীয় সপ্তম-নবম শতক, তবে কয়েকটি তন্ত্রের কাল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত ধরা হয়ে থাকে। মহাভারতে তন্ত্রের উল্লেখ নেই, চৈনিক তীর্থযাত্রীরাও এ বিষয়ে নীরব। তন্ত্রোক্ত দুর্গাপূজার সময় বৈদিক যুগে হলেও খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের মিলন হয়।

রচনা কাল

যজুর্বেদের মত তন্ত্রের মধ্যে রহস্যময় যাদুমন্ত্রের কথা থাকলেও বৈদিকযুগে এদের আবির্ভাব হয়নি। তন্ত্রের যে প্রাচীনতম পুঁথি পাওয়া গেছে, তা নেপালী ভাষায় লেখা এবং এর সময় সপ্তম শতাব্দী। সুতরাং তন্ত্রের আবির্ভাবকাল পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীর কাছাকাছি বলে মনে করা হয়। বহু তন্ত্র ও উপতন্ত্র আছে, তাদের মধ্যে কতকগুলি তন্ত্রের নাম নিম্নে দেওয়া হল। মহানির্বাণ, কুলার্ণব, কুলচূড়ামণি, প্রপঞ্চসার (শঙ্করাচার্যের রচনা বলে পরিচিত) তন্ত্ররাজ, কালিবিলাস, জ্ঞানার্ণব, তন্ত্রসার, সারদাতিলক, প্রাণতোষিণী প্রভৃতি।

কালিদাস-পূর্ব-যুগ

য়ুরোপীয় পণ্ডিত ম্যাক্‌সমূলার মত প্রকাশ করেছিলেন যে পুরাণের পর গুপ্তযুগে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে মৌলিক কোন সৃষ্টি হয়নি,—গ্রীক, শক ও কুষাণদের আক্রমণের ফলে এই যুগে সংস্কৃতচর্চা প্রায় বন্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের পণ্ডিতগণ এই মত খণ্ডন করেছেন অনেকগুলি প্রমাণের উপর নির্ভর করে। ১৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত রুদ্রদামনের গীর্ণার প্রশস্তি কাব্যরস সমৃদ্ধ। পুলুমায়ির নাসিক প্রশস্তি প্রাকৃত রচনা হলেও কাব্যগুণ-মণ্ডিত। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর রচনা এলাহাবাদের প্রস্তর স্তম্ভে উৎকীর্ণ হরিসেনের সমুদ্রগুপ্ত-প্রশস্তি কাব্যশিল্পে উৎকর্ষের পরিচয় দেয়।

ম্যাক্‌সমূলারের মত খণ্ডন

এই সমস্ত প্রশস্তি ছাড়াও এই যুগে কাব্যচর্চা যে বন্ধ ছিল না তার আরো অন্য প্রমাণ আছে। নমি সাধু কাব্যালঙ্কারের টীকায় পাণিনি-রচিত 'পাতাল বিজয়' থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। জাম্ববতী-বিজয় নামে অন্য একখানি কাব্যও পাণিনির রচনা। রায়মুকুট অমরকোষের টীকায় এই কাব্য থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে একখানি বররুচি-কাব্যের উল্লেখ আছে আর তাছাড়া এখানে কাব্যগুণ সমৃদ্ধ বহু শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। পিঙ্গলের ছন্দস্সূত্রে মালিনী, শিখরিণী প্রভৃতি ছন্দের মনোরম নামকরণের মধ্যে রচয়িতার কাব্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

শক রাজারা যে কাব্য ও ধর্মের অনুরাগী ছিলেন এ কথা ঐতিহাসিকরা বলেন। ১৫০ খৃষ্টাব্দে শকশাসনকালে প্রশস্তির ভাষা ছিল সংস্কৃত। বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের সমসাময়িক। তিনি বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ নামে দুইটি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেন। এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা ম্যাক্সমূলারের মত খণ্ডিত হয়েছে।

আবার অনেক পণ্ডিত মনে করতেন যে প্রথমে প্রাকৃত কাব্যসাহিত্য উন্নতিলাভ করে এবং সেই আদর্শে পরবর্ত্তীকালে সংস্কৃত কাব্য রচিত হয়। এই মত সমর্থনের পক্ষে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়না।

বাৎসায়নের কামসূত্র, তন্ত্রাখ্যায়িকা, ভাসের নাটক সমূহ, অশ্বঘোষের কাব্য, আর্যশূরের রচনা, জাতক ও অবদান সাহিত্য প্রভৃতি প্রমাণ করে যে কালিদাস-পূর্বযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা বন্ধ ছিলনা, বরং ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে আসছিল।

কালিদাস-পূর্ব বৌদ্ধ-সাহিত্য

বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের যে ধর্মমূলক সাহিত্য গড়ে ওঠে তার ভাষা পুরোপুরি সংস্কৃত না হলেও সংস্কৃতের কাছাকাছি প্রায়-সংস্কৃত। এ ভাষার কিছু অংশ সংস্কৃত আর কিছু অংশ চল্‌তি ভাষা, অধ্যাপক সেনার্টের মতে এই মধ্য সংস্কৃত একপ্রকার কথ্য ভাষা। এরই নাম বৌদ্ধ সংস্কৃত। এই ভাষায় বৌদ্ধ হীন-যান সম্প্রদায়ের অনেক রচনা আছে। এই সম্প্রদায়ের মহাবস্তু,

দিব্যাববান, ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। এগুলির মধ্যে 'মহাবস্তু' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

মহাবস্তু

এই গ্রন্থটি এক সময়ের রচনা নয়, বিভিন্ন সময়ে রচিত বিক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুর সংকলন হলেও প্রাচীন সাহিত্যধারার বাহক ও গল্পের সংকলনরূপে এই গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য আছে। এটি হীনযান সম্প্রদায়ের রচনা তবে মহাযান সম্প্রদায়ের রচনার সঙ্গে এর বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান।

ললিতবিস্তর

ললিতবিস্তর হীনযান গোষ্ঠীর সর্বাস্তিবাদীগণের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এটিও একজনের রচনা নয়। এতে নতুন ও পুরানো উভয় রচনা আছে।

মৈত্রেয় ব্যাকরণ নামে একটি গ্রন্থ আর্যচন্দ্রের রচিত। বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্য শারিপুত্রের কথোপকথন এর উপাদান।

সংস্কৃত-সাহিত্যে বৌদ্ধদের রচিত অনেকগুলি দার্শনিক গ্রন্থও আছে, এদের মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতাগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা। একটি প্রজ্ঞাপারমিতা ১৭৯ খৃষ্টাব্দে চীনাভাষায় অনূদিত হয়। লঙ্কাবতার, সুবর্ণপ্রভাস, বুদ্ধাবতংসক প্রভৃতি গ্রন্থ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

নাগার্জুন বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর লেখা 'মাধ্যমিক কারিকা' দর্শনশাস্ত্রের একটি মূল্যবান সম্পদ। এছাড়া তিনি মহাযানবংশিক, প্রজ্ঞাদণ্ড, শূন্যতাসপ্ততি প্রভৃতি

অনেকগুলি টীকা রচনা করেন। ইনি কুষাণরাজ কনিষ্কের সমসাময়িক।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মধ্যে দিঙ্‌নাগ স্মরণীয়। তাঁর প্রমাণ-সমুচ্চয় ও ন্যায়প্রবেশ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী তাঁর সময় বলে মনে করা হয়।

অশ্বঘোষ

সংস্কৃত সাহিত্যে বৌদ্ধ লেখকগণের মধ্যে অশ্বঘোষ শ্রেষ্ঠ। ইনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণরাজ কনিষ্কের রাজসভার পারিষদ ছিলেন। ব্রাহ্মণ সন্তান অশ্বঘোষ পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তা প্রচার করেন। অশ্বঘোষ সম্বন্ধে ডাঃ স্মিথ তাঁর History of India গ্রন্থে লিখেছেন—Asvaghosa is described as having been a poet, musician, scholar, religious controversialist and zealous Buddhist monk, orthodox in creed, and strict observer of discipline.

তাঁকে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, আচার্য, ভদন্ত, মহাবাদিন্ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হল।

বুদ্ধচরিত—এটি ১৭ সর্গবিশিষ্ট একটি মহাকাব্য। চৈনিক পরিব্রাজক এই গ্রন্থের ২৮টি সর্গ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে ১৭টি সর্গ মাত্র পাওয়া গেছে, আবার এর মধ্যে

শেষ চারটি সর্গ অমৃতানন্দ নামে অন্য এক কবির রচনা বলে মনে করা হয়। বুদ্ধচরিতের মূল উপাদান বৌদ্ধমত ও বুদ্ধের জীবনী। এই কাব্যটি অশ্বঘোষের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রচনাটি রামায়ণের দ্বারা প্রভাবিত। এখানে শুদ্ধোধনের চরিত্রে দশরথ ও সুন্দরীর চরিত্রে সীতার ভাব-সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

সৌন্দরানন্দ—অশ্বঘোষের রচিত অপর একটি কাব্যগ্রন্থ। এর সর্গসংখ্যা ১৮, বক্তব্য বিষয় বুদ্ধের জীবনী ও তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কাহিনী। প্রথমাংশে ছয়টি সর্গে কপিলাবস্তু নগরীর বর্ণনা, বুদ্ধ ও নন্দের জন্ম-কাহিনী, নিজ স্ত্রী সুন্দরীর প্রতি নন্দের আসক্তি, নন্দের বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ, তারপর স্বামীর জন্য সুন্দরীর বেদনাব্যথিত হৃদয়ের হাহাকার প্রভৃতি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণিত হয়েছে এখানে।

সারিপুত্ত প্রকরণ—এটি অশ্বঘোষের একটি নাট্যরচনা। এর নয়টি অঙ্ক। এর বর্ণনীয় বিষয়—সারিপুত্ত ও মৌদ্‌গল্যায়নের বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা-গ্রহণের কাহিনী! এখানে দেখা যায় যে বিদূষক সারিপুত্তকে ক্ষত্রিয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে নিষেধ করছে কিন্তু সে মৌদ্‌গল্যায়নের সঙ্গে পরামর্শ করে বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। মধ্য এশিয়ায় হাতে লেখা একটি তালপাতার পুঁথিতে এই নাটকটি প্রথম পাওয়া যায়।

বজ্রসূচি নামে আর একটি গ্রন্থ অশ্বঘোষের লেখা বলে পরিচিত। চীনাভাষায় এর অনুবাদ আছে। অনেকে এটিকে ধর্মকীর্ত্তির রচনা বলে মনে করেন।

গণ্ডীস্তোত্রগাথা ঊনত্রিশটি শ্লোকে রচিত একটি গীতি-কাব্য। বৌদ্ধবিহারসমূহে কাঠের তৈরি একরকম বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় তার নাম গণ্ডী। এই গ্রন্থে গণ্ডীধ্বনির ধর্মমূলক ব্যাখ্যা করে প্রশংসা করা হয়েছে। এটির চীনা অনুবাদকে সংস্কৃতে রূপান্তর করেছেন এ ভন স্টিল-হল্স্টেইন্।

সূত্রালঙ্কার—জাতক ও অবদানের আদর্শে রচিত একটি ধর্মমূলক পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্কলন। এই গ্রন্থের সংস্কৃত-রূপ পাওয়া যায়নি, এর চীনাভাষায় অনুবাদ আছে। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এটি অশ্বঘোষের রচনা। কিন্তু লুডার সাহেব এটিকে অশ্বঘোষের সমসাময়িক কুমারলাটির রচনা বলে মনে করেন। অশ্বঘোষের সময়ে যে নাট্যসাহিত্য বর্ত্তমান ছিল, তার প্রমাণ আমরা এই গ্রন্থ থেকে পাই।

অশ্বঘোষ একাধারে প্রতিভাশালী কবি ও নাট্যকার। 'সারিপুত্ত প্রকরণ' তাঁর নাট্যপ্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। অশ্বঘোষ বৈদর্ভীরীতি অনুসরণকারী ছিলেন। তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল ও ভাব হৃদয়গ্রাহী। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের জীবন-রসিক কবি। অতিশয় নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি মানবজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যথাবেদনা বর্ণনা করেছেন, প্রেমের মনোহর আলেখ্য রচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। বুদ্ধচরিতে অঙ্কিত জরা, মৃত্যু ও ব্যাধির চিত্র অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

অবদান সাহিত্য

অশ্বঘোষের রচনার পরেই বৌদ্ধ সংস্কৃত রচনা অবদান-সাহিত্য উল্লেখযোগ্য। অবদান শব্দের দ্বারা বোঝায় 'a great religious or moral achievement as well as the history of a great achievement'. *

জাতকমালা—এটি মূল পালিজাতক ও চর্যাপিটক থেকে গৃহীত সংস্কৃত পদ্য ও গদ্যে অনূদিত চৌত্রিশটি কাহিনীর সঙ্কলন। এই গ্রন্থের রচয়িতা আর্যশূর। অনেক পণ্ডিতের মতে আর্যশূর অশ্বঘোষের অপর নাম। খৃস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক আর্যশূরের আবির্ভাব সময়।

অবদানসাহিত্যের অন্য দুইটি বিখ্যাত জনপ্রিয় গ্রন্থের নাম অবদানশতক ও দিব্যাবদান। অবদানশতকের দশটি খণ্ড ও প্রত্যেকটির বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র। দিব্যাবদান হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হলেও এতে মহাযান ধর্মমতের বিশেষ প্রভাব আছে।

অশোকাবদান সম্রাট অশোকের জীবন অবলম্বনে কয়েকটি কাহিনীর সঙ্কলন, তবে এর ঐতিহাসিকতা কম। খৃস্টীয় তৃতীয় শতকে এটি চীনা ভাষায় অনূদিত হয়।

* ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীর History Classical Literature গ্রন্থের উদ্ধৃতি।

কল্পদ্রুমাবদানমালা, রত্নাবদানমালা, দ্বাবিংশত্যাবদান প্রভৃতি গ্রন্থের উপাদান অবদানশতক থেকে গৃহীত। ক্ষেমেন্দ্রের অবদানকল্পলতা অবদানসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। আলংকারিক মহাকাব্যের রীতি এখানে অনুসৃত। এর রচনাকাল খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দী।

সংস্কৃত গল্প সাহিত্য

গল্পসাহিত্যের পথিকৃৎ হিসাবে জাতক ও অবদান-সাহিত্যের দান অনস্বীকার্য। এখানকার সমস্ত গল্পই ধর্মভিত্তির উপর রচিত আর ধর্মনীতি প্রচারই এদের মূল উদ্দেশ্য। গল্পের মধ্যদিয়ে ধর্মপ্রচার বৌদ্ধদের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পন্থা। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে যে সমস্ত গল্প আছে তার উদ্দেশ্য সমাজের ভিতর নীতিবোধ জাগ্রত করা, ধর্মের সঙ্গে এদের কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই।

সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই জাতীয় গল্পগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র। মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, সন্ধিবিগ্রহ, লব্ধপ্রনাশ, অপরীক্ষিতকারিত্ব এই পাঁচখণ্ডে গ্রন্থটি বিভক্ত। এটি কালিদাস পূর্বযুগের সংস্কৃত-রচনা বলে পরিচিত। পাটলিপুত্রের রাজা অমরশক্তির মূর্খ পুত্রদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুশর্মা এই গ্রন্থটি রচনা করেন।

কালিদাস-পূর্বযুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ গুণাঢ্য-রচিত বৃহৎকথা। মূলগ্রন্থ পৈশাচী প্রাকৃতে লিখিত, এর রচনাকাল খৃস্টীয় চতুর্থ শতক বলে মনে করা হয়।

ভাস

ভাস সংস্কৃতসাহিত্যের একজন প্রথিতযশা নাট্যকার বলে বহুকাল ধরে সুধীসমাজে পরিচিত ছিলেন। কালিদাস[১], বাণভট্ট[২], রাজশেখর[৩] প্রভৃতি সংস্কৃতসাহিত্যের কৃতী লেখকবৃন্দ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নামোল্লেখ করেছেন। দণ্ডী বলেছেন—নাটক রচনায় ভাস বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং নাটকের ভেতর দিয়েই তাঁর যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এঁরা ছাড়াও আরো অনেকে নাট্যকার হিসাবে ভাসের নাম করেছেন, এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পূর্ববর্তী কালিদাস এবং তাঁর গ্রন্থে যখন ভাসের উল্লেখ আছে তাতে বোঝা যায় ভাস কালিদাসের পূর্ববর্তী। কিন্তু ১৯১২-১৫ সালের পূর্বে ভাসের কোন নাটক পাওয়া যায়নি। মহামহোপাধ্যায় টি, জি, শাস্ত্রী ১৯০৯-১০ সালে (কেরালার) পদ্মনাভপুরম্ এর অন্তর্গত মনলিক্করনাথম্ নামে একটি জায়গায় মালয়ালম্ হরফে লেখা একশ পাঁচ পৃষ্ঠার একখানি তালপাতার পুঁথি পান ও পরে আরো একটি পুঁথি

[১] প্রথিতযশা ভাসসৌমিল-কবি-পুত্রদিনাম্।—মালবিকাগ্নিমিত্র। (প্রস্তাবনায়) কালিদাস।

[২] সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈ বহুভূমিকৈঃ
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব। হর্ষচরিত—বাণভট্ট।

[৩] ভাসনাটকচক্রেঽপি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ।—কবিবিমর্ষ—রাজশেখর।

সংগ্রহ করেন, এই দুটিতে মোট ১৩ খানি নাটক ছিল। এই পুঁথিগুলিতে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। পরে ১৯১২-১৫ সালের মধ্যে শাস্ত্রীমশায় ঐ পুঁথির ১৩টি নাটক ত্রিভান্দ্রম্ থেকে ভাসের রচনা বলে প্রকাশ করেন। অবশ্য এগুলি আসলে ভাসের রচনা কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট মতান্তর আছে এবং এই নাটকগুলির লেখককে নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে ভাস-সমস্যা নামে একটি জটিল সমস্যা আছে। আমরা এই সমস্যার জটিলতার মধ্যে না গিয়ে পরে আলোচনা করে দেখব উক্ত নাটকগুলি কেন ভাসের রচনা বলে চলে আসছে।

সেই তেরটি নাট্যরচনাকে কাহিনী গ্রহণের উৎস আশ্রয়ে চারভাগে ভাগ করা যায় ঃ—

(১) মহাভারতের কাহিনী—মধ্যমব্যায়োগ, পঞ্চরাত্র, দূতকাব্য, দূত-ঘটোৎকচ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ ও বালচরিত (হরিবংশ)।

(২) রামায়ণ কাহিনী—প্রতিমা ও অভিষেক।

(৩) উদয়নের কাহিনী—স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ।

(৪) কাল্পনিক কাহিনী—অবিমারক ও চারুদত্ত।

সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে কাব্য দুরকম—শ্রব্য ও দৃশ্য, আবার দৃশ্যের দুভাগ, রূপক ও উপরূপক। নাটক, প্রকরণ, ভান, ব্যায়োগ প্রভৃতি ভেদে রূপক দশটি ও নাটিকা ত্রোটক প্রভৃতি ভেদে আঠারটি উপরূপক। প্রত্যেকটি প্রকারের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে, সেই অনুসারে প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ—ঈহামৃগ,

পঞ্চরাত্র সমবকার, উরুভঙ্গ অঙ্ক, চারুদত্ত প্রকরণ, কর্ণভার ও দূতঘটোৎকচ ব্যায়োগ, স্বপ্নবাসবদত্ত—প্রকরণ এবং বাকিগুলি নাটক। পুঁথিতে গ্রন্থকারের কোন নাম না থাকার জন্য পরবর্তীকালে অন্য লেখকের গ্রন্থে ভাসের বলে উদ্ধৃত শ্লোক তাঁর কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে উল্লেখ না থাকায় এবং কোনো শ্লোক স্বপ্নবাসবদত্তা থেকে গৃহীত উল্লিখিত হলেও শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত বাসবদত্তার পুঁথিতে সেই শ্লোক না থাকার জন্য উল্লিখিত নাটকগুলি যে ভাসেরই লেখা নিশ্চিতরূপে ঘোষণায় বাধা আসে এবং তাই নানা মত ও বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। একেই ভাস সমস্যা বলা হয়। এইসব মতদ্বৈততা সত্ত্বেও Sukthankar-এর মতানুসারে কতকগুলি বিশেষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে এগুলি ভাসের রচনা বলে আপাতত মেনে নেওয়া হয়েছে। সেই প্রমাণগুলি এইরূপ ঃ-

ভাস-সমস্যা

ভাসের রচনার প্রমাণ

(১) রচনাগুলির বাইরের আঙ্গিক গঠন ও ভেতরের সাদৃশ্য দেখে এগুলি একই ব্যক্তির রচনা বলে মনে হয়।

(২) এগুলি কালিদাসের পূর্ববর্তী রচনা বলেই মনে হয়, কারণ কালিদাস ও তাঁর পরবর্ত্তী কালের নাটকে নান্দী শ্লোকের পর লেখা আছে—নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ, আর এই নাটকগুলির সর্বপ্রথমেই আছে—নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ।

(৩) এই নাটকগুলিতে প্রথম অঙ্কের প্রথমাংশে 'স্থাপনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালের নাটকে দেখি

'প্রস্তাবনা'। কালিদাস ও অন্যান্য নাট্যকারের প্রস্তাবনার মধ্যে নাটক ও নাট্যকারের নামোল্লেখ আছে কিন্তু এখানে স্থাপনার মধ্যে সেরকম কোনো উল্লেখ নেই।

(৪) এগুলিতে প্রত্যেকটি নাটকের শেষে ভরতবাক্যে একই ধরণের প্রার্থনা।

(৫) এগুলির অনেকের মধ্যে একই শ্রেণীর অপাণিনীয় শব্দপ্রয়োগ দেখা যায়।

(৬) এই নাটকগুলির ভাষা পরবর্তীকালের ভাষার মত সমাসবহুল নয়, অনেক সরল প্রাঞ্জল, একই ধরণের ভাব ও রচনাশৈলী প্রায় একশ্রেণীর।

তাছাড়া এই নাটকগুলি অনেকক্ষেত্রে আলংকারিকদের নির্দিষ্ট নাটকের নিয়মভঙ্গ করেছে। যুদ্ধ, বধ প্রভৃতি দৃশ্যের অবতারণা করা সংস্কৃত নাটকে নিষিদ্ধ কিন্তু অভিষেক নাটকে রঙ্গমঞ্চে বালির মৃত্যু, যুদ্ধ, বধ প্রভৃতি দৃশ্য দেখান হয়েছে। এছাড়া উরুভঙ্গ নাটকটি বিয়োগান্ত, কিন্তু আলংকারিকরা নাটকে বিয়োগান্ত পরিণতি নিষিদ্ধ করেছেন।

রচনার বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যান্য যে সমস্ত নাটক আছে তাদের তুলনায় ভাসের নাটকের নাটকীয়তা অনেক বেশি। জয়দেব[১] যে ভাসকে সরস্বতীর হাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয়। ভাসের পরবর্তী গ্রন্থকাররা যে তাঁকে একজন প্রতিভাবান যশস্বী

---

[১] ভাসো হাস: প্রসন্নরাঘব।

নাট্যকার বলে উল্লেখ করেছেন, এই নাটকগুলি পাঠ করলে ঐ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকে না। কাহিনীর গতিবেগ সৃষ্টি, চরিত্রচিত্রণ-নৈপুণ্য, মানবিক আবেদন, রচনা-রীতির সারল্য, পৌরাণিক কাহিনীতে নাটকীয়তা আনয়ন প্রভৃতি গুণ নাট্যশিল্পে ভাসের অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়। ভাস যে কালিদাসের পূর্ববর্তী এ বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ নেই, কারণ কালিদাস নিজে তাঁকে খ্যাতিমান নাট্যকার বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ভাসের প্রাকৃত ভাষায় পরবর্তীকালের নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত অপেক্ষা অনেক বেশি প্রাচীনত্বের ছাপ আছে। ভাসের সংস্কৃত গদ্য পরবর্তীকালের গদ্য থেকে অনেক সহজ, সাধারণের বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। এই ভাষায় জীবন্ত ভাষার গুণ আছে, পরবর্তীকালের সংস্কৃতে যার বিশেষ অভাব।

প্রাচীনত্ব

T. G. Sastri ভাসের সময় খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী বলেছেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁর রচনার প্রাকৃত বিচার করে ভাসের আবির্ভাব কাল তৃতীয় খৃষ্টাব্দ বলে মনে করেন। অন্যান্য দিক বিচার করে আবার অনেকে বলেন, ভাস অশ্বঘোষ ও কালিদাসের মধ্যবর্তী সময়ের অর্থাৎ ২য় শতাব্দীর লেখক ছিলেন। যাই হোক, ভাসের সময় আজ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে ঠিক হয়নি। অনেকে আবার তাঁকে পঞ্চম খৃষ্টাব্দ থেকে একাদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত টেনে এনেছেন।

সময়

উক্ত তেরটি নাট্য-রচনা ভাসের বলে মেনে নেওয়ার পক্ষে

পূর্বে যুক্তি দেখান হয়েছে। কিন্তু সকলে ঐ যুক্তিগুলির ভিত্তিতে ঐ নাটকগুলিকে ভাসের রচনা বলে নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারেননি। এ পক্ষেও অনেক যুক্তি দেখান হয়েছে।

বিরুদ্ধ মত

তাদের প্রধান একটা যুক্তি এই যে উক্ত নাটকগুলির যে বৈশিষ্ট্য, কেরালায় প্রাপ্ত অন্য নাট্যরচনায় সেই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অন্যান্য গ্রন্থে ভাসের রচিত শ্লোক বলে যে উদ্ধৃতি আছে, ত্রিভান্দ্রামের এই নাট্যরচনায় সেগুলি পাওয়া যায় না। যাই হোক, পণ্ডিতগণ ভাসের সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারেননি।

নাটক-পরিচিতি

১। স্বপ্নবাসদত্তা—নিঃসন্দেহে এই নাটকটি ভাসের শ্রেষ্ঠ রচনা। এখানকার চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনীর ঘটনাবিন্যাস-কৌশলে নাটকটি শেষ পর্যন্ত দর্শকদের কৌতূহল জাগিয়ে রাখে। এখানে নাট্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। এটি একটি ছয় অঙ্কের নাটক। কাহিনীটির উৎস গুণাঢ্যের বৃহৎ-কথা। এখানে উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাণী বাসবদত্তা অগ্নিদগ্ধ বলে ঘোষণা করেন ও তাকে রাজা দর্শকের ভগ্নী পদ্মাবতীর কাছে অবন্তিকা বেশে নিজের ভগ্নী বলে লুকিয়ে রাখেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ জ্যোতিষীর কাছে জানতে পারেন যে রাজা দর্শকের ভগ্নীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ হবে ও দর্শকের সহায়তায় উদয়ন হৃতরাজ্য উদ্ধার

করবেন। দর্শকভগ্নী পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহের জন্য যৌগন্ধরায়ণ যে কৌশল অবলম্বন করায় তাদের বিবাহ হয় ও উদয়ন বাসবদত্তাকে লাভ করেন—সেই কাহিনীটি নাটকের বিষয়বস্তু। পদ্মাবতী ও বাসবদত্তা এই দুই নায়িকার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অতিশয় নিপুণ ও অদ্ভুত।

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ—চার অঙ্কের একটি নাটিকা। এটিকে স্বপ্নাবাসবদত্তার ভূমিকা বলা যায়। বৎসরাজ রাজা উদয়ন হস্তীশিকারে বের হলে রাজা প্রদ্যোৎ তাঁকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে তাঁর পথে একটি নকল হাতী রাখেন। যখন উদয়ন বীণা বাজিয়ে হাতীটা বশ করার চেষ্টা করছেন তখন তাঁকে বন্দী করা হয় এবং তাঁর বীণাটি নিয়ে প্রদ্যোৎ নিজের মেয়ে বাসবদত্তাকে দেন। বন্দী অবস্থায় উদয়ন বাসবদত্তার প্রণয়ে আবদ্ধ হন। উদয়নের মন্ত্রী তাঁদের দুজনকে উদ্ধারের চেষ্টা করে প্রথমে বিফলমনোরথ হন, পরে প্রদ্যোৎ বাসবদত্তা ও উদয়নকে উদয়নের রাজ্যে পাঠিয়ে দেন। এই কাহিনী নাটকটির বিষয়বস্তু। কাহিনীটির উৎস বৃহৎকথা। এর নাট্যবস্তুর ভেতরে রয়েছে একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত আবার এর সঙ্গে জড়িত একটি প্রণয়কাহিনী। এই দুই বিষয়কে অতিশয় নৈপুণ্যের সঙ্গে এখানে যোজনা করা হয়েছে। এটি নাট্যকারের শিল্পকৌশলেরই পরিচায়ক। যৌগন্ধরায়ণের চরিত্রচিত্রণ চমৎকার।

৩। চারুদত্ত—একটি অসমাপ্ত চার অঙ্কের প্রকরণ। এই নাটকের কাহিনীর সঙ্গে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকের কাহিনীর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এর মূল বিষয় হল—ব্রাহ্মণ চারুদত্ত ও

গণিকা বসন্তসেনার প্রণয়কাহিনী। ভাস ও শূদ্রকের মধ্যে কে কার কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত তা বিচারের বিষয়। তবে এই কাহিনীর কোনো লোকপ্রচলিত উৎস ছিল বলে মনে হয়। তাতে এরকমও হতে পারে যে উভয় নাট্যকারই সেই সূত্র থেকে কাহিনী গ্রহণ করেছেন।

৪। প্রতিমানাটক—এটি রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত সাত অঙ্কের নাটক। প্রথমেই রামের বনবাসগমন ও ও দশরথের মৃত্যু। ভরতের অযোধ্যায় আগমন ও প্রতিমাগৃহে দশরথের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখে পিতার মৃত্যুসংবাদলাভ। তারপর তিনি বনে গিয়ে রামের পাদুকা এনে তাকে সিংহাসনে অভিষেক করলেন। এর পরে বনে সীতা-হরণ, রাম ও রাবণের যুদ্ধ, রাবণকে হারিয়ে সীতা উদ্ধার করে রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন —নাটকটির এই কাহিনী।

৫। বালচরিত—পাঁচ অঙ্কের একটি নাটক। এখানে কৃষ্ণের জন্ম থেকে আরম্ভ করে তাঁর দ্বারা পুতনা, চানূর, কালীয় ঋষভাসুর ও কংসের বধ এবং উগ্রসেনের অভিষেক পর্যন্ত দেখানো হয়েছে।

৬। উরুভঙ্গ—নাটকের আরম্ভ হয়েছে ভীমের সঙ্গে দুর্যোধনের যুদ্ধে গদা দ্বারা ভীম কর্ত্তৃক দুর্যোধনের উরুভঙ্গ। এর পর মুমূর্ষু পুত্রকে দেখার জন্য ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর যুদ্ধক্ষেত্রে গমন। শেষ অঙ্কে পাণ্ডববংশ সবংশে ধ্বংস করার জন্য অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা। নাটকটি শেষ হচ্ছে রঙ্গমঞ্চে দুর্যোধনের মৃত্যুতে। এটি সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র বিয়োগান্ত নাটক।

৭। পঞ্চরাত্র—এই নাটকটির পঞ্চরাত্র নাম হয়েছে এই কারণে যে এতে পাঁচটি রাত্রির ঘটনা আছে। যখন পাণ্ডবরা বার বছর বনবাসের পর এক বছর অজ্ঞাতবাসে আছেন তখন দ্রোণ কুরু-পাণ্ডবদের মহাযুদ্ধের আশংকা করে উভয়পক্ষকে মিলিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। আচার্য দ্রোণের পরামর্শে দুর্যোধন এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ও তাতে দ্রোণকে গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করতে বলেন। দ্রোণ তখন গুরুদক্ষিণারূপে দুর্যোধনের কাছে অর্ধেক রাজ্য দাবি করলে, দুর্যোধন তাতে রাজি হন এই শর্তে যে দ্রোণ তাকে পাঁচ রাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের খবর এনে দেবেন। শেষে ভীষ্ম ও দ্রোণ পাণ্ডবদের খবর এনে দেন ও তাঁদের অর্ধেক-রাজ্য দেওয়া হয়—নাটকটির এই কাহিনী।

৮। দূতবাক্য—এটি একটি একাঙ্ক নাটক। পাণ্ডবদেব দূত হয়ে কৃষ্ণ দুর্যোধনের সভায় উপস্থিত হওয়ামাত্র দুর্যোধন সিংহাসন থেকে পড়ে যান। কৃষ্ণ তাঁর কাছে পাণ্ডবদের রাজ্যাংশ দাবি করলে দুর্যোধন তাতে রাজিতো হলেনই না বরং তাঁকে জোর করে বন্দী করতে চেষ্টা করেন। কৃষ্ণ তখন বিশ্বরূপ দেখালে তাঁকে ধৃতরাষ্ট্র এসে শান্ত করলেন,—নাটকটির এই বিষয়বস্তু।

৯। মধ্যমব্যায়োগ—ঘটোৎকচ ও তার মা হিড়িম্বী নর-মাংস খাবার জন্য এক ব্রাহ্মণ পরিবারকে আক্রমণ করে। তখন উভয়পক্ষের আলোচনায় ঠিক হয় যে ঐ ব্রাহ্মণ তাঁর মেজ ছেলেকে খাবার জন্য দেবে। ঘটোৎকচের হাত থেকে ব্রাহ্মণ-পুত্রকে রক্ষা করার জন্য ভীম ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ

হয়। তখন ভীম ও ঘটোৎকচ পরস্পর পিতা ও পুত্র এই পরিচয় জানতে পারায় ব্রাহ্মণপুত্র রক্ষা পেল।—নাটকটির এই কাহিনী।

১০। কর্ণভার—নাটকটির আরম্ভ কর্ণের উপর একটি অভিশাপ দিয়ে যে প্রয়োজনের সময় কর্ণের অস্ত্র কার্যকর হবে না। অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকালে এক ব্রাহ্মণ এসে তাঁর কাছে মহৎদান চাইলেন। যা চাইবেন তাই দেবেন—কর্ণ এই প্রতিশ্রুতি দিলে ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তাঁর কাছে তাঁর সহজাত আত্মরক্ষাকর কবচকুণ্ডল গ্রহণ করলেন এবং প্রতিদানে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন বিমলা নামে অপ্রতিহতশক্তি অস্ত্র।

১১। দূতঘটোৎকচ—কৌরবরা অন্যায়ভাবে অভিমন্যুকে বধ করার পর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী এর তীব্র নিন্দা করলেন। পাণ্ডবদের পক্ষ থেকে দূত ঘটোৎকচ কৌরবদের কাছে শান্তির প্রস্তাব এনে অপমানিত হন। তাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন—এর প্রতিশোধ নেবেনই, তখন ধৃতরাষ্ট্র এসে তাঁর ক্রোধ শান্ত করলেন।

১২। অভিষেকনাটক—রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দর-কাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ডের কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত। বালির সঙ্গে রামের যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে সীতার অগ্নিপরীক্ষা পর্যন্ত কাহিনী—এর বিষয়বস্তু।

১৩। অবিমারক—ঋষি দীর্ঘতপার অভিশাপে সৌবীর-রাজ কুন্তীভোজ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়ে কুন্তীভোজ নগরে বাসের সময় অবি নামে এক অসুরকে বধ করে অবিমারক নাম লাভ

করেন। একসময় তিনি কুন্তীভোজ—রাজকন্যা কুরঙ্গীকে হাতীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে কুন্তীভোজ তাঁর সঙ্গে কুরঙ্গীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু অবিমারক নীচজাতি জানতে পেরে আর তার সঙ্গে কুরঙ্গীর বিবাহ দিলেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে অবিমারক ও কুরঙ্গী পরস্পর প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েছে। একদিন কুরঙ্গীর কক্ষে তার সঙ্গে অবিমারকের গোপন মিলন হল। এরপর তিনি পাহাড় থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তখন এক বিদ্যাধর তাঁকে একটি আংটি দেন। এর সাহায্যে তিনি প্রতিরাত্রে গোপনে কুরুঙ্গীর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। শেষে নারদের সহায়তায় তাঁর সঙ্গে কুরঙ্গীর বিবাহ হয়।

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের মত এই নাটকে বিদূষক চরিত্র খুব জীবন্ত ও আমোদজনক।

ভাসের নাটকগুলির অন্যতম গুণ এই যে পরবর্তীকালের সংস্কৃত নাটকের মত কাব্যোচ্ছ্বাসের চাপে এখানে নাটকীয় গতি কখনো নষ্ট হয়নি। তিনি যে একজন সত্যিকারের প্রতিভাবান নাট্যকার ছিলেন তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য দেয় বিশেষভাবে স্বপ্নবাসবদত্তা ও প্রতিজ্ঞযৌগন্ধরায়ণ নাটক দুটি।



প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

কাব্য-সাহিত্য

এখন যে কাব্যের বিষয় আলোচিত হবে তা সংস্কৃত আলংকারিকগণের নিয়ম-নির্দিষ্ট মহাকাব্য। রবীন্দ্রনাথ এই-গুলিকেই একলা কবির কাব্য বলেছেন, ইংরাজীতে Epic of Art, Court Epic প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

মহাকাব্যের লক্ষণ

আলংকারিকগণ মহাকাব্যের লক্ষণে অনেক-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। আমরা সেই বিস্তৃত লক্ষণের মধ্যে না গিয়ে তার অতি আবশ্যকীয় কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করছি। যেমন, মহাকাব্য হবে স্বর্গে বিভক্ত, তার বিষয়বস্তু ইতিহাস বা পুরাণ প্রসিদ্ধ কাহিনী, ধীরোদাত্তগুণান্বিত সদ্বংশজ ব্যক্তি—বিশেষ ভাবে রাজা নায়ক, শৃঙ্গার, বীর, শান্ত রসের মধ্যে একটি প্রধান রস হবে।*

* সর্গবন্ধো মহাকাব্যং···ইত্যাদি মহাকাব্য লক্ষণ—৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ
—সাহিত্যদর্পণ—বিশ্বনাথ

সর্গবন্ধো মহাকাব্যং—ইত্যাদি মহাকাব্য লক্ষণ—
কাব্যাদর্শ—দণ্ডী

ভারতীয় মতানুসারে আদি কবি বাল্মীকি ও তাঁর রচিত রামায়ণ আদি কাব্য হলেও এটিকে আলংকারিকদের লক্ষণানুগ মহাকাব্যের মধ্যে ধরা হয় না। তবে এই রামায়ণই পরবর্ত্তীকালের আলংকারিক মহাকাব্যের উৎস এবং সেই সঙ্গে মহাভারতের মধ্যেও এই শ্রেণীর কাব্যের মূল নিহিত। পদ্যকাব্যের আরো প্রাচীনতম উৎস বেদের নারাশংসসূক্ত, দানস্তুতি, সংবাদসূক্ত প্রভৃতি।

উৎস

আলংকারিক মহাকাব্যগুলির সৃষ্টি হয়েছে রাজরাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সহায়তায় তাঁদের সভাকবিদের দ্বারা, এইজন্য রাজাদের কাহিনীই এই শ্রেণীর কাব্যের প্রধান বিষয়। রাজসভার কবিদের সাহিত্য-কীর্ত্তি মহাকাব্য হলেও এর মধ্যে যে রস ও রুচির পরিচয় আছে, তা বাৎসায়নের কামসূত্রে প্রদত্ত তৎকালীন সমাজের ও সেখানে চিত্রিত নাগরকের রুচির অনুগামী। এই নাগরক একজন বিলাসী ব্যক্তি, তিনি নানা রকম বিলাসব্যসনে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অধুনা বিগর্হিত আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাতেন। কাব্য এঁদের মনোরঞ্জনের একটি উপকরণ ছিল। সেইজন্যই বোধ হয় এই সময়কার কাব্যে শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য।

এছাড়া কাব্য পাঠক আর এক শ্রেণীর ছিলেন। তাঁরা বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার দ্বারা কাব্যের দোষ গুণ বিচার করতেন। এইজন্য আলংকারিকদের নিয়ম-নির্দ্দেশানুসারে পরবর্ত্তীকালে এই শ্রেণীর বহু কাব্য রচিত হয়েছে।

পাণিনি রচিত জাম্ববতী-বিজয় ও বররুচি-রচিত একটি কাব্য

—প্রাচীনতম কাব্যরূপে এই দুটি নাম আমরা জানতে পারি—কিন্তু এদুটিই কালের গর্ভে লোপ পেয়েছে।

বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত যতগুলি সংস্কৃত মহাকাব্য পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে প্রাচীনতম অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ। এর পরই মহাকাব্যের (Court Epic) ইতিহাসে প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে কালিদাসের দুইটি মহাকাব্য-রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব এর নাম উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে যেমন কালিদাসের প্রসিদ্ধি তেমনি মহাকাব্যকার (Writer of Court Epics) রূপেও তাঁর শীর্ষস্থান। অশ্বঘোষের ও তাঁর রচিত কাব্য-নাটকের পূর্বে পৃথক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সংস্কৃত মহাকাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যের ইতিহাসে মহাকবি কালিদাস শীর্ষস্থানীয়। তাই তাঁর জীবন ও রচনা অবলম্বনে এখানে প্রথমে একটি পৃথক আলোচনার অবতারণা করা হল।

কালিদাস

মহাকবি কালিদাসের নাম জানেন না বা শোনেননি এমন শিক্ষিত লোক ভারতবর্ষে খুব কমই আছেন। কবিষু কালিদাস :—কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কালিদাস,—এই কথা ভারতে বহুকাল ধরে চলে আসছে। তাঁকে আশ্রয় করে বহু

কিম্বদন্তী[১] আছে তাদের মধ্যে সত্য মিথ্যা সন্ধান করা বর্ত্তমানে অসম্ভব। তাঁর আবির্ভাবকাল ও জন্মস্থান ঠিক করার জন্য অনেকে চেষ্টা করেছেন কিন্তু কারোর মতের সঙ্গে কারো মিল হয়নি। সব থেকে দুঃখের বিষয়, যাঁর কবিখ্যাতি দীর্ঘকাল ধরে এত প্রচারিত তিনি নিজের কোন লিখিত পরিচয় রেখে যান নি। তাই এখন তাঁর সময় ও জন্মস্থান নিয়ে নানামুনির নানা মত। নিম্নে কবির সম্বন্ধে কয়েকটি মত দেওয়া হল।

জ্যোতির্বিদাভরণের একটি শ্লোকে[২] কালিদাসকে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার এক রত্ন বলা হয়েছে। এই

সময়

শ্লোকের উপর নির্ভর করে ফার্গুসন মনে করেন, এই বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য এবং তিনি ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে শকদের ভারত থেকে বিতাড়িত করে নিজের নামে তার ৬০০ বছর পূর্ব্ব থেকে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৬ অব্দ থেকে বিক্রম সম্বৎ প্রচলিত করেন। সুতরাং কালিদাস তাঁর মতে ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি। ম্যাক্সমুলারও এই মত সমর্থন করেন এবং এই সময়কেই তিনি সংস্কৃত কাব্যের গৌরবের যুগ বলেছেন। এইটি তাঁর রেণেসাঁ মতবাদ। এই মত বর্ত্তমানে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কালিদাস তাঁর একটি নাটক মালাবিকাগ্নিমিত্রের

১। বল্লালের ভোজপ্রবন্ধ

২। ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ
বররুচির্নববিক্রমস্য।

প্রস্তাবনায় ভাসের নামোল্লেখ করেছেন বলে মনে হয় তিনি ভাসের পরবর্ত্তী, তবে ভাসের কাল সম্বন্ধে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয়নি। কালিদাসকে অশ্বঘোষের পরবর্ত্তী কালের কবি বলেই পণ্ডিতগণ মনে করেন, কারণ কালিদাসের নাটকের প্রাকৃত অশ্বঘোষের প্রাকৃত ভাষার পরবর্ত্তী কালের।

৬৩৪ খৃষ্টাব্দে রচিত দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তিতে (Aihole inscription) কালিদাসের নামোল্লেখ দেখে বোঝা যায় কালিদাস ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের আগের কবি। কত আগের তা ঠিক করে বলা যায় না।

এলাহাবাদের কাছাকাছি জায়গায় যে পদকটি (Bhita Medallion) পাওয়া গেছে, তাতে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের প্রথম দৃশ্যটির মত একটি চিত্র আছে। এই পদকটি শুঙ্গবংশের রাজত্বকালে তৈরি। এই বংশের রাজারা খৃঃ পূঃ ১১৭ থেকে ৭২ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্যন্ত পাটলীপুত্রে রাজত্ব করেন। সুতরাং কালিদাস এই সময়ের আগের কবি।

Bhita Medallion

মালবিকাগ্নিমিত্রের ভরতবাক্য থেকে অনেকে মনে করেন কালিদাস খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর রাজা অগ্নিমিত্রের সমসাময়িক। সব থেকে বেশি প্রচলিত ও স্বীকৃত মত হল এই যে কবি কালিদাসের আবির্ভাবকাল গুপ্তযুগে বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে। কলিদাস এই রাজার নবরত্ন সভার এক রত্ন ছিলেন। Keith মনে করেন যে কলিদাস দ্বিতীয়

কালিদাস

চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের জন্মকে আশ্রয় করে কুমার-সম্ভব কাব্য রচনা করেছেন। কুমারগুপ্তের সময়ে রাজ্যের (খৃঃ ৪১৩—৫৫) সর্বাপেক্ষা উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়।

সম্ভবত ৩৪৫ খৃষ্টাব্দে হরিসেন রচিত এলাহাবাদের স্তম্ভ-গাত্রে ক্ষোদিত সমুদ্রগুপ্ত-প্রশস্তি এবং ৪৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে বৎসভট্টি-রচিত মান্দাসারের সূর্যমন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত লিপি গুপ্তযুগে কাব্যরচনার উৎকর্ষের পরিচায়ক। কালিদাসের রঘুবংশে রাজ্যের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে এই কাব্যের চতুর্থ সর্গে রঘুর হূণ, বিজয় স্কন্ধগুপ্তের হূণবিজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হূণ আক্রমণ সময় ৪৬৫—৪৭০ খৃষ্টাব্দ ও স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল ৪৫৫—৪৮০ খৃষ্টাব্দ। আবার কারো কারো মতে কুমারসম্ভব কাব্যটি কুমার গুপ্তের জন্মকে ভিত্তি করে রচিত।

তাছাড়া গুপ্তযুগে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান হয়। অভিজ্ঞান শকুন্তলায় জাতিগত বৃত্তিগ্রহণের প্রশংসা করা হয়েছে।[১] এই সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে গুপ্তযুগকেই কালিদাসের আবির্ভাব সময় বলে অনেকে মনে করেন। কীথের মতে ৪৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্ভবত চতুর্থ খৃষ্টাব্দের কবি ছিলেন কালিদাস।[২]

১। ষষ্ঠ অংক অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

২। Kalidas then lived before A. D. 472 and probably at a considerable distance, so that to place him about A. D. 400 seems completely justified (A. Hist. of Sans. Literature. Keith.)

আর কারো কারো মতে ৪৭০ খৃষ্টাব্দে হুণ আক্রমণের পরে কালিদাসের আবির্ভাব কাল।

তাছাড়া কালিদাস যখন তাঁর 'মলবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রস্তাবনায় তাঁর পূর্ববর্ত্তী অন্য নাট্যকারদের মধ্যে ভাসের নাম উল্লেখ করেছেন, এতে প্রমাণিত হয় তিনি নাট্যকার ভাসের পরবর্ত্তী। আবার এই নাটকের ভরতবাক্য পাঠ করে অনেকে বলেন যে কবি ছিলেন খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর রাজা অগ্নিমিত্রের সমসাময়িক।

জন্মস্থান

ভারতবর্ষের কোথায় যে কবির জন্মস্থান ছিল তা আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি। এ বিষয়েও ভিন্ন মত রয়েছে। কারও মতে (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) কালিদাস ছিলেন মালব রাজ্যের অন্তর্গত দাশপুরের অধিবাসী। কারও মতে (A. C. Chatterjee) তাঁর জন্মস্থান উজ্জয়িনী। কারও মতে (Bhau Daji) কাশ্মীর আবার কারও মতে বিদর্ভ। উজ্জয়িনীর প্রতি কবির সমধিক আকর্ষণ লক্ষ্য করে কীথ তাঁকে গুপ্তরাজত্বসময়ে সেই বংশের বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক উজ্জয়িনীর অধিবাসী বলে মনে করেন।

জীবনী

কলিদাস সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে তিনি প্রথমে খুব নির্বোধ ছিলেন। পরে কালীর বরে কাব্যরচনায় পারদর্শিতা লাভ করেন। আর একটি কিম্বদন্তী আছে যে সিংহলের রাজা কুমারদাসের অতিথিরূপে থাকার সময় এক গণিকার হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। কুমারদাস

নাকি এক সময় সেই গণিকাকে 'কমলে কমলোৎপত্তি শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে এই শ্লোকাংশটি লিখে দেন আর বলেন, গণিকা যদি শেষাংশ পূরণ করতে পারে তবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। কালিদাস নাকি গণিকাগৃহে থাকার সময় 'বালে তব মুখাম্ভোজে দৃষ্টমিন্দিবরদ্বয়ম্' এই পংক্তিটি লিখে শ্লোকটির অপরাংশ পূরণ করে দেন। গণিকা পুরস্কারের লোভে কলিদাসকে হত্যা করে তাঁর শবদেহ লুকিয়ে ফেলে ও রাজাকে শ্লোকটি দেখিয়ে পুরস্কার নেয়। কুমারদাস এই ঘটনা জানতে পেরে কলিদাসের মৃত্যুতে মর্মাহত হন ও কলিদাসের চিতায় গণিকাকে নিক্ষেপ করেন।

গ্রন্থপরিচিতি

রঘুবংশ—কালিদাসের রচিত শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। এর উনিশটি স্বর্গ। এখানে দিলীপ থেকে আরম্ভ করে রঘুবংশের কয়েকজন রাজার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে রামের কাহিনী রামায়ণ থেকে গৃহীত ও সুবিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। রঘুবংশীয় অন্যান্য রাজার কাহিনীর উৎস বিষ্ণু ও বায়ুপুরাণ। রঘুবংশের কাহিনীটি সংক্ষপে নিম্নরূপ।

শৌর্যবীর্যবান্ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দিলীপের কোন সন্তান না থাকার জন্য স্ত্রী সুদক্ষিণার সঙ্গে তিনি গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করেন। গুরুর আদেশে সুরভির কন্যা হোমধেনু নন্দিনীকে সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট করে পুত্র প্রাপ্তির বরলাভ করেন। যথা সময়ে পুত্র

কাহিনী

জন্মগ্রহণ করলে তার নাম রাখা হয় 'রঘু'। এরপর দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ইন্দ্র অপহরণ করলে ইন্দ্রের সঙ্গে রঘুর যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে রঘু পরাজিত হন। রঘু রাজ্যলাভের পর দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে ভারতবর্ষের বহু দেশে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন ও পরে বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সমস্ত সম্পদ ব্রাহ্মণদের দান করে একেবারে নিঃস্ব হন।

কালক্রমে রঘুর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় অজ। অজ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পিতার আদেশে বিদর্ভরাজ ভোজের ভগ্নী ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর-সভায় যোগদান করেন। অজই ইন্দুমতির বরমালা লাভ করেন ও যথা সময়ে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। অজের পুত্র দশরথ ও দশরথের পুত্র রাম। এরপর রামের বিবাহ থেকে আরম্ভ করে তাঁর বনবাস, রাবণকে পরাজিত করে সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন, সীতার বনবাস, বাল্মীকির আশ্রমে লবকুশের জন্ম, সীতার পাতালে প্রবেশ প্রভৃতি রামায়ণের ঘটনা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর পরে আছে রামের মৃত্যু, কুশের রাজ্য লাভ, কুশের পর তার পুত্র অতিথির রাজ্যপ্রাপ্তি এরপর ক্রমে একুশজন রাজার নাম আছে। একবিংশতিতম রাজা সুদর্শনের বনবাসের পর তাঁর পুত্র অগ্নিবর্ণের ভোগাসক্তি ও মৃত্যু এবং শেষে তাঁর সন্তানসম্ভবা পত্নীর রাজ্যশাসন প্রভৃতি ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে ঊনবিংশ সর্গ পর্যন্ত।

রঘুবংশ কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য ও পরিণত প্রতিভার সার্থক সৃষ্টি। কাহিনীর বেশি অংশ রামায়ণের হলেও

কালিদাসের লেখনী একে আশ্রয় করে এক অপরূপ কাব্য সৃষ্টি করেছে। রসোদ্বোধক অপূর্ব বর্ণনা কৌশল ও ঘটনা-বৈচিত্রের জন্য প্রত্যেক সর্গ পাঠকদের মনে নতুন আগ্রহ ও কৌতুহল সৃষ্টি করে। কব্যের প্রথম অংশে রঘুর প্রাধান্য দ্বিতীয় অংশে রামের।

কুমারসম্ভব—কালিদাসের রচিত দ্বিতীয় কাব্য। এর সতেরটি স্বর্গের মধ্যে প্রথম সাতটি বা আটটি সর্গ কালিদাসের রচনা বলে গবেষকগণ মনে করেন। পরবর্ত্তী সর্গগুলি অন্য কোন কবির রচনা, পরে সংযোজিত। অষ্টম সর্গে হিন্দুরুচি-বিগর্হিত চিত্র (হরপার্বতীর মিলন বর্ণনা) থাকার জন্য এই সর্গটিও কালিদাসের রচনা নয় বলে মনে করা হয়। মল্লীনাথ এই কাব্যের মাত্র প্রথম আটটি সর্গের টীকা রচনা করেছেন।

কাহিনীটির মূল বিষয় হল,—অত্যাচারী তারকাসুরের হাত থেকে দেবতাদের রক্ষার জন্য একজন দেবসেনাপতির দরকার। সেই দেবসেনাপতি হলেন কুমার কার্ত্তিকেয়। মহাদেবের ঔরসে ও উমার গর্ভে তাঁর হল জন্মলাভ।

নগাধিরাজ হিমালয়ের অতি মনোহর বর্ণনা দিয়ে কাব্যটির আরম্ভ। হিমালয়ের কন্যা উমা। যোগীশ্বর মহাদেব গভীর যোগাভ্যাসে নিমগ্ন। উমার সঙ্গে মহাদেবের বিবাহের ইচ্ছা জন্মানর জন্য তারকাসুরের অত্যাচারে জর্জরিত দেবতারা চক্রান্ত করে কামদেবকে এখানে পাঠালেন। হিমালয়ে অকাল বসন্তের আবির্ভাব হল। পর্ব্বতরাজকন্যা উমা যখন যোগমগ্ন মহাদেবের কাছে পুষ্পাঞ্জলি দিতে যাচ্ছেন সেই সময় কামদেব

তাঁর অমোঘ বান নিক্ষেপ করলেন। শিবের ধ্যানভঙ্গ হল। দূরে দণ্ডায়মান কামদেব শিবের তৃতীয় নেত্র নির্গত রোষবহ্নিতে ভস্মীভূত হল। কামপত্নী পতিশোকে ম্রিয়মাণা হয়ে যখন দেহ-ত্যাগের সঙ্কল্প করলেন তখন দৈববাণী হল যে আবার তাঁর মদনের সঙ্গে পুনর্মিলন হবে।

উমা শিবের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে তাঁকে পাওয়ার জন্য আরো কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। তাঁর তপশ্চর্যায় শিব স্থির থাকতে পারলেন না। বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীর বেশে এসে তাঁর প্রতি উমার ভক্তি পরীক্ষা করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। হরপার্বতীর বিবাহের পর তাঁদের পুত্র কুমার কাত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করলেন। ইনিই হলেন তারকাসুরের সংহারকর্ত্তা।

এই কাব্যের সমৃদ্ধ কল্পনা, উচ্ছ্বসিত আবেগ, বিষয়বৈচিত্র্য আধুনিক মনেরও রসপিপাসা মেটায়। কাব্যে বর্ণিত অকাল বসন্তের আকর্ষণীয় সৌন্দর্য ও প্রভাব, প্রেয়োলাভের জন্য কঠোর সাধনা, প্রিয়বিচ্ছেদের দুঃসহ বেদনার চিত্র অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

কালিদাসের অদ্ভুত শিল্প নৈপুণ্যের নিদর্শন—এই কাব্যের তৃতীয় সর্গে বর্ণিত শিবের মানসিক আলোড়নের চিত্র ও চতুর্থ সর্গে পতিবিয়োগবিধুরা রতির বেদনামথিত হৃদয়ের মর্মস্পর্শী হাহাকারের করুণ আলেখ্য। রামায়ণের মনোহারী বসন্তবর্ণনা ও বালির মৃত্যুতে তারার বিলাপের প্রভাব এখানে কিছু এসে পড়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

মেঘদূত—কাব্যটি কালিদাসের রচিত সংস্কৃত গীতি কবিতার

শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জলভারে মন্থর মেঘের মতো ধীরগতি মন্দাক্রান্তা ছন্দে আগাগোড়া কাব্যটি লিখিত।

কোন এক যক্ষ প্রভুশাপে অভিশপ্ত হয়ে দক্ষিণে রামগিরি পর্বতে নিবাসিত হয়। আষাঢ়ের আকাশে উত্তরাভিমুখী নব মেঘের আবির্ভাব দেখে তার মনের বাসনা কামনা ব্যথাবেদনা অলকাবাসিনী প্রিয়তমার কাছে নিয়ে যাবার জন্য যক্ষ মেঘকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করে। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ—কাব্যটির এই দুই ভাগ। পূর্বমেঘে ভারতের দক্ষিণ থেকে উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত মেঘের যাত্রাপথের মনোহারী বর্ণনা আর উত্তর মেঘ যক্ষের মানসী প্রিয়তমার আবাসভূমি, নিত্যসৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন অলকাপুরীর আকর্ষণীয় বর্ণনায় পূর্ণ। এই হল মেঘদূতের বিষয়বস্তু।

অনেকে মনে করেন এই কাব্যের মূল সুর রামায়ণের। রাবণকর্তৃক সীতা অপহৃতা হওয়ায় রামায়ণে রামের যে বিরহ বেদনার চিত্র আছে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কালিদাস এই অভিনব কাব্য রচনা করেছেন। তবে একে অনুকরণ বলা চলে না। কবি রামায়ণ থেকে সূত্রটুকুই নিয়েছেন কিন্তু তাঁর কবিকল্পনার যাদুদণ্ড স্পর্শে যক্ষের পত্নীবিরহব্যথা শাশ্বত মহিমায় মণ্ডিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে, সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে।'

রোমান্টিক কল্পনার অবারিত মনোজ্ঞ প্রকাশ, বর্ণনীয়

বিষয়ের বৈচিত্র্য ও গভীর-ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশনে কাব্যটি বিশ্ব-সাহিত্যে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে।

আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের উপর কালিদাসের প্রভাব অপরিসীম। মেঘদূত যে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে মুগ্ধ ও প্রাভাবিত করেছে সে কথা কবি নানা লেখার মধ্যে ও চিঠিপত্রে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই মেঘদূতকে লক্ষ্য করে মেঘদূত নামে দুটি কবিতা রচনা করেছেন। তাছাড়া প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত মেঘদূত প্রবন্ধ ও লিপিকায় একটি কণিকা আছে।

রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব

মেঘদূত এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে কালিদাসের পরবর্তী-কালে মেঘদূতের আদর্শে দূতকাব্য বলে এক বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হয়। মেঘদূত কাব্যের প্রতিটি শ্লোক কালিদাসের মৌলিকতা ও রচনাশৈলীর স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক।

ঋতুসংহার— গীতি কাব্যটিকে কালিদাসের প্রথম জীবনের রচনা বলে অনেকে মনে করেন। কারণ রঘুবংশ, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্যে কালিদাসের রচনাশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় সে তুলনায় এখানকার রচনা শিথিলবদ্ধ। আবার অনেকের মতে এটি কালিদাসের রচনাই নয়। কালিদাস অপেক্ষা অনেক কম শক্তিসম্পন্ন কোনো কবির রচনা, কালিদাসের নামে চলে আসছে। আবার মল্লীনাথও এটির কোনো টীকা রচনা করেননি। ঋতুসংহারকে কালিদাসের রচনা বলে না স্বীকার করার এও একটি কারণ। কিন্তু কীথ একথা স্বীকার করেন না।

তাঁর মতে ঋতুসংহারকে যদি কালিদাসের রচনা থেকে বাদ দেওয়া যায় তাহলে কালিদাসের সুনাম অনেক খানি নষ্ট হবে।[১]

এই কাব্যে আছে গ্রীষ্ম থেকে আরম্ভ করে ছয়টি ঋতুর বর্ণনা। কিন্তু শুধু ঋতুর বহিরঙ্গ বর্ণনাই কাব্যের সব নয়, প্রত্যেকটি ঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিতে ও মানুষের মনে কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, কিরূপ ভাবান্তর আসে, দম্পতী ও প্রেমিক-প্রেমিকার মনোরাজ্যে বিভিন্ন ঋতু যে বিচিত্র ভাব-তরঙ্গ সৃষ্টি করে তাই এই কাব্যের মূল সুর।

কালিদাসের অন্যান্য রচনার মধ্যে যে কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় ঋতুসংহারের মধ্যে ততটা না থাকলেও এখানে যা আছে তা যথেষ্ট শক্তিশালী কবির পক্ষেই সম্ভব এবং সেই কারণে এই কাব্যটি কালদাসের বলে মেনে নিলে কালিদাসের কবিখ্যাতির মানহানি হবে বলে মনে হয় না।

মালবিকাগ্নিমিত্র—কালিদাসের রচিত একটি পাঁচ অংকের নাটক। এর মূল কাহিনী বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্রের অন্তপুরের ষড়যন্ত্র। এক সময় বিদর্ভরাজকুমারী মালবিকা নিজের পরিচয় গোপন করে একটি উদ্যানে রাজা অগ্নিমিত্রের সামনে উপস্থিত হয়। এর আগে রাজা তার প্রতিকৃতি দেখে

১। In point of fact, the Ritusamhara is far from unwarthy of Kalidas, and, if the poem is denied him, his reputation would suffer real loss.—Keith. Hist of Sans Lit.

তার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছিলেন এবং মালবিকারও তাঁর প্রতি অনুরাগ জন্মেছিল। একথা জেনে রাজা যখন তাকে সেই উদ্যানে আলিঙ্গন

নাটক

করেন তখন তাঁর ছোট রাণী ইরাবতী এই ঘটনা দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন ও রাজাকে অপমান করেন। এর পর যাতে আর কোন অপ্রীতিকর কিছু না হয় এজন্য প্রধানা মহিষী ধারিণী মালবিকাকে অন্তঃপুরে লুকিয়ে রাখেন। বিদূষক কৌশলে রাজার সঙ্গে মালবিকার দেখা করিয়ে দেয়। কিন্তু এবারও ইরাবতীর জন্য তাদের মিলনে বাধা আসে। এর পর ধারিণী তার পুত্র বসুমিত্র হূণদের পরাজিত করেছে জানতে পেরে খুশি হয়ে মালবিকার সঙ্গে রাজার বিবাহ সমর্থন করেন। এইভাবে নাট্যবিষয়ের পরিসমাপ্তি।

এই নাটকটিকে অনেকে কালিদাসের অপরিণত লেখনীর সৃষ্টি বলে মনে করেন। কালিদাস এই নাটকটির আরম্ভে এটি নতুন বলে উল্লেখ করেছেন। তাতেও এটিকে কালিদাসের প্রথম রচনা বলে মনে করা ঠিক হবে না। এই উক্তিটিকে বিনয় প্রকাশ বলা যেতে পারে। কারণ অভিজ্ঞান-শকুন্তলার প্রথমে 'নবেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ' এরকম উক্তি আছে। অথচ অভিজ্ঞান-শকুন্তলা যে কালিদাসের পরিণত হাতের রচনা এ বিষয়ে দ্বিমত নেই।

এই নাটকটির নায়ক নায়িকা খুব উচ্চস্তরের না হলেও কালিদাস এদের চরিত্রসৃষ্টি নাটকের উপযোগী করেই করেছেন। অনেকে মনে করেন এখানে কালিদাস রাজ-

অন্তঃপুরের জীবনকে ব্যঙ্গ করেছেন। সে যাই হোক্, নাটকটি বেশ সহজ সরল ও উপভোগ্য। এখানে বিদূষক অন্যান্য নাটকের বিদূষকের মতো শুধু হাসায় না, নাট্যকাহিনীর পরিণতির পথে সে সক্রিয় ও সহায়ক।

বিক্রমোর্বশী—কালিদাসের রচিত একটি পাঁচ অংকের নাটক (ত্রোটক)। মর্ত্তের রাজা পুরুরবা ও স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর প্রণয়-কাহিনী এর বিষয়বস্তু। বৈদিক যুগ থেকে পুরাণের সময় পর্যন্ত এই কাহিনাটি বিভিন্ন রূপে প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের (দশম মণ্ডল—৯৫ সূক্ত) মধ্যে এই কাহিনীটি প্রথম পাওয়া যায়। কালিদাস কাহিনীটিকে তাঁর নাটকোপযোগী করে নেন।

এক সময় মর্ত্তের রাজা পুরুরবা উর্বশীকে অসুরের কবল থেকে উদ্ধার করেন এবং উর্বশী তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্তা হয়। কিন্তু উর্বশী স্বর্গে চলে গেলে রাজা তার বিরহে খুব ব্যথিত হয়ে পড়েন। স্বর্গে লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর নাটকের অভিনয় সময়ে পুরুরবার ধ্যানে মগ্ন উর্বশী 'পুরুষোত্তম' নাম বলতে গিয়ে পুরুরবার নাম উচ্চারণ করেন। এজন্য ভরত তাকে অভিশাপ দেন যে তাকে মর্তবাস করতে হবে। তবে ইন্দ্রের অনুগ্রহে শাপ লঘু হয়ে স্থির হয় মর্তে বাস করে সে পুরুরবার ঔরসে সন্তান জন্মদানের এক বছর পরে স্বর্গে ফিরে আসতে পারবে। কণ্বের আশ্রমে লতারূপ প্রাপ্তি, তার অদর্শনে পুরুরবার প্রেমাবেগ ও বিরহবেদনাবোধ এবং উর্বশীর নিজ স্বরূপ লাভ প্রভৃতি দৃশ্যগুলি নাটকে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে রূপায়িত হয়েছে।

চতুর্থ অংকে উর্বশীর অদর্শনে প্রেমোন্মত্ত রাজার স্বগত ভাষণের মাধ্যমে বিরহব্যথিত হৃদয়ের মর্মস্পর্শী হাহাকারের চিত্র কালিদাসের অপূর্ব সৃষ্টি। এই নাটকে নাটকীয়তা কিছু কম হলেও এখানে রূপায়িত লিরিক মূর্চ্ছনার উচ্চগ্রাম পাঠক ও দর্শক হৃদয়ে অপূর্ব রসাবেদন সৃষ্টি করে।

পুত্র আয়ুর জন্মের পর উর্বশীর স্বর্গে ফিরে যাবার সময় এল কিন্তু রাজার সঙ্গে আসন্ন বিরহ ব্যথায় সে কাতর হয়ে পড়ে। তখন নারদ এসে খবর দিলেন স্বর্গে দেবাসুরের সংগ্রামে ইন্দ্র রাজার সাহায্যপ্রার্থী এবং পুরস্কাররূপে রাজা স্বর্গে বাস করে আজীবন উর্বশীর সঙ্গলাভ করবেন।

নাটকটিতে কিছু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ও রাজার অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতায় নাটকীয় গতি কিঞ্চিৎ ব্যাহত হলেও সাধারণভাবে নাটকটি উপভোগ্য। অজ্ঞাত পুত্রের সঙ্গে পরিচয় ও পুত্রলাভে যে পরিণয়ের সার্থকতা, কালিদাসের এই আদর্শটি এখানে রূপায়িত।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্—নাটকটি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্ত্তি, ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। এই একটি নাট্যরচনা কালিদাসকে একসঙ্গে শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে সম্মানিত করেছে। মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্ভুক্ত দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রাচীন কাহিনী নাট্যকাহিনীর উৎস হলেও কালিদাসের লেখনীস্পর্শে, তাঁর প্রতিভার দীপ্তিতে সেই কাহিনী পরিমার্জন রূপান্তর প্রভৃতির ভেতর দিয়ে অপরূপ শাশ্বত মহিমা লাভ করেছে।

এখানে মহাভারতের চতুর স্পষ্টবাদী তাপসী বালিকা শকুন্তলা ব্রীড়াবনতা, সম্ভ্রমবোধসম্পন্না, করুণাময়ী গৃহস্থ কন্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। মহাভারতের রাজা দুষ্মন্ত রাজসভায় উপস্থিত শকুন্তলাকে চিনেও লোক লজ্জার ভয়ে না চেনার ভান করেছিলেন। এতে রাজার চরিত্রে যে দুর্ব্বলতা ছিল কালিদাস তা অপনোদন করেছেন দুর্বাশার শাপ দিয়ে।

কালিদাসের দুষ্মন্ত ধর্মভীরু, সংযতচরিত্র, আত্মবিশ্বাসী। দুর্বাশার শাপ তাঁর প্রণয়কে দুঃখের অনলে পরিশুদ্ধ করেছে। শকুন্তলাও সহনশীলা মহনীয় চরিত্ররূপে চিত্রিত হয়েছে।

নাটকটির শ্রেষ্ঠ অংশ চতুর্থ অঙ্ক। এখানে কালিদাসের লেখনীর অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই নাটক ও চতুর্থ অংক সম্বন্ধে সমালোচকের দুটি উক্তি প্রচলিত আছে।

(১) কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্র রম্যা শকুন্তলা।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্ক যত্র যাতি শকুন্তলা।

(২) কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্ক তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্॥

এই অংকে প্রকৃতির চিত্র ও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির আত্মিক সম্পর্ক এমন আকর্ষণীয় ও জীবন্তরূপে অঙ্কিত হয়েছে, যা অন্যত্র দুর্লভ। এই নাটকে অনুসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন চরিত্র তপোবন প্রকৃতিও তেমনি চরিত্র। অনুসূয়া প্রিয়ম্বদার সঙ্গে যেমন শকুন্তলার হৃদয়ের যোগ, অন্তরঙ্গ

সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গেও তেমনি। প্রকৃতি এখানে শকুন্তলার জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

তার পতিগৃহ গমনের সময় আসন্ন বিরহকাতর মানুষের হৃদয়বেদনার স্পর্শ যেমন পাঠকরা অনুভব করেন তেমনি অশ্রুসজল প্রকৃতির করুণ বেদনা নেপথ্যে শুনতে পাওয়া যায়।

তপোবন থেকে বিদায়কালে শকুন্তলা চারিদিক থেকে আকর্ষণ অনুভব করছে। তার কাছে যেমন মানুষ তেমনি প্রকৃতি। কলিদাস এখানে মানুষ ও প্রকৃতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছেন। মানুষ যেমন মানুষের কাছে স্নেহ ভালবাসা পায়, উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ জন্মায়, তেমনি পশুপক্ষী, তরুলতা ও মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কালিদাস তার আকর্ষণীয় আলেখ্য রচনা করেছেন চতুর্থ অঙ্কে। শকুন্তলার আসন্ন বিচ্ছেদে সমগ্র তপোবন—সেখানকার মানুষ, পশুপাখী, তরুলতা সকলেই অশ্রুভারাক্রান্ত। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্মবিদারী হতে পারে, তা একমাত্র এখানেই দেখি।

নায়ক-নায়িকাকে সামনাসামনি উপস্থিত করে উভয়ের মধ্যে কালিদাস যে অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র এঁকেছেন তা অপূর্ব এবং সেই কারণে এই নাটকটিকে জগতের যে কোন শ্রেষ্ঠ নাটকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ত্যাগের তপস্যায়, সংযমে ও অনুতাপের অনলে পুড়ে দেহাশ্রয়ী প্রেম দেহাতীত শাশ্বত প্রেমে পরিণতি লাভ করে। প্রেমের এই আদর্শের রূপায়ণ অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে দেখতে পাই।

অভিজ্ঞানশকুন্তলার আলোচনা প্রসঙ্গে য়ুরোপের একজন শ্রেষ্ঠ কবি গ্যেটে বলেছেন—কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি স্বর্গ মর্ত্য একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাওয়া যাইবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গ্যেটের এই উক্তির সমর্থন করে বলেছেন 'শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে, সে পরিণতি ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্ত্য হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্মে পরিণতি,… …মর্ত্যের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হইতে স্বর্গতপোবনে শাশ্বত আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক। প্রেমকে স্বভাব সৌন্দর্য্যের দেশ হইতে মঙ্গল সৌন্দর্য্যের অক্ষয় ধামে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়াই হল এই নাটকের মূল বক্তব্য।'

নাট্যকার এই নাটকে মানুষের ও প্রকৃতির স্বভাবিক বিকাশ ও লীলাচাঞ্চল্যকে যেমন অবারিত ভাবে মনোহর করে চিত্রিত করেছেন তেমনি দেহাশ্রয়ী রূপজ প্রেমের পরিণতি দেখিয়েছেন দুঃখের ও ত্যাগের তপস্যায় পূত শান্ত সুন্দর চাঞ্চল্যবিহীন কল্যাণসিক্ত প্রেমের অক্ষয় স্বর্গে উত্তরণে।

মহাকাব্য

মহাকাব্য কালিদাসের প্রতিভাস্পর্শে যে পরিণত রূপ লাভ করে তার ধারা পরবর্ত্তীকালে অনেকদিন পর্যন্ত চলে এসেছে। তবে কালক্রমে সেই রূপের অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটে।

সংস্কৃত অলিংকারিকগণ মহাকাব্যের যে লক্ষণ করেছেন কালিদাসের পরবর্ত্তীকালের কবিগণ মহাকাব্য রচনায় সেই লক্ষণ অনুসরণের খুব বেশি চেষ্টা করেছেন। কালিদাসের পরবর্ত্তীকালের আলংকারিকগণ মহাকাব্যকে বাঁধা ধরা নিয়মে নির্দ্দিষ্ট করেছেন বলে এই সময় থেকে কবিগণ কাব্যের আন্তর ভাবসম্পদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য না রেখে কাব্যদেহের গঠন ও সাজসজ্জার দিকে বেশি নজর দিয়েছেন। তার ফলে কালিদাসের কাব্যের মধ্যে রসসমৃদ্ধ যে গভীর অনুভূতি ও ভাবব্যঞ্জনা দেখা যায় পরবর্ত্তীকালের কাব্যে তার একান্ত অভাব। তার স্থল পূরণ করেছে বিস্তৃত বর্ণনা, বিভিন্ন অলংকার ও বিচিত্র ছন্দের ঝঙ্কার। কালিদাসের পরবর্ত্তী কালের পাঁচজন কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন ভারবি, ভট্টি, কুমারদাস, মাঘ ও শ্রীহর্ষ।

কিরাতার্জুনীয়ম্ঃ—১৮টি সর্গবিশিষ্ট কবি ভারবির রচিত একটি মহাকাব্য। কালিদাসের পরবর্ত্তীকালের কবিগণের মধ্যে ভারবিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল লিপিতে কালিদাস ও ভারবিকে যশস্বী

কবি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে মনে হয় ভারবি ওই লিপির পূর্ববর্ত্তী কবি। ৫৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় ভারবির আবির্ভাব কাল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

আলংকারিক দণ্ডীরচিত অবন্তীসুন্দরী-কথায় ভারবির জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে আনন্দপুরে (অধুনা গুজরাটের অন্তর্গত) কৌশিক গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করতেন। পরে তাঁরা নাসিকের অন্তর্গত অচলপুরে বসবাস করেন। সেই বংশের নারায়ণ স্বামীর এক পুত্রের নাম ছিল দামোদর। এই দামোদরই আমাদের ভারবি। স্থানীয় রাজকুমার বিষ্ণু-বর্দ্ধনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয় ও তাঁর সঙ্গে এক সময় মৃগয়ায় গিয়ে ভারবি মাংস ভোজন করে আত্মরক্ষা করেন। সেজন্য তিনি মা বাবার কাছে ফিরে এসে লজ্জা বোধ করেন ও স্বেচ্ছায় বনবাস জীবন বরণ করে নেন। বনবাসকালে দুর্বিনীত নামে এক রাজকুমার তাঁর কবিত্বের পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিজ শিবিরে নিয়ে আসেন। এখানে বাসকালে কবি কাঞ্চির পহ্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর স্তুতি করে একটি শ্লোক লিখে পহ্লবরাজ-সভার কবিপদ লাভ করেন।

জীবনী

কিরাতার্জুনীয়ের কাহিনী অংশ মহাভারতের বনপর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে। বনবাসের সময় পাণ্ডবগণ যখন দ্বৈতবনে ছিলেন তখন ব্যাসের আদেশে তাঁরা কাম্যক বনে যান এবং শিবের পাশুপত অস্ত্রলাভের জন্য অর্জ্জুন ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে গিয়ে তপস্যা করেন। অর্জ্জুনের কঠোর তপস্যায় সন্ত্রস্ত দেবতাদের

অনুরোধে মহাদেব কিরাতবেশে অর্জ্জুনের সামনে উপস্থিত হন। একটি বন্য শূকরকে বানাহত করার বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ হয়। শেষ পর্যন্ত অর্জ্জুনের সাহসিকতা ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে শিব তাঁকে তাঁর কাম্য পাশুপত অস্ত্র দান করেন। ভারবি এই ক্ষুদ্র কাহিনীর কাঠামোর উপর অনেক বিষয় যুক্ত করে একটি বিরাট মহাকাব্য রচনা করেন।

কাহিনী

শরৎঋতু ও হিমালয় বর্ণনার মধ্যে কবির কাব্যপ্রতিভার পরিচয় পরিস্ফুট। তবে কালিদাসের কবিকল্পনা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সাবলীল, সেখানে ভারবির কবিত্ব কষ্টার্জিত। ভারবির খ্যাতি তাঁর কাব্যে অর্থগৌরবের জন্য—ভারবের গৌরবম্। ভারবির বাক্যে ভাবের গভীরতা উপলব্ধি করতে গেলে শুষ্ক ভাষার আচ্ছাদন ছিন্ন করতে হয়। সেজন্য বলা হয়েছে—নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ; অর্থাৎ ভারবির বাক্য নারিকেল ফলের মত। বিভিন্ন শাস্ত্রে যে কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, তার পরিচয় দেয় এই কাব্যটি। বিশেষভাবে কবি তাঁর কাব্যে নিজের অলঙ্কারশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করে জায়গায় জায়গায় একেবারে দুর্বোধ্য করে তুলেছেন। এই দিকটি বাদ দিলে এই কাব্যে ভাব ও ভাষার সুষ্ঠু মিলনে একটি অপূর্ব রসব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে।

কাব্যগুণ

কাব্যে প্রথম সর্গে গুপ্তচর মুখে দুর্যোধনের রাজ্যশাসন প্রণালীর বর্ণনা ও শেষের দিকে কিরাতবাহিনীর সঙ্গে

অর্জ্জুনের যুদ্ধ বর্ণনা এবং তাতে উভয় পক্ষ থেকে অদ্ভুত শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ বর্ণনার দ্বারা যুদ্ধের ভয়াবহতা পরিস্ফুটন—ভারবির বর্ণনশক্তির পরিচায়ক। অন্যান্য সর্গে প্রকৃতি ও নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা সত্যই হৃদয়গ্রাহী।

ভর্তৃহরি-রচিত রাবণবধ বা ভট্টিকাব্য বাইশটি সর্গে সম্পূর্ণ। কবির উক্তি থেকে জানা যায় যে তিনি শ্রীধর সেনের রাজত্বকালে বল্লভীতে বাস সময়ে এই কাব্য রচনা করেন। কিন্তু ৪৯৫ খৃঃ থেকে ৬৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীধরসেন নামে চারজন রাজা বল্লভীতে রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়। তার মধ্যে শেষ শ্রীধরসেন পরলোক গমন করেন ৬৪১ খৃষ্টাব্দে। এতে এইরূপ মনে করা হয় যে খৃষ্টীয় যষ্ঠ শতকের প্রথম থেকে সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ভর্তৃহরির আবির্ভাব কাল। ডক্টর সুশীল কুমার দে বলেন—The poet's name itself cannot anthorise his idedentification with Vatsabhatti of Mandasar inscription, nor with Bhatrihari, the poet grammarian.

ভর্ত্তৃহরি সম্বন্ধে কয়েকটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একটি কাহিনীতে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত নামে একজন ব্রাহ্মণের

প্রচলিত কাহিনী

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি জাতির চার জন পত্নীর গর্ভে যথাক্রমে বররুচি, বিক্রমার্ক, ভট্টী ও ভর্তৃহরি নামে চারজন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এদের মধ্যে বিক্রমার্ক রাজা হন ও তাঁর মন্ত্রীর কাজ করেন ভট্টী।

আর একটি কাহিনী অনুসারে বল্লভীর রাজা ভট্টারকই ছিলেন আসলে ভট্টি এবং তাঁর সভাকবি ভর্ত্তৃহরি রাবণবধ নামে কাব্য রচনা করে রাজার নামে প্রচার করেন।

অন্য একটি কাহিনীতে জানা যায় যে ভর্ত্তৃহরি নিজেই রাজা ছিলেন। এক সময় একজন রাজা তাঁকে একটি ফল দান করেন এবং সেইটি আবার ভর্ত্তৃহরি তাঁর স্ত্রীকে দেন। তিনি আবার সেটি তাঁর প্রণয়ীকে দেন। এই ঘটনা জানতে পেরে ভর্ত্তৃহরি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। একটি সুভাষিতে উল্লিখিত আছে যে ভর্ত্তৃহরি সংসারের প্রতি অনাসক্তির প্রেরণায় তিনটি শতক রচনা করেন।

অপর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে ভর্ত্তৃহরি ছাত্রদের ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার সময় হঠাৎ ছাত্রগণ ও তাঁর মধ্য দিয়ে একটি হাতী চলে যায়। এটি অমঙ্গল নির্দেশক মনে করে ভর্ত্তৃহরি এক বছরের জন্য ছাত্রদের ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করেন এবং এই সময়ে কাব্যের ভেতর দিয়ে ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ভট্টীকাব্য রচনা করেন। ভট্টী নিজেই বলেছেন, যাঁদের ব্যাকরণে পাণ্ডিত্য আছে তাঁরা এই কাব্যের রসাস্বাদ করতে পারবেন।[১]

ছাত্রদের ব্যাকরণ শেখাবার উদ্দেশ্যে রচিত বলে কবিকে কাব্যটির মধ্যে ব্যাকরণের নিয়মানুসারী কষ্টকল্পিত অনেক শব্দ প্রয়োগ করতে হয়েছে। তার ফলে কাব্যটির অনেক

১। দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোঽয়ং শব্দলক্ষণচক্ষুষাম্।

ক্ষেত্রে রসহানি হয়েছে এবং কাব্যটি জায়গায় জায়গায় বেশ শ্রুতিকটুও হয়েছে। শুধু তাই নয় এই কৃত্রিমতার জন্য ভাষাও হয়েছে দুর্বোধ্য।

রামচন্দ্রের লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন ও রাজ্যে অভিষেক পর্যন্ত রামায়ণের পুরো কাহিনীটি এর বিষয়বস্তু।

দ্বাবিংশ সর্গে বিভক্ত কাব্যটির চারটি ভাগ :—

(১) প্রকীর্ণকাণ্ড (১—৫) ব্যাকরণের নানা বিষয়ের উদাহরণ।

(২) অধিকার কাণ্ড (৬—৯) পাণিনি-ব্যাকরণের অধিকার সূত্রগুলির উদাহরণ।

(৩) প্রসন্নকাণ্ড (১০—১৩) বিভিন্ন অলংকারের উদাহরণ।

(৪) তিঙন্তকাণ্ড (১৪—২২) তিঙন্ত পদের উদাহরণ।

কবিপ্রতিভার অধিকারী যে ভর্তৃহরি ছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না। ভাষার দুর্বোধ্যতা ও কৃত্রিমতা সত্ত্বেও কাব্যটির মধ্যে জায়গায় জায়গায় কবি অপূর্ব কাব্যরস সৃষ্টি করেছেন। পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সম্মেলন এরূপ খুব কমই দেখা যায়। দ্বিতীয় সর্গে শরৎ প্রকৃতির বর্ণনা ভট্টির কবি প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য দেয়। পরবর্ত্তীকালের কবি মাঘের উপর ভট্টিকাব্যের প্রভাব যথেষ্ট পড়েছে দেখা যায়। ভামহর কাছে ইনি পরিচিত ছিলেন। দণ্ডী ও ভামহ প্রদর্শিত অলংকারের সঙ্গে তুলনায় ভট্টিপ্রদর্শিত অলংকার সমূহ

মৌলিক। ভট্টিকাব্য সম্বন্ধে অধ্যাপক কীথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য।[২]

কুমারদাস :—জানকীহরণ কাব্যের রচয়িতা। ইনি সিংহলের রাজা ছিলেন (৫১৭—২৬ খৃষ্টাব্দে)। কালিদাসের মৃত্যুর সঙ্গে এঁর নাম জড়িত আছে। পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি কালিদাসের ও তাঁর কাব্যের একজন পরম অনুরাগী ছিলেন। সেই কারণে জানকীহরণের উপর রঘুবংশের বেশ প্রভাব পড়েছে দেখা যায়। কাশিকাবৃত্তির (৬৫০ খৃষ্টাব্দ) সঙ্গে কুমারদাসের পরিচয় ছিল এবং আলংকারিক বামন (৮০০ খৃষ্টাব্দ) তাঁকে জানতেন। তাঁকে মহাকবি মাঘের পূর্ববর্তী বলে ধরা হয়, কারণ মাঘের একটি শ্লোকে তাঁর শ্লোকের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

অনেকে মনে করেন জানকীহরণের কবি কুমারদাস ও সিংহলের রাজা এক ব্যক্তি নন। কালিদাসের সঙ্গে কুমার দাসের যে বন্ধুত্বের কথা জানা যায় এবং জানকীহরণে যে ভাবে কালিদাসের প্রভাব পড়েছে তাতে কালিদাসের সমসাময়িক সিংহলের কোনো কবির নাম ছিল কুমারদাস বলে তাঁরা মনে করেন।

২। Bhatti's poem, a lamp in the hands of those whose eye is grammer, but a mirror in the hands of the blind for others, is essentially, intended to serve the double plan of describing Ram's history and of illustrating the rules of grammer. A History of Sanskrit Literature by A. B. Kieth.

জানকীহরণ কাব্যটি কুড়িটি সর্গে বিভক্ত। এর-বিষয়বস্তু রামের কাহিনী ও সীতাহরণ। কুমারদাস কাব্যটি কালিদাসের কাব্য অনুসরণ করে যে লিখেছেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কাব্যটি ভারতবর্ষে পণ্ডিত সমাজে যশ অর্জন করেছে। জানকীহরণের রচনাশৈলী ও কাহিনীতে কালিদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট। কাব্যটি কালিদাসের কাব্যের মত উচ্চশ্রেণীর না হলেও পাঠ করে আনন্দ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ছন্দের ও অলংকারের প্রয়োগে কাব্যটি মনোরম হয়েছে।

মাঘ—কালিদাসের পরবর্ত্তীকালের একজন যশস্বী কবি। তাঁর রচিত মহাকাব্যের নাম শিশুপালবধ। ধারারাজ ভোজ তাঁর উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী মাঘের আবির্ভাবকাল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। শিশুপালবধের শেষাংশের পাঁচটি শ্লোক থেকে কবির কিছু পরিচয় জানা যায়। তাঁর পিতা ছিলেন দত্তক সর্বাশ্রয়। তাঁর পিতামহ সুপ্রভদেব বর্মলাট নামে এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে কবি মাঘ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন।

কবি-জীবনী

তিনি একটি শ্লোক রচনা করে, সেটি তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে রাজসভায় পাঠিয়ে দেন। রাজা শ্লোকটি পাঠ করে মুগ্ধ হন ও কবি-পত্নীকে কিছু অর্থ দেন। কিন্তু গৃহে ফেরার পথে কতকগুলি ভিখারীকে সেই অর্থ কবি-পত্নী বিতরণ করেন। এর পরও ভিখারীরা তাঁকে গৃহ পর্যন্ত অনুসরণ করেছে জানতে পেরে মাঘ কয়েকটি শ্লোকে দারিদ্র্যের বর্ণনা করে সেইখানেই মারা যান। রাজা এই খবর শুনে খুব

ব্যথিত হন ও কবির শেষকৃত্য সমাপনের সমস্ত ব্যবস্থা করেন ও কবির স্মৃতিকে স্মরণীয় করার জন্য তাঁর নামে একটি গ্রামের নাম রাখেন।

শিশুপালবধ মহাকাব্যটি ২০টি সর্গে বিভক্ত। মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শিশুপালবধের কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। কাব্যে যুধিষ্ঠিরের অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনা এবং শিশুপালের দুর্ব্যবহার খুব সার্থকভাবে কবি চিত্রিত করেছেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে কবির যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল—কাব্যটি তার পরিচায়ক। সমালোচকগণ বলেছেন—"মাঘে সন্তি

সাহিত্য গুণ

ত্রয়ো গুণাঃ।" শিশুপাল বধে কালিদাসের উপমা—ভারবির অর্থগৌরব ও দণ্ডীর পদলালিত্য[১] এই ত্রিবিধ গুণের একত্র সমাবেশ ঘটেছে, এই প্রশংসা সম্পূর্ণ না হলেও কিছু মাঘের প্রাপ্য। সমালোচকের এই উক্তিটি অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়। কারণ মাঘের কাব্যের গতি স্বচ্ছন্দ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবির পাণ্ডিত্য প্রকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্বোধ্য শব্দ ও সমাস বাহুল্যের জন্য কাব্যে রসসৃষ্টি বেশ ব্যাহত হয়েছে। কবি কাব্যে নানা ছন্দ ও নানা শব্দালংকারের প্রয়োগে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন বটে তবে এতে কাব্যের কিছু মানহানি ঘটেছে।

এই রকম কথা প্রচলিত আছে যে কাব্যের গুণে ও গৌরবে ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়ের যশঃ ম্লান করার ইচ্ছায় মাঘ শিশুপাল-

---

১। উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্
দণ্ডিনঃ পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ।

বধ রচনা করেন। তিনি এতে যে কিছু সাফল্য লাভ করেছিলেন তা সমালোচকের পূর্বলিখিত উক্তি থেকে জানা যায়। মাঘের যেমন শাস্ত্রে জ্ঞান ছিল তেমনি তিনি কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। এর প্রমাণ শিশুপালবধের জায়গায় জায়গায় বেশ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্ত্তী কবিদের যশ ম্লান করার দুর্দম বাসনা নিয়ে কাব্যচর্চ্চায় নেমেছিলেন বলে কাব্যে তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভার প্রকাশ ও মৌলিকতা ব্যাহত হয়েছে। হয়ত ছন্দে অলঙ্কারে শিশুপালবধ কিরাতার্জ্জুনীয়কে ছাড়িয়েছে কিন্তু মাঘ ভারবির কাব্যের কাব্যগৌরব ম্লান করতে পারেননি। কিন্তু শিশুপালবধ পাঠ করলে বোঝা যায় যে কবির নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্ব শক্তিও ছিল। মাঘের কাব্যখ্যাতি যে এক সময়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সোমদেব তাঁর যশস্তিলকচম্পূতে, রাজশেখর কাব্যমীমাংসায়, আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকে, ভোজ সরস্বতীকণ্ঠাভরণে মাঘের নাম উল্লেখ করেছেন। সুভাষিতাবলী ও ঔচিত্যবিচারচর্চ্চায় মাঘের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্রীহর্ষ—নৈষধচরিত মহাকাব্যের রচয়িতা। কালিদাসের পর এঁর কবিখ্যাতি সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং ইনি মহাকবি বলে পরিচিত হন।

একটি কিম্বদন্তী আছে যে ইনি ছিলেন কাব্যপ্রকাশ নামক বিখ্যাত অলংকার গ্রন্থের রচয়িতা মম্মটভট্টের ভ্রাতুষ্পুত্র। মম্মট ভট্ট তাঁর নৈষধচরিত দেখে দুঃখ করে বলেছিলেন যে

যদি তিনি তাঁর গ্রন্থের দোষ অধ্যায় লেখার আগে এই কাব্যটি দেখতেন তাহলে অন্যান্য গ্রন্থ খুঁজে দোষের উদাহরণ সংগ্রহ করতে তাঁকে কষ্ট করতে হত না।

শ্রীহর্ষের পিতার নাম শ্রীহরি ও মাতার নাম মামল্লদেবী। শ্রীহরি কনৌজের রাজা বিজয়চন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। তিনি উদয়নের সহিত কবিতা প্রতিযোগিতায় বিফল মনোরথ হয়ে সামাজিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে পুত্রকে অনুরোধ করে যান তাঁর এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য। তারপর শ্রীহর্ষ এক মুচির কাছ থেকে প্রাপ্ত "চিন্তামণিমন্ত্রম্" এর সহায়তায় কয়েক বছরের মধ্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তারপর তিনি কনৌজরাজ্যে সভাকবি নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি রাজার অনুরোধে সসম্মানে নৈষধচরিত কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থটি কাশ্মীরে ব্যাপকভাবে প্রশংসা লাভ করে এবং কবিকে "নবভারতী" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কলাভারতী উপাধিধারিণী রাণী কবির এই উপাধিতে ঈর্ষান্বিত হন, সেজন্য শ্রীহর্ষ জীবনের শেষ সময়ে গঙ্গাতীরে বাস করে কাটান। প্রবন্ধকোষ গ্রন্থে রাজশেখরের বিবরণ অনুসারে রাজা বিজয়চন্দ্রের পুত্র জয়ন্তচন্দ্রের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। এই সময়েই শ্রীহর্ষের আবির্ভাবকাল।

কবি জীবনী

নৈষধচরিত মহাকাব্যটি উচ্চ প্রশংসিত। নিষাধরাজ নল ও বিদর্ভের রাজকুমারী দময়ন্তীর প্রণয়কাহিনী—কাব্যটির আখ্যানভাগ। কাহিনীটি মহাভারত থেকে গৃহীত। এই

কাব্যটি সম্বন্ধে ডক্টর সুশীলকুমার দে বলেছেন—The work is regarded as one of the five great Mahakavyas in Sanskrit, it is undoubtedly the last master piece of industry and ingenuity that the Mahakavya can show.

শ্রীহর্ষের ন্যায় ও অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রে যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল নৈষধচরিত কাব্যে তার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

কাব্যগুণ

কারণ এখানে মাঝে মাঝে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের তত্ত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। তাছাড়া শ্রীহর্ষ খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য নামে একটি বেদান্তদর্শনের গ্রন্থ রচনা করেন বলে অনেকে মনে করেন।

নৈষধচরিত কাব্যটি দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত। কবি এখানে অতি উজ্জ্বল ও বিস্তৃতভাবে পাঁচটি দীর্ঘ সর্গে পাঁচশতের বেশি শ্লোকে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর বর্ণনা করেছেন।

অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দময়ন্তীর রূপবর্ণনা ও শৃঙ্গাররসের বর্ণনায় কবি পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তবে বর্ণনা স্থানে স্থানে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে। নলের প্রণয়াবেগ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপায়ণ কবির বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। কবি কাব্যের আঙ্গিকের বৈচিত্র্য সম্পাদনে কুড়ি রকমের ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এসব ছাড়া নৈষধচরিত অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্য এবং একে সাহিত্যশিল্প-কৌশলের রত্ন-ভাণ্ডার বলা যেতে পারে।

অপ্রধান কাব্য

মহাকবি কালিদাসের হাতেই সংস্কৃত কাব্য সর্বাপেক্ষা উন্নতিলাভ করে। এর আগে যে সমস্ত কবি ও কাব্যের নাম উল্লেখ করা হল সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তারাও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। এখানে যে সমস্ত কবি ও কাব্যের বিষয় আলোচনা করা হবে তার মধ্যে কাব্যপ্রতিভার অতিশয় কম পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাব্যগুলিতে কবি হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাবকল্পনার প্রকাশ কম। কবিরা এখানে অঙ্গসজ্জা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের দিকেই বেশি নজর দিয়েছেন,—হৃদয়জাত অনুভূতির স্বচ্ছন্দ রূপায়ণের দিকে লক্ষ্য না রেখে।

হরবিজয়—কাশ্মীরী কবি রত্নাকরের (খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী) রচিত একটি মহাকাব্য। এর পঞ্চাশটি সর্গ। শিবকর্তৃক অন্ধকদানববধের কাহিনী এর বিষয় বস্তু। কাব্যটি মাঘ ও বাণভট্টের দ্বারা প্রভাবিত।

কপ্‌ফণাভ্যুদয়—খৃষ্টীয় নবম শতকের রাজা অবন্তীবর্মণের রাজত্বকালে কাশ্মীরী বৌদ্ধ কবি শিবস্বামী-রচিত একটি মহাকাব্য। এর কুড়িটি সর্গ। অবদানশতকের একটি গল্প কাব্যটির বিষয়বস্তু।

কাদম্বরী-কথাসার—খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টের পুত্র অভিনন্দনের রচিত। এটি আট সর্গে বিভক্ত। বাণের কাদম্বরীর কাহিনী কাব্যটির বিষয়বস্তু।

শ্রীকণ্ঠচরিত—দ্বাদশ শতাব্দীর এক কাশ্মীরী কবি মঙ্খের

রচিত। শিব কর্তৃক ত্রিপুরাসুর বধের কাহিনী এর বিষয়বস্তু। এর পঁচিশটি সর্গ।

ত্রিষষ্ঠীশলাকাপুরুষচরিত—১০০৮-১০৭২ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হেমচন্দ্রের রচিত। কাব্যটির সপ্তম খণ্ডকে জৈন রামায়ণ বলা হয় ও দশম খণ্ডের নাম মহাবীরচরিত। এই খণ্ডের বিষয়বস্তু মহাবীরের জীবনকাহিনী। কাব্যটির পরিশিষ্ট পর্ব নানা রূপকথা ও ছোট গল্পের রত্নভাণ্ডার।

ধর্মশর্মাভ্যুদয়—কাব্যটি একুশ সর্গে বিভক্ত। এর রচয়িতা হরিচন্দ্র নামক একজন কবি। এঁর সময় অজ্ঞাত। পঞ্চদশ তীর্থঙ্কর ধর্মনাথের জীবনকাহিনী এর মূল বিষয়।

বালভারত—খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের কবি অমরচন্দ্র এই কাব্যটির রচয়িতা। মহাভারতের কাহিনী এর বিষয়বস্তু। এর উনিশটি পর্ব

পাণ্ডবপুরাণ—কাব্যটির রচয়িতা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর কবি সুবলচন্দ্র। এটি জৈন মহাভারত নামে পরিচিত।

পার্শ্বাভ্যুদয়—কাব্যের রচয়িতা নবম শতকের কবি জিনসেন। কবি পার্শ্বনাথের কাহিনী বর্ণনায় সমগ্র মেঘদূত কাব্যকে অনুসরণ করেছেন।

রাঘবপাণ্ডবীয়—কাব্যটি দ্বাদশ শতকের কবি কবিরাজের রচনা। তেরটি সর্গে এখানে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

যশোধর চরিত—খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর কবি বাদিরাজ

রচিত একটি কাব্য। এখানে চারটি সর্গে রচিত রাজা যশোধরের পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

নলাভ্যুদয়—কাব্যটি চতুর্দশ শতাব্দীর কবি বামনভট্ট বাণের রচনা। নলের কাহিনী এর বর্ণনীয় বিষয় কাব্যটির আটটি সর্গ।

গীতিকাব্য (Lyric)

Lyric শব্দে ইংরাজীতে এক বিশেষ শ্রেণীর প্রেম বিষয়ক ব্যক্তিগত ভাব প্রকাশক গেয় কবিতাকে বোঝায়। সংস্কৃতের ক্ষেত্রে Lyric শব্দকে আরো অনেক ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই এর মধ্যে প্রেম, ধর্ম, নীতি, স্তুতি, বৈরাগ্য প্রভৃতি বহু বিষয়ক কবিতাকে ধরা হয়। ঋগ্বেদের দশম—মণ্ডলের অন্তর্গত যম-যমী ও উর্ব্বশী-পুরুরবার কামনা বাসনা প্রকাশক সংবাদসূক্ত প্রাচীনতম ভারতীয় লিরিক কবিতার নিদর্শন। এরপর লিরিক জাতীয় রচনা দেখতে পাই বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষের সৌন্দরানন্দ। পরবর্ত্তীকালে লিরিক কবিতা সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ ও উন্নতরূপ লাভ করে কালিদাস ও জয়দেবের হাতে। কালক্রমে নীতি, ভক্তি ও ধর্মমূলক বহু লিরিক কাব্য ও কবিতা রচিত হয়েছে।

সংস্কৃত প্রেমবিষয়ক লিরিকে প্রকৃতি একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে এমন আত্মিক সম্পর্ক ও বন্ধন সাহিত্যের অন্য বিভাগে একান্ত দুর্লভ। প্রেমের

বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের জীবনে প্রকৃতি, বিভিন্ন ঋতু, পদ্ম, কুমুদ, চকোর, চক্রবাক, চাতক প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ।

প্রাকৃত ভাষায় লিরিক সাহিত্য কম সমৃদ্ধ নয়। সাতবাহনের গাথাসপ্তশতী এই শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

গাথাসপ্তশতী

এটি সাতশত প্রাকৃত শ্লোকের একটি সঙ্কলন। প্রণয়াবেগের বিভিন্ন অবস্থার চিত্র এখানে পাওয়া যায়। ম্যাকডোনেলের মতানুসারে এটির রচনাকাল ১০০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে।

সংস্কৃত লিরিক সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকবি কালিদাসের

মেঘদূত

মেঘদূতের স্থান সর্বোচ্চ। ঋতুসংহার তাঁর দ্বিতীয় লিরিক কাব্য। এদুটি কাব্যের বিষয়ে পূর্বে কালিদাস প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ঘটকর্পর কাব্য বাইশটি শ্লোকে রচিত এবং ঘটকর্পরের রচনা বলে প্রচলিত। ঘটকর্পর ছিলেন বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী রাজার নবরত্ন সভার এক রত্ন। একজন যুবতী পত্নী কর্তৃক তাঁর প্রবাসী স্বামীর নিকট মেঘকে দূতরূপে প্রেরণের কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু।

শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক নামক তিনটি শতক ভর্তৃহরি রচনা করেন। (শতকের নামেই তাদের সংখ্যা

ভর্তৃহরির তিনটি শতক

ও বিষয়বস্তু বোঝা যায়।) একটি শতক একশতটি শ্লোকের সমষ্টি। শৃঙ্গার শতকের বিষয় প্রেম। বৈরাগ্য শতকের বক্তব্য সংসার-বৈরাগ্য ও নীতি শতকের বিষয় নীতি উপদেশ। কালিদাসের

লিরিকের পর প্রথম প্রাপ্ত এই শতকগুলি বেশ মনোহর ও কাব্যগুণসম্পন্ন। ভট্টিকাব্যের রচয়িতা ভর্তৃহরি ও শতক রচয়িতা ভর্তৃহরি এক ব্যক্তি কিনা এবিষয়ে মতান্তর দেখা যায়। পণ্ডিত মাক্সমূলারের মতে "বাক্যপদীয়" ব্যাকরণের লেখক ভর্তৃহরি এই শতকগুলির রচয়িতা। ভর্তৃহরি ৬৫১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন বলে জানা যায়।

ময়ূরভট্টের সূর্যশতক

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত কাদম্বরী নামক বিখ্যাত গদ্য কাব্যের রচয়িতা বাণভট্টের সমসাময়িক তাঁর শ্বশুর ময়ূরভট্ট সূর্যস্তুতি করে একশ শ্লোকে 'সূর্যশতক' নামক একটি ধর্মমূলক Lyric রচনা করেন। কিম্বদন্তী আছে যে এর পর তিনি কুষ্ঠব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করেন।

বাণভট্ট ময়ূরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভাব নিয়ে "চণ্ডীশতক" নামে একটি শতক রচনা করেন। চণ্ডীর বর্ণনা এর বিষয়বস্তু।

কবি অমরুর রচিত লিরিক কাব্য "অমরুশতক" নামে পরিচিত। এখানে একশত শ্লোকে নারীর জীবনের ও প্রেমের বিভিন্ন অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। প্রেমের ভাবাবেগ চিত্রণ কবির শিল্পকুশলতার পরিচায়ক। অমরুর দৃষ্টিতে প্রেম স্বয়ং-প্রকাশ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনি প্রেমের সঙ্গে জীবনের অন্যদিকে লক্ষ্য করেননি। সেক্ষেত্রে ভর্তৃহরি যেমন প্রেমের মধুরদিকের চিত্র এঁকেছেন সেই সঙ্গে রূঢ় বাস্তবকে অস্বীকার করেননি। অমরুর কাব্য বিশেষ ভাবে কাব্যরসসমৃদ্ধ ও উচ্চশ্রেণীর। সংস্কৃত আলংকারিকরা এই কাব্যটির উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

আনন্দবর্ধনের মতো চিন্তাশীল আলংকারিক এই কাব্য থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

কাশ্মীরী কবি বিল্‌হণ (খৃঃ ১০৭৬-১১২৭) চৌরপঞ্চাশিকা নামক একখানি গীতিকাব্যের রচয়িতা। এর শ্লোক সংখ্যা পঞ্চাশ। প্রণয়ী কর্তৃক প্রণয়িণীর স্মৃতিরোমন্থন—কাব্যটির বিষয়-বস্তু। অনেক পণ্ডিতের মতে এটি কবির নিজের জীবন-কাহিনী। কবি গুজরাটের রাজকুমারী চন্দ্রলেখার শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে প্রণয়াশক্তির কথা জানতে পেরে চন্দ্রলেখার পিতা রাজা বৈরিসিংহ কবি বিল্‌হণকে মৃত্যুদণ্ড দেন। ঘাতকগণের সন্মুখে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হয়ে কবি চন্দ্রলেখাকে উদ্দেশ করে মুখে মুখে পঞ্চাশটি শ্লোক রচনা করেন। রাজা ঘাতকদের কাছে এই কথা শুনে খুশি হয়ে তাঁর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্র তাঁর বাংলা কাব্য বিদ্যাসুন্দর রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন এই কাব্য থেকে।

চৌরপঞ্চাশিকা

কালিদাসের মেঘদূতের পরেই সংস্কৃত লিরিক সাহিত্যের আর একটি উজ্জ্বল রত্ন বাঙালী কবি জয়দেবের রচিত গীতগোবিন্দ। বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণসেনের (খৃঃ দ্বাদশ শতক) সভাকবি ছিলেন তিনি। কবির জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রাম, তাঁর পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী। গীতগোবিন্দ রচনায় জয়দেব তাঁর পত্নী

জয়দেব ও গীতগোবিন্দ

পদ্মাদেবীর কাছ থেকে বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ১১২০ খৃষ্টাব্দে কবি নিজ গ্রামে পরলোক গমন করেন। এখনও পর্যন্ত প্রতি বছর পৌষ মাসের শুক্লাসপ্তমীতে কেন্দু-বিল্বে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়।

গীতগোবিন্দে ভক্তিরস ও শৃঙ্গাররসের একত্র সম্মিলন ঘটেছে। এর বারটি সর্গ। প্রত্যেক সর্গে কৃষ্ণ, রাধা বা সখীর গান আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্দোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বসন্তকালীন লীলা এই কাব্যের বিষয়বস্তু। এখানে রাধা-কৃষ্ণের অমর্ত্য প্রেমলীলা বর্ণনার মাধ্যমে কবি এক অনবদ্য সাহিত্যরস সৃষ্টি করেছেন। ডঃ দীনেশ সেনের মতে এই কাব্যে তিনটি বিষয় আছে—সাহিত্য, ভক্তি, সঙ্গীত ও রহস্য-ময়তা। ম্যাকডোনেলের মতে ইহা একটি Lyric drama.

কাব্যটির মধ্যে শৃঙ্গাররসাত্মক রাধাকৃষ্ণের লীলা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাধার বিরহ, অন্যান্য গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণের লীলা, রাধার বেদনা, মিলনব্যাকুলতা, ঈর্ষা, রাধার সঙ্গীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ, কৃষ্ণের পুনরাগমন, অনুশোচনা ও রাধার অনুনয় ও শেষে রাধাকৃষ্ণের মিলন প্রভৃতির সমাবেশে কাব্যটি মধুর।

জয়দেব নিজের ভাষাকে নিজেই মধুর কোমলকান্ত বলেছেন—একথা পুরোপুরিভাবে সত্য। গীতগোবিন্দ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি প্রারম্ভেই বলেছেন—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্,

মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্।

যদি হরিস্মরণে মনকে সরস করার ইচ্ছা হয়, যদি তাঁর বিলাসকলা জানার আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহালে জয়দেব-রচিত এই মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী শ্রবণ করুন।

কবির নিজের কথা অনুসারে গীতগোবিন্দ রচনার দুইটি উদ্দেশ্য—একটি হরিভক্তিপ্রচার—অপরটি তাঁর বিলাসকলা পাঠকবর্গকে জানান। গীতগোবিন্দ ভক্তি ও রস-বিতরণ করে পাঠকচিত্তে স্থায়ী হয়ে আছে, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্যের অনুপ্রেরণা ও উৎস এই গীত-গোবিন্দ। এটি সংস্কৃত রচনা হলেও সুললিত ও সহজবোধ্য।

পরবর্ত্তী সাহিত্যে প্রভাব

কাব্যটি বৈষ্ণবদের উপর এত প্রভাব বিস্তার করে যে পরবর্ত্তী কালে বহু বৈষ্ণব কবি গীতগোবিন্দের বাচনভঙ্গী, অলঙ্কার প্রয়োগ, বিষয়বস্তু ও ছন্দ প্রভৃতির অনুসরণ করে পদ রচনা করেছেন। তবে এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণের যে ঐশ্বর্য্য-ভাবের বর্ণনা আছে তা একমাত্র বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়া অন্য কোন বৈষ্ণবপদকর্ত্তা অনুসরণ করেন নি। তাঁরা এখানে রূপায়িত মাধুর্যভাবেরই অনুসরণ করেছেন। এমন কি এখানকার অনেক শ্লোক সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণবপদাবলীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

এই গ্রন্থটি যেমন সারা ভারতে প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তেমনি পাশ্চাত্য দেশেও এর যশ ছড়িয়ে পড়েছে।

Goethe, Lassen, Jones, Lavi প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

পবনদূত

লক্ষণসেনের রাজসভায় জয়দেবের সঙ্গে গোবর্দ্ধন, শরণ, উমাপতি, ধোয়ী কবিরাজ প্রভৃতি কবি ছিলেন। মেঘদূতের অনুকরণে ধোয়ী রচনা করেন পবনদূত।

অপ্রধান গীতিকাব্য

কৃষ্ণকর্ণামৃত—নামে একখানি ভক্তিমূলক কাব্য রচনা করেন একাদশ শতাব্দীর লীলাশুক ও বিল্বমঙ্গল। এই কাব্যে একশত দশটি শ্লোকে শৃঙ্গাররসাশ্রয়ী পরিবেশে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিউচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যের ভক্ত রূপগোস্বামীর সঙ্কলিত পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিজ্ঞাপক বহু কবিতা সংগৃহীত আছে। এগুলি ছাড়া আরো অনেকগুলি Lyric জাতীয় কাব্যের নাম ও তাদের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হল। এদের কাব্যমূল্য অপেক্ষাকৃত কম।

শৃঙ্গারতিলক ঃ—কালিদাসের নামে আরোপিত। এখানে তেইশটি শ্লোকে প্রেমের আকর্ষণীয় ছবি আঁকা হয়েছে।

ভক্তামৃতস্তোত্র ঃ—বাণভট্টের সমসাময়িক কবি মানতুঙে্গর রচনা। এখানে চুয়াল্লিশটি শ্লোকে জৈন সন্ন্যাসী ঋষভের স্তুতি করা হয়েছে।

বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা—কাশ্মীরী কবি রত্নাকরের রচনা। এখানে পঞ্চাশটি শ্লোকে কবি সংস্কৃত শ্লেষবক্রোক্তি রচনায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

· **কল্যাণমন্দির স্তোত্র**—মানতুঙ্গের অনুকরণে সিদ্ধসেন দিবাকর নামে একজন কবির রচনা। ইনি সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক। এতে চুয়াল্লিশটি শ্লোক আছে।

স্রগ্ধরা স্তোত্র—অষ্টম শতাব্দীর এক বৌদ্ধ কবি সর্বজ্ঞ মিত্রের রচনা। এটি বৌদ্ধদেবী তারার উদ্দেশ্যে স্তুতি। শ্লোক সংখ্যা সাঁইত্রিশ।

কুট্টনীমাতা—খৃষ্টীয় ৭৭২—৮১৩ শতকের কাশ্মীরের রাজা জয়পীড়ের মন্ত্রী দামোদর গুপ্তের রচনা। একটি তরুণী কি ভাবে তোষামোদ ও প্রেমের অভিনয় করে স্বর্গ লাভ করল তারই কৌতুকপ্রদ কাহিনী এর বিষয়বস্তু।

মহিম্নস্তোত্র—নবম শতকের কাছাকাছি সময়ের কবি পুষ্পদন্ত রচিত একটি ধর্মমূলক গীতিকাব্য।

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়—একাদশ শতকের একটি কাব্য সংগ্রহ। শ্লোক সংখ্যা ৫২৫।

আর্য্যা সপ্তশতী—জয়দেবের সমসাময়িক কবি গোবর্দ্ধনের রচনা। এতে শৃঙ্গাররসাত্মক সাতশত শ্লোক আছে। এটি হালের 'সত্তসই'এর অনুকরণে রচিত।

সদুক্তি কর্ণামৃত—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর একটি কাব্য সঙ্কলন। এতে ৪৪৬ জন কবির রচনা আছে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগ কবি বাঙালী।

শান্তিশতক—১২০৫ খৃষ্টাব্দের কাশ্মীরী কবি শিল্হণের রচনা। এটি ভর্তৃহরির শতকের অনুকরণে রচিত।

ভক্তিশতক—খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাঙালী কবি রামচন্দ্র রচিত। কবি রাজা পরাক্রমবাহুর সঙ্গে সিংহল গিয়েছিলেন।

শৃঙ্গারবৈরাগ্যতরঙ্গিনী—ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি সোমপ্রভের রচনা। এখানে কাব্যরীতিতে লেখা ছেচল্লিশটি নীতিমূলক শ্লোক আছে।

সুভাষিত মুক্তাবলী—জল্হনের (ত্রয়োদশ শতাব্দী) কাব্য সংগ্রহ।

সুভাষিতাবলী—পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখক শ্রীধরের কাব্য সংগ্রহ।

মেঘদূতের অনুকরণে লেখা অপ্রধান কয়েকটি লঘু কাব্য ও গ্রন্থকারের নাম নীচে দেওয়া হইল।

কাব্য	কবি
চন্দ্রদূত	জম্বু
পবনদূত	ধোয়ী
পদাঙ্কদূত	কৃষ্ণসার্বভৌম
ভ্রমরদূত	রুদ্র
মনোদূত	ব্রজনাথ
হংসদূত	রূপগোস্বামী

চম্পূকাব্য*

গদ্য ও পদ্যে যে কাব্য রচিত তাকে চম্পূকাব্য বলে চম্পূ সম্বন্ধে বিভিন্ন অলংকারিক এই কথা বলেছেন কিন্তু কেউই সঠিকভাবে নির্দ্দেশ দেননি যে এই শ্রেণীর রচনায় কতখানি গদ্য ও কতটুকু অংশ পদ্য থাকবে। কথা ও আখ্যারিকার মধ্যেও গদ্য থাকে কিন্তু সেখানে কাহিনী বর্ণনার প্রধান মাধ্যম গদ্য কিন্তু চম্পূতে কাহিনী অংশ গদ্য ও পদ্য উভয়ের সাহায্যেই বলা হয়। তবে একই বাক্যে গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত থাকে না অর্থাৎ কোনো অংশ পুরোপুরি গদ্যে আর কোনো অংশ পদ্যে রচিত। বোধ হয় গদ্য রচনার একঘেয়ে ভাব থেকে পাঠকদের মনে মাঝে মাঝে ছন্দের ঝঙ্কার দেবার জন্য কথনভঙ্গিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই জাতীয় রচনার প্রচলন হয়। গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় সাহিত্যে চলে আসছে। বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদে এর প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাভারত, পুরাণেও কিছু গদ্য আছে। তাছাড়া পালিজাতক ও সংস্কৃত গল্পসাহিত্যে, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতিতে গদ্য ও পদ্য একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে চম্পূ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সমূহের আদর্শেই লিখিত মনে করা ঠিক নয়, বরং কথা ও আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্য রচনার সঙ্গে চম্পূর সাদৃশ্য অধিকতর।

---

* গদ্যপদ্যময়ীভাষা চম্পূরিত্যভিধীয়তে। কাব্যাদর্শ—দণ্ডী। গদ্য পদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিত্যভিধীয়তে। সাহিত্যদর্পণ—বিশ্বনাথ।

চম্পূকাব্যের অধিকাংশগুলি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। গদ্য ও পদ্য একত্রে সন্নিবেশিত হওয়ার জন্যে এই শ্রেণীর সাহিত্যে গদ্যের বলিষ্ঠভাব ও পদ্যের মাধুর্য উভয়ই কম।

বিষয় বস্তু

নলচম্পূ বা দয়মন্তী কথা চম্পূকাব্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির রচয়িতা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নেমাদিত্যের পুত্র ত্রিবিক্রম ভট্ট। নলদয়মন্তী কাহিনীর কিছু অংশ অবলম্বনে এই গ্রন্থটি রচিত। এর সাতটি উচ্ছ্বাস। ত্রিবিক্রম রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজা তৃতীয় ইন্দ্রের নৌসরী লিপির (৯১৫ খৃষ্টাব্দে) লেখক। সরস্বতীর বরে তিনি নলচম্পূ রচনা করেন। কিন্তু কাব্যটি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। মদালসাচম্পূ নামে আর একটি চম্পূ তাঁর নামে প্রচলিত।

নলচম্পূ

যশস্তিলকচম্পূ সোমদেব নামক এক দিগম্বর জৈন রচিত। কাব্যটি সাতটি আশ্বাসে বিভক্ত। কবি চালুক্য বংশের অরিকেশরীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের উৎসাহে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। চম্পূকাব্যের মধ্যে এটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। অবন্তীর রাজা যশোধরের জীবনী অবলম্বনে এটি রচিত। গ্রন্থের শেষ তিন আশ্বাসে জৈনধর্মের ব্যাখ্যা আছে। এই কাব্যটির রচনাকাল ৫৯৯ খৃষ্টাব্দ।

রামায়ণচম্পূ—ধারার রাজা ভোজের রচিত (১০১৮-৬৩ খৃঃ)। ভোজের শৈশবে তাঁর পিতা সিন্ধুল পরলোক গমন করেন। তাঁর এক খুল্লতাত রাজা হন। পরে তিনি ভোজের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে রাজ্যে অভিষেক করেন। বল্লাল

তাঁর "ভোজ প্রবন্ধে" রাজা ভোজের কাব্য-প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। রামায়ণ চম্পূর কিস্কিন্ধা কাণ্ড পর্যন্ত ভোজের রচনা বলে পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন। শেষ অংশ পরবর্ত্তী কালের লক্ষ্মণ নামে কোনো কবির রচনা ও সংযোজন।

ভাগবতচম্পুর লেখক অভিনব কালিদাসের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করে অনন্তভট্ট নামে একজন কবি অপর একখানি ভাগবৎচম্পু ও ভারতচম্পু রচনা করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী এঁর আবির্ভাব সময় মনে করা হয়। ভারতচম্পু পণ্ডিত মহলে প্রশংসা অর্জন করে।

উদয়সুন্দরী-কথা—সোদ্ঢল নামে কোনো কবির রচনা (১৪০০ খৃষ্টাব্দ)। কাব্যটিতে বাণভট্টের রচনার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে।

গোপালচম্পূ—জীবগোস্বামী-রচিত। (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী)।

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন অবলম্বনে কবি কর্ণপুর-রচিত একটি চম্পূকাব্য।

পারিজাতহরণচম্পূ—খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত শেষকৃষ্ণ নামে এক কবি রচিত।

স্বাহাসুধাকরচম্পূ—খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি নারায়ণ রচিত।

গদ্যসাহিত্য

সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্য অপেক্ষা পদ্য রচনার সংখ্যাই বেশি, পদ্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক কাল এর উৎপত্তির উৎস। ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য যে ঋগ্বেদ, তা পদ্য রচনা। পদ্যের মত অত প্রাচীন না হলেও গদ্যের আবির্ভাব কাল সেই বৈদিক যুগ।

বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ প্রচারের সময় গদ্যের আবির্ভাব। কৃষ্ণযজুর্বেদে প্রাচীনতম গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় গদ্যে লিপিবদ্ধ। অথর্ববেদের কিছু অংশ গদ্যে রচিত। যতই দেশের মধ্যে বিভিন্ন যাগযজ্ঞানুষ্ঠান প্রচলিত হতে থাকে ততই গদ্যের প্রচলন হয়। বিভিন্ন যাগযজ্ঞের নিয়মকানুন গদ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে সংহিতা যুগের পর বিশাল ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই গদ্য সাহিত্যগুণ-সমৃদ্ধ নয়, বরং অত্যন্ত নীরস, পাঠে উৎসাহ আসেনা। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের যে অন্য অংশ আরণ্যক ও উপনিষদ, এদের কতকগুলি পুরোপুরি এবং কতকগুলির কিছু অংশ গদ্যে রচিত।

প্রাচীনতম গদ্যের নিদর্শন।

ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণ-যুগের পর কল্পসূত্রগুলির আবির্ভাব কালে গদ্য আরও প্রসার লাভ করে। শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্মও শুল্ব এই চারিটি কল্পসুত্রের মধ্যে বহুল ভাবে গদ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

সূত্রসাহিত্য

মহাভারতেরও কিছু কিছু অংশ গদ্যে লিখিত। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের কিছু অংশ গদ্য। বিষ্ণুপুরাণ ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও গদ্য রচনা পাওয়া যায়।

মহাভারত ও পুরাণ

প্রাচীন যুগের গদ্য রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পতঞ্জলির মহাভাষ্য। পতঞ্জলির হাতে ব্রাহ্মণ যুগের নীরস গদ্য বেশ শ্রুতিসুখকর ও প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর মহাভাষ্যে বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা ও ভৈমরথী নামে তিনটি গদ্যকাব্যের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলি পাওয়া যায়নি, কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। এ ছাড়া বররুচির চারুমতী, সোমিলের শূদ্রককথা, শ্রীপালিতের তরঙ্গবতী প্রভৃতি গদ্য রচনার নাম মাত্র জানা যায়।

মহাভাষ্য

সংস্কৃত গদ্য যে ক্রমশঃ উন্নতির পথে এগিয়ে আসছিল, পূর্বোক্ত নামগুলির উল্লেখ থেকে তা বোঝা যায়। বিভিন্ন গ্রন্থের ভাষ্য ও টীকা প্রভৃতিতে যে গদ্যরচনা পাওয়া যায় সেগুলি গদ্যরচনার অগ্রগতিরই পরিচয় দেয়। ব্রহ্মসূত্রের শাংকর ভাষ্য, মীমাংসাসূত্রের শাবর ভাষ্য, মনুসংহিতার মেধাতিথিভাষ্য প্রভৃতি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। সংস্কৃত গদ্যের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে সংস্কৃত নাটকের গদ্যাংশ ও প্রশস্তিগুলির দান কম নয়।

বিভিন্ন ভাষ্য ও টীকা

অনেকগুলি প্রশস্তি বেশ কাব্যরসযুক্ত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গীর্ণার প্রশস্তি (১৫০ খৃষ্টাব্দ) ও হরিষেনের এলাহাবাদ প্রশস্তি। বাণভট্ট হর্ষচরিতে ভট্টার হরিচন্দ্র ও আঢ্যরাজ নামে দুজন গদ্যকাব্য-কারের নাম করেছেন। জল্হনের সূক্তি-মুক্তাবলীতে শীল-ভট্টারিকা নামে একজন গদ্যকাব্য লেখিকার নাম পাওয়া যায়।

প্রশস্তি

এই সব নিদর্শন থেকে বোঝা যায়, গদ্যকাব্যের উৎপত্তি অতি প্রাচীন কালে। কিন্তু এই প্রাচীন গদ্যকাব্যগুলি দুর্ভাগ্য ক্রমে নষ্ট হয়ে গেছে।

গদ্যকাব্য

গদ্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—বৃত্তগন্ধোজ্‌ঝিতং গদ্যম্‌—যে রচনা ছন্দোবদ্ধ নয় তা গদ্য। সংস্কৃত গদ্যকাব্য দুরকমের—কথা ও আখ্যায়িকা। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শগ্রন্থে বলেছেন, কথা ও আখ্যায়িকায় খুব বেশি রকমের পার্থক্য নেই। অভিধান লেখক অমরসিংহের মতে আখ্যায়িকা ইতিহাস ভিত্তিক এবং কথা সম্পূর্ণরূপে কল্পনাশ্রয়ী কাব্য। এই মতানুসারে বাণভট্টের হর্ষচরিত, দণ্ডীর দশকুমারচরিত আখ্যায়িকা এবং কাদম্বরী ও সুবন্ধুর বাসবদত্তা কথা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

কথা ও আখ্যায়িকা

দণ্ডী

দশকুমারচরিত—রচয়িতা দণ্ডী দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীর অধিবাসী ছিলেন। শৈশবেই তাঁর মাতাপিতা পরলোক গমন করেন। চালুক্য নৃপতি বিক্রমাদিত্য কাঞ্চি অধিকার করলে (৬৬৫ খৃষ্টাব্দ) দণ্ডী স্বদেশ ছেড়ে চলে যান এবং পরে পহ্লব-রাজ নরসিংহবর্মা কাঞ্চী পুনরধিকার করলে ফিরে আসেন।

দণ্ডীর সময় সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। কারো মতে কাব্যাদর্শ নামে অলংকারগ্রন্থের লেখক দণ্ডী ও দশকুমার-চরিতের লেখক দণ্ডী এক ব্যক্তি নন। আবার কেউ কেউ বলেন, উভয় গ্রন্থের লেখক একই ব্যক্তি। কাব্যাদর্শপ্রণেতা দণ্ডীর আবির্ভাব রাজা প্রবরসেনের পরবর্ত্তীকালে। 'রাজত-রঙ্গিনী' তে বলা হয়েছে, প্রবরসেন ষষ্ঠ শতকে কাশ্মীরে রাজত্ব করেন।

দণ্ডীর সঙ্গে ভামহের সম্পর্ক নিয়ে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলেন, দণ্ডী আলংকারিক ভামহের মতের সমালোচনা করেছেন। আবার আলংকারিক বামন দণ্ডীর মতের সমালোচনা করেছেন। এতে মনে করা যায় দণ্ডী ভামহ ও বামনের মধ্যবর্ত্তী সময়ের লোক। অষ্টম শতাব্দী ভামহের আবির্ভাব কাল বলে অনেকে মনে করেন।

আবার কারো মতে দণ্ডী ভট্টিকাব্যের সাহায্য নিয়েছেন।

দণ্ডীর সময়

ভট্টির সময় সপ্তম শতাব্দী সুতরাং দণ্ডীর সময় এরূপর।

দশকুমারচরিতে যে ভৌগলিক বিবরণ পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, রাজা হর্ষবর্ধনের আবির্ভাবের পূর্বেই দণ্ডী এই গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া এই গ্রন্থের ভাষার প্রাঞ্জলতা দেখেও মনে হয়, বাণের সমাসবহুল রচনা কাদম্বরী, হর্ষচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হওয়ার আগে দশকুমারচরিত রচিত। এই সমস্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করে গবেষকগণ মনে করেন বাণভট্টের আবির্ভাবের আগে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমাংশে দণ্ডীর আবির্ভাবকাল।

দশকুমারচরিত আখ্যায়িকা শ্রেণীর অন্তর্গত। এর দুভাগ—পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা। এটি একটি সংস্কৃত রোমান্স। গ্রন্থটিতে আটজন রাজকুমারের কাহিনী আছে। নামের সার্থকতার জন্য আরো দুজন রাজকুমারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিশ্রুত নামে অন্য একজন রাজকুমারের কাহিনী আছে উত্তরপীঠিকায়। এই অংশটি পরবর্ত্তী কালের যোজনা বলে অনেকে মনে করেন। গ্রন্থটি থেকে গ্রন্থকারের সমসাময়িক কালের সমাজের অনেক বিষয় জানতে পারা যায়। সেই সময় নৈতিক মান উন্নত ছিল না বলে মনে হয়, কারণ এইরূপ চিত্র দশকুমারচরিতে চিত্রিত আছে।

'দণ্ডিনঃ পদলালিত্যম্' কথাটি প্রচলিত আছে ; এর দ্বারাই বোঝা যায় দণ্ডীর রচনা পণ্ডিতগণের প্রশংসা অর্জন করেছিল। দণ্ডীর রচনাশৈলী গতিশীল। মাঝে মাঝে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাক্যপ্রয়োগ থাকলেও তাঁর রচনা সুখপাঠ্য। বৈদর্ভী রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দণ্ডীর দশকুমারচরিত। দশজনকুমারের অভিজ্ঞতার

কাহিনীগুলি লেখক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করেছেন, যার ফলে গ্রন্থটি পাঠ করতে আরম্ভ করলে উত্তরোত্তর পাঠকদের কৌতূহল বাড়তে থাকে। চরিত্রচিত্রণ ও হাস্যরস পরিবেশনে দণ্ডী যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। অবন্তীসুন্দরীকথা নামে আর একটি গ্রন্থ দণ্ডীর রচিত বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের মতে এটি নাকি দশকুমার-চরিতের লুপ্ত অংশ। অবন্তীসুন্দরী-কথাসার নামে এর একটি পদ্যরূপও পাওয়া যায়। আবার অনেকের মতে অবন্তীসুন্দরী-কথা দণ্ডীর রচিত নয়।

সুবন্ধু

সুবন্ধু বাণভট্টের পূর্ববর্তী। কারণ বাণ তাঁর কাদম্বরীতে প্রথমাংশের শ্লোকগুলির মধ্যে বাসবদত্তার উল্লেখ করেছেন। বাসবদত্তাতে বিক্রমাদিত্যের নামোল্লেখ আছে বলে অনেকে

সময়

সুবন্ধুকে গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সম-সাময়িক মনে করেন। বাকপতিরাজের গৌরবহে ভাস, কালিদাস ও হরিচন্দ্রের সঙ্গে এবং মঙ্খের শ্রীকণ্ঠচরিতে মেণ্ঠ, ভারবি ও বাণের সঙ্গে সুবন্ধুর নাম দেখা যায়। বামন তাঁর কাব্যালংকার গ্রন্থে সুবন্ধুর উল্লেখ করেছেন।

বাসবদত্তার দুটো বাক্য থেকে অনেকে মনে করেন সুবন্ধু সেখানে নৈয়ায়িক উদ্যোতকারের রচনা ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝা-

মাঝি সময়ে আবির্ভূত ধর্মকীর্ত্তির লেখা বুদ্ধসঙ্গতি নামক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এই প্রমাণের উপর বিশ্বাস করলে সুবন্ধু সপ্তম শতকের প্রথমভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলা যেতে পারে।

সুবন্ধু-রচিত 'বাসবদত্তা' ও একখানি গদ্য রোমান্স। রাজপুত্র কন্দর্পকেতু ও রাজকন্যা বাসবদত্তার প্রণয়-কাহিনী এই রোমান্সটির বিষয়বস্তু। কাহিনীটি এইরূপ :—

একরাত্রে রাজকুমার কন্দর্পকেতু রাজকন্যা বাসবদত্তাকে স্বপ্নে দেখে তাঁকে খুঁজতে বের হন। এদিকে রাজকন্যাও কন্দর্পকেতুকে স্বপ্নে দেখে তাঁকে খুঁজবার জন্য সখীকে পাঠান। ভ্রমণ করতে করতে রাজপুত্র পথে এক পক্ষীদম্পতির কাছে বাসবদত্তার বিষয় জানতে পারেন। রাজকুমার আরো জানতে পারলেন যে সেইদিনই বাসবদত্তার স্বয়ম্বরসভায় বহু রাজকুমার উপস্থিত হয়েছেন কিন্তু রাজকন্যা স্বপ্নে-দেখা রাজকুমার কন্দর্প-কেতুকে ছাড়া আর কাউকে বরণ করবেন না। তমালিকার সঙ্গে দেখা হলে তার সাহায্যে কন্দর্পকেতু গোপনে রাজ-অন্তঃপুর থেকে বাসবদত্তাকে সঙ্গে করে পালিয়ে গেলেন। পথে দুজনে চলার সময় উভয়ে ক্লান্ত হয়ে একজায়গায় ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভাঙার পর বাসবদত্তা বনে ফল সংগ্রহ করতে গেলে তাকে লাভ করার জন্য দুই কিরাতের মধ্যে যুদ্ধ বাধে এবং এতে দুজনেই নিহত হয়। কাছেই ছিল এক ঋষির তপোবন। এই যুদ্ধের ও তপোবন শ্রীভ্রষ্ট হওয়ার কারণ বাসবদত্তা জেনে ঋষি তাঁকে পাথরে রূপান্তরিত হওয়ার

অভিশাপ দেন। শেষে তাঁরই অনুরোধে ঋষি প্রসন্ন হয়ে বলেন যে প্রেমিকের হাতের ছোঁয়া পেলে তাঁর প্রস্তররূপের অবসান হবে।

এদিকে কন্দর্পকেতু বাসবদত্তাকে খুঁজে না পেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করতে এক দৈববানীতে বলা হয় যে তিনি আবার বাসবদত্তাকে ফিরে পাবেন। এই কথার উপর ভরসা রেখে ঘুরতে ঘুরতে রাজপুত্র একদিন একটি বাসবদত্তার মত প্রস্তরমূর্ত্তি দেখে তাকে আবেগে আলিঙ্গন করেন। তৎক্ষণাৎ বাসবদত্তার শাপের অবসান ঘটে এবং রাজপুত্রের সঙ্গে তার পুনর্মিলন হয়।

সুবন্ধুর রচনা যে বিশেষ প্রশংসাভাজন হয় তার নিদর্শন নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি—

সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজঃ ইতি ত্রয়ঃ
বক্রোক্তিমার্গনিপুণশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা।

সুবন্ধুর বাসবদত্তার ভাষা অনুপ্রাস যমক শ্লেষ বিরোধাভাস প্রভৃতি নানারকম শব্দালংকার ও অর্থালংকারে অলংকৃত। তিনি বিশেষভাবে শ্লেষ অলংকার প্রয়োগে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। লেখক গৌরীরীতির অনুসরণকারী। তাঁর বাসবদত্তা সমাসবহুল রচনা হলেও অনুপ্রাস যমক অলংকারে শ্রুতিমধুর। তবে সুবন্ধু চরিত্র-চিত্রণে খুব দক্ষতার ছাপ রেখে যেতে পারেননি।

বাণভট্ট

বাণভট্টের হর্ষচরিত ও কাদম্বরী দুইটি বিখ্যাত গদ্যরচনা। এর প্রথমটি আখ্যায়িকা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। কারণ

হর্ষচরিত

এর ভিত্তি ইতিহাস এবং এই কারণে এটিকে ঐতিহাসিক রচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে গ্রন্থটি ইতিহাসাশ্রয়ী হলেও পুরোপুরি ইতিহাস নয়। এখানে কাব্যাংশ ও অতিরঞ্জনেরই প্রাধান্য দেখা যায়। বাণ এখানে তাঁর পৃষ্টপোষক রাজা হর্ষবর্ধনের বেশি করে গুণগান করেছেন। তিনি এখানে বলেছেন যে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার পর হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন। কনৌজেশ্বর হর্ষবর্ধনের (৬১০—৪৭ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালের শেষভাগে বাণ এই গ্রন্থটি রচনা করেন বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

কাদম্বরী গ্রন্থের প্রথম দিকে কতকগুলি শ্লোকের

পরিচয়

(১০—১৯) মধ্যে বাণ নিজের সম্বন্ধে যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তাতে জানা যায় তাঁর পিতার নাম চিত্রভানু ও মাতা রাজদেবী।

হর্ষচরিতের আড়াই উচ্ছ্বাসে কবি নিজের পরিচয় রেখে গেছেন। তারপর আছে রাজা হর্ষবর্ধনের কথা। স্থানীশ্বরের রাজা পুষ্পভূতির বংশে শক্তিশালী রাজা ছিলেন প্রভাকরবর্ধন। রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন তাঁর দুই পুত্র ও রাজ্যশ্রী নামে তাঁর একটি কন্যা ছিল। রাজ্যশ্রীর বিয়ে হয় মৌখরীরাজ গ্রহ বর্মার

সঙ্গে। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনগ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু ছোট ভাই হর্ষকে সিংহাসনে অভিষেক করার আগেই তিনি খবর পেলেন রাজ্যশ্রী অপহৃতা ও তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছেন মালবরাজ। রাজ্যবর্ধন মালবরাজের বিরূদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন। কিন্তু গৌড়ের রাজা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে হত্যা করেন।

এই সংবাদ পেয়ে হর্ষবর্ধন প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় যুদ্ধ-যাত্রা করে বিন্ধ্যপর্বতে এসে উপস্থিত হন। নির্ঘাট নামে একজন তরুণ পর্বতারোহী রাজ্যশ্রীর অন্বেষণে তাঁর সহায়ক হলেন। কিন্তু যখন জানা গেল রাজ্যশ্রী মালবরাজের বন্দীশালা থেকে পালিয়ে গেছে এবং হয়তো কোনো বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন হর্ষবর্ধন দিবাকর মিত্র নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন ভগ্নীর খোঁজে। রাজ্যশ্রী এখন আত্মহত্যায় উদ্যত,—এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে এই সংবাদ শুনে তিনি তাড়াতাড়ি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করে দিবাকর মিত্রের কাছে নিয়ে এলেন। ভ্রাতা ভগ্নীর মিলনের মধ্য দিয়ে হঠাৎ গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

গ্রন্থটির ভিত্তি ইতিহাস হলেও এর ভেতরে বর্ণিত ঘটনাগুলির ঐতিহাসিকতা কম অর্থাৎ এর বিষয় নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নয়। গ্রন্থটি বাণভট্টের বর্ণনা-নৈপুণ্য ও কাব্য-প্রতিভারই বেশি পরিচয় দেয়। গ্রন্থটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত এবং আখ্যায়িকা শ্রেণীর।

বাণভট্টের অমর সাহিত্যকীর্ত্তি কাদম্বরী। এটি কথা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। অখ্যায়িকার বৈশিষ্ট্য এতে নেই। এর গল্পটি কাল্পনিক। অধ্যাপক কীথ এই শ্রেণীর কথা গ্রন্থকে জটিল আখ্যায়িকা বলার পক্ষপাতী।[১] এই গ্রন্থে মূল কাহিনীর মধ্যে অন্যান্য কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কাদম্বরী গ্রন্থটিই বাণকে অসাধারণ প্রতিভাবান লেখক হিসাবে সুধীসমাজে পরিচিত করে। সংস্কৃত সাহিত্যে কাদম্বরীই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, জনপ্রিয় ও চিত্তাকর্ষক রোমান্স।

কাদম্বরী

গ্রন্থটির দুভাগ—পূর্ব ও উত্তর। পূর্বভাগ বাণরচিত এবং উত্তরভাগ রচনা করেন তাঁর পুত্র ভূষণভট্ট।

এক চণ্ডালকন্যা বিদিশার রাজা শূদ্রকের কাছে এক সময় একটি শুক পাখী নিয়ে আসে। এই পাখীটি ছিল জাতিস্মর। কাদম্বরী গ্রন্থে বৈশম্পায়ন নামে এই শুকপাখী কাহিনীর প্রধান বক্তা। বর্ত্তমান জীবনে ও পূর্ব জন্মে রাজকুমার চন্দ্রাপীড় ও গন্ধর্ব রাজকুমারী কাদম্বরীর প্রণয় কাহিনী এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। এই মূল কাহিনীর সঙ্গে পুণ্ডরীক ও কাদম্বরীর সখী মহাশ্বেতার প্রেম কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাশ্বেতার প্রণয়ী পুণ্ডরীকের অভিশাপে চন্দ্রমা মর্ত্তে চন্দ্রাপীড় রূপে জন্মলাভ করেন ও

কাহিনী

১। A Katha might be deemed a complex Akhyayika, one in which a main narrative was the mode in which sub-narrative cause to be set forth in due place.
—A Hist of Sams Lit. by A. B. Keith

কাদম্বরীর প্রেমাসক্ত হন। এদিকে আবার চন্দ্রমার শাপে পুণ্ডরীক এজন্মে বৈশম্পায়ন রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে চন্দ্রাপীড় রাজা শূদ্রক এবং বৈশম্পায়ন শুকরূপ লাভ করেন।

একটি কাহিনীর মধ্যে অন্যকাহিনী বর্ণনার পদ্ধতি ভারতে অতি প্রাচীন। গুণাঢ্যের বৃহৎকথাতেও এই পদ্ধতি অনুসৃত। বৌদ্ধজাতকগুলির মধ্যে এ জন্মের কাহিনীর মধ্যে পূর্বজন্মের কাহিনী বলার রীতি প্রচলিত। কাদম্বরী এই ধারাই অনুসারী। পরবর্ত্তীকালের বেতালপঞ্চবিংশতিতেও এই জাতীয় রীতি প্রায়অনুসৃত। পঞ্চতন্ত্রে একটি গল্পের মধ্যে বলা একটি নীতি বোঝাতে অনেক গল্পের অবতারণা করা হয়েছে। দশকুমার-চরিতের মধ্যে রাজকুমারগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন কাহিনী বলেছে। মনে হয়, গুণাঢ্যের বৃহৎকথাই এক কাহিনীর প্রসঙ্গে অন্যকাহিনী বর্ণনায় পরবর্ত্তীকালের এই শ্রেণীর গদ্যকাহিনী গ্রন্থের পথপ্রদর্শক।

সাহিত্যগুণ

বাণভট্টের কাদম্বরী সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে সূর্যকর-সমুজ্জ্বল তুষারমৌলি সর্বোচ্চশীর্ষ বর্ণাঢ্যরাগরঞ্জিত হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের মতো আত্মগৌরবে একক। কাদম্বরীর প্রশংসাব্যঞ্জক সমালোচকগণের বহু উক্তি প্রচলিত আছে। কাদম্বরী শব্দটির অর্থ মদ। মদ্যপানে মানুষ যেমন নিজেকে হারিয়ে ফেলে কাদম্বরীর পাঠকও তেমনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।[১]

১। কাদম্বরী রসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে।

এই গ্রন্থে বাণভট্ট তাঁর দূরযানী কল্পনার বর্ণাঢ্য বর্ণনায়, নায়ক-নায়িকার চরিত্রচিত্রণে, প্রাকৃতিক দৃশ্যের হৃদয়হারী বর্ণনায়, প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মানসিক ভাব বিশ্লেষণে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাণের নাটকীয়তা বোধও অদ্ভুত। রাজা শূদ্রকের অত্যুজ্জ্বল বর্ণনার পরেই তিনি সেখানে উপস্থিত করেছেন এক শ্যামাঙ্গী তরুণী চণ্ডালকন্যাকে। সে সেখানে নিয়ে এল এক পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপাখী। পাখীটি আবার জাতিস্মর। সে তার জীবনকাহিনী বলতে আরম্ভ করল। এইভাবে বাণ তাঁর কাহিনীতে নাটকীয় গতিবেগ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অসাধারণ প্রকৃতিপ্রেম প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিস্তৃত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কাদম্বরীকে রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রশালা' বলেছেন। সত্যই গ্রন্থটি পাঠ করলে পাঠকদের মনের দর্পণে একটির পর একটি মনোরম চিত্র ফুটে ওঠে। অসংখ্য পক্ষীকুলের আবাসস্থান বিরাট শাল্মলী বৃক্ষ, বিন্ধ্যারণ্যের গম্ভীর মাধুর্য্য, জাবালির আশ্রমের শান্ত মহিমা, রাজা শূদ্রক ও তারাপীড়ের রাজসভার ঐশ্বর্য আড়ম্বর, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রক্তিম আকর্ষণ, অচ্ছোদ সরোবরের শান্ত শীতলতা, মহাশ্বেতার স্নিগ্ধ করুণ প্রতিমা বাণভট্টের লেখনীপ্রসূত মনোজ্ঞ আলেখ্য। আর এখানকার নরনারীরাও যেন স্বপ্ন-মায়া-জড়ানো। বই পড়ে এদের জীবন্ত দেখতে ইচ্ছা হয়। বাণের লেখনীর এমনি ক্ষমতা যে অতি সাধারণ, অতি তুচ্ছ জিনিষও আকর্ষণীয় মনোরম হয়ে উঠেছে এই গ্রন্থে। 'কাদম্বরীকার মুখ্য গৌণ

ছোটো বড় কোনো কথাকেই কিছুমাত্র বঞ্চিত করিতে চান নাই'।[১]

ভবভূতি বলেছেন—যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো-জনঃ। অর্থাৎ নারীর চরিত্রের মতো কাব্যের সাধুতা সম্বন্ধেও মানুষ সন্দিহান। তাই একদিকে যেমন বাণের রচনার প্রশংসা আছে অন্যদিকে কিছু অভিযোগও আছে। Weber এর মতে বাণের ত্রুটি বর্ণনাসময়ে মাত্রাজ্ঞানের অভাব, দীর্ঘ বাক্যবিন্যাস, শব্দশ্লেষ ও ব্যকরণ ঘটিত দুরূহ বড় বড় সমাসবদ্ধ পদপ্রয়োগ দীর্ঘবর্ণনা ও অলংকার প্রয়োগের আতিশয্য দেখা গেলেও বাণের রচনা যে বিশেষভাবে কাব্যিক গুণসমৃদ্ধ সে কথা সর্বজনস্বীকৃত। ভারতবর্ষের সমালোচকদের মতে 'গদ্যং কবীনাং নিকষং ভবন্তি' অর্থাৎ গদ্য রচনাতেই কবির রচনাশক্তির সার্থক পরীক্ষা হয়। বাণ যে এই পরীক্ষায় যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

কাদম্বরী গল্পগ্রন্থ তবে এখানে বর্ণনাবাহুল্য, নানা অলংকারের সাজসজ্জায় ভাষার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি পেলেও তার গতি মন্থর এবং 'গল্পটি তাহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্নপ্রায় ভাবে ছত্র বহন করিয়া চলিয়াছে'।[২] বাণভট্ট তাঁর কাহিনীর কোনো কিছু বাদ দেননি, 'কারণ কথা বড়ো সুনিপুণ, বড়ো সুশ্রাব্য; কৌশলে, মাধুর্যে, গাম্ভীর্যে ধ্বনিতে ও প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ।'—কাদম্বরী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য।

১। প্রাচীন সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ
২। ঐ — ঐ

অল্প পরিচিত কয়েকটি গদ্য রচনা

পুরুষপরীক্ষা—চতুর্দশ শতকের শেষপাদে আবির্ভূত বিদ্যাপতিরচিত। এতে চুয়াল্লিশটি গল্প আছে।

ভোজপ্রবন্ধ—ষোড়শ শতকের বল্লাল সেন রচিত। এতে রাজা ভোজের সভার পৌরাণিক কাহিনী আছে।

কথারত্নাকর—সপ্তদশ শতকের হেমবিজয়াগ্নির রচনা। এতে বিভিন্ন শ্রেণীর ২৫৮টি গল্প আছে।

তিলকমঞ্জরী—গ্রন্থটি সর্বদেবের পুত্র ধনপাল রচিত একটি গদ্যকাব্য।

লেখক হলায়ুধ পদ্মগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। সীয়ক ও ধারের রাজা বাক্‌পতির রাজসভায় তৎকালীন পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে সম্মানিত হন। জৈনধর্মবিষয়ক গল্প শুনতে ইচ্ছুক তাঁর উৎসাহদাতা রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধনপাল এই এই রোমান্সটি রচনা করেন। লেখক গল্পটিকে খণ্ডে খণ্ডে রাজাকে দেন কিন্তু এক সময়ে এই অসমাপ্ত কাহিনীর পুঁথি পুড়িয়ে ফেলেন। ধনপালের কন্যা তিলকমঞ্জুরী পিতার কাছে শুনে কাহিনীটি মুখস্থ করে ফেলেছিল এবং পুঁথি নষ্ট হয়ে গেলে মুখে মুখে কাহিনীটি বলে; সেইজন্য ধনপাল গ্রন্থটির মেয়ের নামে তিলকমঞ্জরী নামকরণ করেন।

তিলকমঞ্জরী ও সমরকেতুর প্রণয়কাহিনী এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। কাহিনীটি বাণভট্টের কাদম্বরীর প্রতিবিম্ব বলা চলে। ধনপাল বাণভট্টের কাদম্বরীর আদর্শে অনুপ্রাণিত

হয়ে কাহিনীটি রচনা করেন। তিনি গ্রন্থারম্ভে বাণ, ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি ব্যক্তির গুণগান করেছেন।

গল্পসাহিত্য

সংস্কৃত ছোটগল্পগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়,—জনপ্রিয় গল্প, পশুপক্ষীর গল্প ও পরীর গল্প।

জনপ্রিয় গল্প

কালিদাসের পূর্বযুগে বৌদ্ধসম্প্রদায় রচিত অবদান গ্রন্থগুলি—ধর্মোপদেশমূলক গল্পের সঙ্কলন। গল্প সাহিত্যের মধ্যে এইগুলিই সম্ভবত প্রাচীনতম। এই রচনাগুলিতে গদ্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে পদ্য মিশ্রিত আছে। বৌদ্ধদের রচিত জাতক গুলিকেও প্রাচীন গল্প গ্রন্থের নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। জাতকগুলি পালিভাষায় লিখিত। এছাড়া বৌদ্ধদেব রচিত সংস্কৃত ধর্মমূলক গল্পও অনেক আছে। তবে এই সব রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য গল্প শোনান নয়, গল্পের মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রচারই প্রধান লক্ষ্য। তাই এগুলির গল্প হিসাবে আবেদন কম। এগুলির আলোচনা প্রথম খণ্ডে আছে।

জনপ্রিয় গল্পগ্রন্থের মধ্যে গুণাঢ্যরচিত বৃহৎকথা অতি প্রাচীন এবং এটি বৌদ্ধগণের রচনা নয়। এটি পৈশাচী প্রাকৃতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে লিখিত বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গেছে।

তবে এর গল্পগুলি তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। যেমন, (১) অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে রচিত **বুদ্ধস্বামীর শ্লোকসংগ্রহ** (২) ১০৩৭ খৃষ্টাব্দে রচিত ক্ষেমেন্দ্রের **বৃহৎকথা-মঞ্জরী** এবং (৩) ১০৬৩—১০৮১ খৃষ্টাব্দে রচিত **সোমদেবের কথাসরিৎসাগর**।

সম্ভবত বুদ্ধস্বামীর শ্লোকসংগ্রহই একমাত্র বৃহৎকথার সঠিক শ্লোকানুবাদ। শ্লোক সংখ্যা ৪৫৯৩। অপর দুইটি গ্রন্থের মূল বৃহৎকথা নয়। আলংকারিক দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে বৃহৎকথার উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক কীথের মতে এটি চতুর্থ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত। সে যাই হোক, ভারতীয় গল্প সাহিত্যের ইতিহাসে বৃহৎকথার বিশেষ প্রভাব রয়েছে। কারণ পরবর্তীকালের বহু গল্পের উৎস এই গ্রন্থটি।

শ্লোকসংগ্রহে বুদ্ধস্বামী নরবাহন দত্তের দুঃসাহসিক কার্য্য-কলাপের বর্ণনা করেছেন বিশেষভাবে। কাহিনী বর্ণনায় তিনি যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

কথাসরিৎসাগরে সোমদেব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় নানা ধরনের, নানা রসের অনেক গল্প পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থটির শ্লোক সংখ্যা—২১৩৮৮।

ক্ষেমেন্দ্র তাঁর যৌবনে রামায়ণ ও মহাভারতের মঞ্জরীর আদর্শে বৃহৎকথামঞ্জরী রচনা করেন। গ্রন্থটি আটটি লম্বকে বিভক্ত। গ্রন্থটির প্রারম্ভে গুণাঢ্য-বর্ণিত পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভ উদয়নের কাহিনী দিয়ে।

বিষ্ণুশর্মারচিত পঞ্চতন্ত্র পশুপক্ষী-বিষয়ক গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য প্রধান গ্রন্থ। অধুনা বিলুপ্ত এই গ্রন্থটির প্রাচীনতম রূপ তন্ত্রাখ্যায়িকা নামে একটি প্রাচীন গ্রন্থ বলে মনে করা হয়। পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি ভাগ,—(১) মিত্রলাভ, (২) মিত্রভেদ (৩) সন্ধিবিগ্রহ (৪) লব্ধনাশ, (৫) এবং অপরীক্ষিতকারিত্ব। গ্রন্থটির এই পাঁচটি ভাগের জন্যে নাম—পঞ্চতন্ত্র। অথচ সমস্ত ভাগের সঙ্গে একটি সাধারণ যোগসূত্র আছে। এর প্রত্যেকটি খণ্ডের মধ্যে এক একটি প্রধান গল্প আছে। আবার সেই প্রধান গল্পগুলির মধ্যে ছোট ছোট আরো অনেক গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গল্পাংশ গদ্যে বলা হয়েছে এবং মধ্যে মধ্যে নীতিবোধক শ্লোক আছে। আবার প্রত্যেকটি গল্পের শেষে সেই গল্পের বিষয় সংক্ষেপে শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

পশুপক্ষীর গল্প

গ্রন্থটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে পহ্লবী ভাষায়, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সিরিয়াক ভাষায়, অষ্টম শতাব্দীতে আরবীতে, একাদশ শতকে হিব্রুতে, ত্রয়োদশ শতকে স্পেনীয় ভাষায় এবং ষোড়শ শতকে ল্যাটিন ও ইংরাজীতে অনূদিত হয়।

পঞ্চতন্ত্রকথামুখম্ থেকে বোঝা যায় যে মূর্খ রাজকুমার-গণকে নীতিশিক্ষা দেবার জন্যে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি রচিত হয়েছিল। বর্তমান পঞ্চতন্ত্র বিষ্ণুশর্মার নামে প্রচলিত। কিন্তু মূল পঞ্চতন্ত্রের কে লেখক ও কোথায় গ্রন্থটি লিখিত সঠিক জানা যায় না।

মূল পঞ্চতন্ত্র লুপ্ত, তবে তন্ত্রাখ্যান, তন্ত্রাখ্যায়িকা বা পঞ্চতন্ত্র

নামে এর আর কয়েকটি সংস্করণ পাওয়া গেছে। এখানে যে তন্ত্রশব্দ যুক্ত আছে এর অর্থ সম্ভবত বাস্তবোপযোগী অর্থাৎ এই গ্রন্থগুলিতে যে সব আখ্যান আছে সেগুলি থেকে বাস্তব জীবনে চলার উপযোগী অমূল্য উপদেশ লাভ করা যায়।

পঞ্চতন্ত্রের সর্বশেষ সংস্করণ 'হিতোপদেশ' নারায়ণ পণ্ডিত রচিত। নারায়ণ পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার লিখনশৈলী অনুসরণ করেছেন। এই গ্রন্থে পঞ্চতন্ত্রের চারটি ভাগ মাত্র আছে। তাছাড়া এখানে কাহিনীগুলিকে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত ও কোথাও পরিবর্দ্ধিত, পরিমার্জ্জিত করা হয়েছে। লেখক নীতিসার

হিতোপদেশ

থেকে অনেক নীতিমূলক অংশ এখানে সংযোজন করেছেন। রাজা ধবলচন্দ্র লেখকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে লেখা এই গ্রন্থটির একটি পুঁথি পাওয়া গেছে। তাতে মনে হয় লেখক ঐসময়ের পূর্বে আবির্ভূত। অধ্যাপক কীথের মতে তাঁর সময় একাদশ শতাব্দীর পরে নয়। হিতোপদেশের ভাষা সহজ, সরল এবং গল্পগুলিও বর্ণনাগুণে চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক। হিতোপদেশের বহু শ্লোক লেখকের নিজের রচনা।

কথাকৌতুক—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখক শ্রীবরের লেখা একটি পশুপাখীর কাহিনীমূলক গল্পগ্রন্থ।

পরীর গল্পশ্রেণীর মধ্যে পড়ে এমন তিনটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে। যেমন (১) শিবদাসের নামে প্রচলিত

পরীর গল্প

বেতালপঞ্চবিংশতি, সম্ভবত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের লেখা—(২) **'সিংহাসনদ্বাত্রিংশতিকা** ও (৩) **শুকসপ্ততি**।

শেষেরটির লেখক ও সময়ের নাম জানা যায় নি। এটি সত্তরটি গল্পের সঙ্কলন। গল্পের বক্তা শুক। সিংহাসন-দ্বাত্রিংশতিকার অন্য নাম বিক্রমার্কচরিত। এখানে বত্রিশটি গল্প আছে। ভোজরাজ একসময় মাটির নিচের থেকে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন লাভ করেন। তিনি এই সিংহাসনে উপবেশনের চেষ্টা করলে যে বত্রিশটি পুতুলের মাথায় সিংহাসনটি বসান ছিল তারা একে একে বিক্রমাদিত্যের প্রশংসা করে এক একটি গল্প বলে। এইরূপ বলার উদ্দেশ্য যে যদি কেউ বিক্রমাদিত্যের মত এই রকম গুণবান হন, তিনি সিংহাসনে বসার অধিকারী। গল্পগুলি অত্যধিক পরিমাণে নীতি উপদেশে পূর্ণ হওয়ার জন্য সুখপাঠ্য নয়।

বেতাল পঞ্চবিংশতি

বেতালপঞ্চবিংশতি পঁচিশটি গল্পের সঙ্কলন। এইগুলি মূলগল্পের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ,—বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী বিক্রমসেন নামে এক রাজাকে একটি তপস্বী রোজ একটি করে ফল দিতেন। তার মধ্যে একটি মূল্যবান রত্ন লুকানো থাকত। এঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য একসময়ে রাজা নিকটবর্ত্তী একটি গাছে ঝোলানো একটি শবদেহ আনতে গেলে এর রক্ষক এক বেতাল রাজাকে জানায় যে তিনি যদি তাঁর কয়েকটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারেন, তাহলে সে (বেতাল) শবদেহটি ছেড়ে দেবে। বেতালের সমস্ত প্রশ্নই ধাঁধাঁ। ধাঁধাঁ থাকলেও এখানকার গল্পগুলি বেশ আকর্ষণীয় ও বিচিত্র ধরনের এবং এক একটিতে বেশ হাস্যরস আছে।

শুকসপ্ততি গ্রন্থটির মূল রূপ কার রচনা জানা যায় না তবে এটি তিন রূপে পাওয়া গেছে। (১) কোনো জৈনধর্মাবলম্বী ব্যক্তির রচিত সংক্ষিপ্ত রূপ। (২) চিন্তামনি ভট্রের বর্দ্ধিত রূপ এবং (৩) দেবদত্তরচিত একটি রূপ। একটি রমণী তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতিতে অন্য পুরুষের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে সেই গৃহে পালিত এক শুকপাখি পরপর সত্তরটি গল্প বলে। এতে রমণীটির গল্প শুনতে শুনতে কৌতূহল বাড়তে থাকে এবং এর মধ্যে তাঁর স্বামী ফিরে আসে। এইভাবে শুকপাখীর সাহায্যে তাঁর প্রভু একটি অনিষ্ট থেকে রক্ষা পান।

শুকসপ্ততি

গল্পগুলি বেশ আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক। বর্দ্ধিত গ্রন্থটির রচয়িতা চিন্তামনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর আগের লোক নন বলে মনে করা হয়।

বেতালপঞ্চবিংশতি ও শুকসপ্ততি গ্রন্থ দুটি সংস্কৃত গদ্যে রচিত ছোটগল্প ও লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

ঐতিহাসিক সাহিত্য

কাব্য, নাটক, গল্প, দর্শন, ধর্ম, ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, আইন, আয়ুর্বেদ, তন্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর রচনায় সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধ কিন্তু দুঃখের বিষয় সংস্কৃতে ঐতিহাসিক রচনা অত্যন্ত কম।

ইতিহাস রচনার প্রেরণা আসে জাতীয়তা বোধ থেকে।

প্রাচীন ভারতে সেই জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হওয়ার অনুকূল পরিবেশ ছিল না। সারা ভারত খণ্ড খণ্ড রাজ্যে ছিল বিভক্ত আর তাদের মধ্যে ছিল পরস্পর বিরোধ। খণ্ড রাজ্যগুলিকে একত্রিত করার মত কোন কেন্দ্রিয় শক্তি গড়ে ওঠে নি, যার প্রতি আনুগত্যের ফলে একটি অখণ্ড জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হতে পারে। অপর কারণ ভারতবাসীর বিশেষ ধরনের মানসিক সংগঠন। এদেশের ধর্ম, দর্শন ভারতবাসীকে পরলোকমুখী করে তুলেছে। অদৃষ্ট ও কর্ম্মফলের ওপর অত্যধিক বিশ্বাস ভারতবাসীর জাতীয় চেতনা উদ্বোধনে বাধা দিয়েছে। বেদের সময় থেকে আরম্ভ করে ভারত শুনে আসছে, সংসার দুঃখময়, একে ত্যাগ করে পরলোকে শান্তি লাভের জন্য কাজ কর, প্রস্তুত হও। সংসারভোগের আকর্ষণ ত্যাগ কর, ত্যাগেই শান্তি পাওয়া যায়, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, —নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্—এই সব উপদেশ উপনিষদ, দর্শন, বিভিন্ন ধর্মমত ও ভারতের মহাপুরুষগণ সব সময় ভারত-বাসীকে শুনিয়ে আসছেন। এর ফলে ভারতবাসীর মন হয়ে উঠেছে সংসারে বৈরাগী। তাই তারা ইহ জগতের কোনো কিছুকে ধরে রাখার চেষ্টা করে নি। নিজেদের পরিচয় নাম পর্যন্ত অনেক সংস্কৃত লেখক রেখে যান নি, তা অন্যের সম্বন্ধে আর তাঁরা কি বলবেন।

তাই বলে যে ভারতীয় সাহিত্যে কোনো ঐতিহাসিক তথ্যই নেই একথা বলা যায় না, তবে যা আছে তা অত্যন্ত অল্প এবং বিক্ষিপ্ত। ঐতিহাসিক চেতনা বলতে যা বোঝায় সেই জিনিস

সংস্কৃত লেখকদের মধ্যে খুবই কম ছিল। পুরোপুরি ধারাবাহিক তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস রচিত না হলেও অতি প্রাচীন যুগের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেক বিস্মৃত ঐতিহাসিক ঘটনার ও ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পুরাণের যে লক্ষণ বলা হয়েছে, তাতে রাজবংশের পরিচয় ও তাদের বংশধরদের তালিকা দেওয়াও পুরাণের একটি কাজ। সেই দিক দিয়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় পুরাণ অত্যন্ত মূল্যবান। দুইটি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে অতিরঞ্জনের আধিক্যে সত্য ঘটনা চাপা পড়লেও নিপুণ অনুসন্ধানে এখানে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

ভারতে বহু দার্শনিক ও ধর্মমত আছে কিন্তু কোনো প্রাচীন লেখক এগুলির কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস লেখেননি, বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত ভাবে অনেক দার্শনিক বা তাদের মতবাদ উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র অথচ তাঁদের সময় বা পরিচয় সঠিকভাবে পাওয়া যায় না

হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধদের ঐতিহাসিক তথ্য রক্ষা করার কিছু প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধদেবের পৌরাণিক কাহিনী সংরক্ষণে তাঁদের প্রযত্নের স্বাক্ষর পঞ্চম শতাব্দীর মহানামনের মহাবংশ গ্রন্থ। তবে এটিকেও পুরোপুরি ইতিহাস বলা যায় না। জৈনদের মধ্যেও কিছু ঐতিহাসিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। এদের পট্টাবলী প্রধান ধর্মযাজকদের তালিকা রক্ষা করে মাত্র, এগুলিও সত্যিকারের ইতিহাস নয়। বৌদ্ধ ও জৈনদের এই সমস্ত গ্রন্থে কিছু ঐতিহাসিক বিষয় থাকলেও

এতে ইতিহাসের চেয়ে ধর্মপ্রচারের দিকে লক্ষ্য দেখা যায়। ধর্মের সঙ্গে তথ্য মিশ্রিত হওয়ায় ফলে কোন্‌টি তথ্য বুঝে ওঠা কঠিন।

বরং ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়ে লিপিগুলির বিশেষ মূল্য আছে। প্রস্তরে, তাম্রফলকে বা পোড়ামাটিতে উৎকীর্ণ লিপিগুলি অজ্ঞাত যুগের অনেক মূল্যব্যন তথ্য জানিয়ে দেয়। সাহিত্যের মধ্যে যেগুলির একটু ঐতিহাসিক মূল্য আছে সেগুলির নাম ও পরিচিতি নিচে দেওয়া হল।

হর্ষচরিত—ইতিহাসাশ্রয়ী কাব্যগুণসমৃদ্ধ সংস্কৃত গদ্য রচনা। লেখক বাণভট্ট। গ্রন্থটির নামেই বোঝা যায় যে লেখক তাঁর সহায়ক মহারাজ হর্ষবর্ধনের জীবনী রচনা করার চেষ্টা করেছেন এই গ্রন্থে। এখানে রাজস্তুতির অতিরঞ্জনে রাজার জীবনেতিহাস আচ্ছন্ন। অনেক ঐতিহাসিক তথ্য অস্পষ্ট বিভ্রান্তিকরভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

গৌড়বহ বাক্‌পতিরাজের একটি প্রাকৃত বচনা। এখানকার ঐতিহাসিকতা অনেকটা তথ্যানুসারী। কনৌজের রাজা যশোবর্মনের দ্বারা গৌড়ের রাজার পরাজয় বর্ণনা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। যশোবর্মনকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করেন কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য। এই কাব্যে ১২০৯টি শ্লোক। এখানে কবির ব্যক্তিগত অনেক কথা বিধৃত আছে। তবে বইটির নাম গৌড়বহ হলেও কোথাও গৌড়ের রাজার নামোল্লেখ করা হয়নি। এর রচনা সময় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

নবসাহসাঙ্কচরিত—ইতিহাসাশ্রয়ী এই কাব্যটি ১০০৫ খৃষ্টাব্দে পদ্মগুপ্ত রচনা করেন। লেখকের অন্য নাম পরিমল। ইনি মৃগাঙ্কগুপ্তের পুত্র। কাব্যটি আঠারটি সর্গে রচিত। কবি ছিলেন পরমার রাজবংশের রাজা মুঞ্জের সভাকবি। এই মুঞ্জেরই অপর নাম নবসাহসাঙ্ক। সিন্ধুরাজের সঙ্গে নাগকন্যা শশিপ্রভার পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এই কাব্যে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ :—

মৃগয়ারত রাজা গলায় সোনার শিকল লাগান এক মৃগকে বাণবিদ্ধ করেন কিন্তু এই অবস্থায় মৃগটি শশিপ্রভার কাছে উপস্থিত হয়। কারণ মৃগটি ছিল শশিপ্রভার। রাজকুমারী বাণ থেকে রাজার নাম জানতে পারেন। রাজা মৃগ অন্বেষণ করতে করতে এক সরোবর তীরে উপস্থিত হয়ে সেখানে একটি মরাল দেখতে পান। মরালটির চঞ্চুতে একটি মুক্তাহার ঝুলছিল। তাতে খোদিত ছিল শশিপ্রভার নাম। মরাল অন্বেষণরত শশিপ্রভার এক পরিচারিকার সঙ্গে রাজার দেখা হয়। তার কাছে রাজা শশিপ্রভার কথা জানতে পেরে নাগরাজ্য আক্রমণ করেন ও বজ্রাঙ্কুশকে বধ করে শশিপ্রভাকে বিবাহ করেন।

বিক্রমাঙ্কদেবচরিত—কাশ্মীরী কবি বিল্‌হণের রচনা। একাদশ শতাব্দীর প্রথমদিক কবির আবির্ভাব কাল। কাব্যটির কাহিনীর ভিত্তি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কবি দেশত্যাগ করে মথুরা, কনৌজ, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি নগর পরিভ্রমণ করেন। কল্যাণের চালুক্যবংশীয় রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য

তাঁকে বিদ্যাপতি উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। বিল্‌হণ কর্ণের রাজ্যে বাসকালে গঙ্গাধর নামে এক কবিকে কাব্য প্রতিযোগিতায় পরাজিত করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের প্রশস্তিমূলক আঠার সর্গে বিভক্ত এই কাব্যটি বচনা করে তাঁকে উপহার দেন। এই গ্রন্থটি যেমন কাব্যিক গুণসমৃদ্ধ তেমনি এতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনার বিষয় জানতে পারা যায়। কাব্যটির প্রথম দিকে চালুক্য রাজবংশের জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় আছে। রাজ্য লাভের পর বিক্রমাদিত্যের দিগ্বিজয়-কাহিনী, রাজার অগ্রজ দ্বিতীয় সোমেশ্বরের সিংহাসনচ্যুতি, চোলগণের সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের যুদ্ধ প্রভৃতি অনেক ঐতিহাসিক তথ্য এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ঐতিহাসিকতা কিছু থাকলেও বিক্রমাঙ্ক-দেবচরিতে কাব্যগুণই বেশি।

রাজতরঙ্গিণী—ঐতিহাসিক কাব্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ। কাব্যটির রচয়িতা কল্‌হণ্ ছিলেন কাশ্মীরের রাজা হর্ষের (১০৮৯ — ১১০১) মন্ত্রী। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে ইনিই একমাত্র সত্যিকারের ঐতিহাসিক দৃষ্টি সম্পন্ন কবি। পূর্ব্বে যে কয়েকটি কাব্যের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত বটে তবে তাতে কাব্যোচ্ছ্বাস ও অতিরঞ্জনের মাত্রাই বেশি। কিন্তু কল্‌হণ ঐতিহাসিক ঘটনা পরিবেশনেব উদ্দেশ্য নিয়েই রাজতরঙ্গিণী রচনা করেন এবং ঐতিহাসিকের যে নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও বিশ্লেষণশক্তির প্রয়োজন ও যেরূপ অবিকৃতভাবে তথ্য সংগ্রহ করার দরকার হয়, সেই

দক্ষতা তাঁর ছিল কিন্তু পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির রচয়িতাদের লক্ষ্য ছিল তাঁদের পৃষ্ঠপোষক রাজগণের গুণগান করায়, তাই ওগুলিতে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য থাকলেও ঠিক ইতিহাস হয়নি, প্রশস্তিকাব্যই হয়ে গেছে। সেই দিক থেকে দেখলে রাজতরঙ্গিণী একক ঐতিহাসিক কাব্য। কল্‌হণ ঐতিহাসিক সুলভ নিরপেক্ষভাবে সমসাময়িককালের কাশ্মীরের জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেছেন তাঁর কাব্যে। এর জন্য রাজতরঙ্গিণী শুধু ইতিহাস হয়েছে কাব্য হয়নি, তা বলা চলে না। কল্‌হণ একাধারে কবিপ্রতিভা ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টি— এই দুই দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন। তাই তাঁর রচিত রাজতরঙ্গিণী কাব্য ও ইতিহাসের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব সুন্দর সৃষ্টি। গ্রন্থটি রচনার পূর্বে কবি কাশ্মীরের সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য তাঁর পূর্বসুরিদের ১১টি গ্রন্থ থেকে জেনেছেন এবং নীলমতপুরাণ, ক্ষেমেন্দ্রের নৃপাবলী, ক্ষোদিত লিপি, প্রশস্তি, লোকপ্রচলিত কাহিনী প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্র থেকে তথ্য আহরণ করেছেন। কবি চরিত্র-চিত্রণে ও সেই সময়কার কাশ্মীরের রাজনৈতিক ঘটনা ও সামাজিক অবস্থার পরিবেশনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

কুমারপালচরিত—ঐতিহাসিক কাব্য হিসাবে উল্লেখ-যোগ্য। কাব্যটির রচয়িতা জৈন আচার্য্য হেমচন্দ্র। ১০৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবেই জৈনধর্মে দীক্ষিত হন পিতাকে না জানিয়ে। তিনি গুজরাটের আন্‌হিল্‌বিদের রাজা জয়সিংহ সিদ্ধরাজ ও

তাঁর পরবর্তী রাজা কুমারপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষায় তাঁর ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তিনি একজন বড় বৈয়াকরণিকও ছিলেন। কাব্যটির ২৮টি সর্গ। কুমারপালের জীবনী কাব্যের বিষয়বস্তু। এর প্রথম ২০টি সর্গ সংস্কৃতে ও শেষ আটটি সর্গ প্রাকৃতে রচিত।

অপ্রধান ঐতিহাসিক রচনা

রাজেন্দ্রকর্ণপূর—কাব্যটি কাশ্মীরের রাজা হর্ষদেবের (১০৮৯—১১০১ খ্রীঃ অঃ) প্রশস্তিমূলক। এর রচয়িতা শম্ভু নামে এক কবি।

প্রবন্ধচিন্তামণি—চতুর্দশ খৃষ্টাব্দের কবি মেরুতুঙ্গ রচিত একটি ইতিহাসাশ্রয়ী জীবনী কাব্য।

প্রবন্ধকোষ—চতুর্দশ খৃষ্টাব্দের কবি রাজশেখরের রচিত একটি ইতিহাসাশ্রয়ী কাব্য। এখানে জৈন শিক্ষক, কবি, রাজা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী আছে।

কীর্ত্তিলতা—চতুর্দশ খৃষ্টাব্দের কবি বিদ্যাপতি-রচিত একটি কাব্য।

নাট্য সাহিত্য

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রকারগণ কাব্যকে প্রধান দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—শ্রব্য ও দৃশ্য। শ্রব্য কাব্য নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখনকার আলোচ্য বিষয় দৃশ্য কাব্য। ইংরাজীতে Drama শব্দের দ্বারা যে কোনো অভিনয়োপযোগী রচনাকেই বোঝায়। কিন্তু সংস্কৃতে নাটক শব্দটির দ্বারা এক বিশেষ শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যকেই বোঝায়। Drama শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নাটক, সেজন্য নাটক শব্দের দ্বারা বাংলায় অভিনয়ের উপযোগী যে কোনো রচনাকে বোঝান হয়ে থাকে। কিন্তু সংস্কৃতে দৃশ্যকাব্য শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত। আমরা নাটক শব্দের দ্বারা এখানে দৃশ্যকাব্যের কথা বলব সাধারণভাবে। কাব্যেরই একটি ভেদ যেহেতু দৃশ্যকাব্য সেই কারণে ভারতীয় ধারণা অনুসারে অভিনয়োপযোগী রচনাতেও কাব্যগুণ থাকবে। তাই দেখা যায় ও সাহিত্যের আধুনিক বিচারের মানদণ্ডে বলতে পারা যায় যে অধিকাংশ সংস্কৃত নাটক নাট্যকাব্য। সংস্কৃত নাটকে গতি ও চরিত্র সৃষ্টির জন্য কখনো কাব্যকে খর্ব করা হয়নি। কাব্যের প্রধান্য সব সময়ই রাখা হয়েছে। এখানে একটি রসের প্রাধান্য থাকার ফলে ব্যক্তির চেয়ে আদর্শ চরিত্রসৃষ্টিই বেশি হয়েছে এবং সেই কারণে চরিত্রগুলি মৌলিক না হয়ে হয়েছে চিরাচরিত।

অলংকার গ্রন্থ 'সাহিত্যদর্পণে দৃশ্যকাব্যকে যেভাবে ভাগ

করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটি বিষয়ের এক একটি উদাহরণ সহ একটি তালিকা নিচেয় দেওয়া হ'ল।

দৃশ্যকাব্যের প্রধান দুভাগ—রূপক ও উপরূপক। রূপক দশ রকম। যথা—(১) নাটক (ভবভূতির উত্তররামচরিতম্), (২) প্রকরণ (শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম্), (৩) ভাণ (বৎসরাজের কর্পূরচরিতম্), (৪) ব্যায়োগ (ভাসের মধ্যম ব্যায়োগ), (৫) সমবকার (বৎসরাজের সমুদ্রমন্থন), (৬) ডিম (বৎস রাজের ত্রিপুরদাহ), (৭) ঈহামৃগ (ভাসের প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ), (৮) অঙ্ক (ভাসের উরুভঙ্গ), (৯) বীথি (মালবিকা) (১০) প্রহসন (মহেন্দ্রবিক্রম বর্মণের মত্তবিলাস)।

উপরূপক আঠারটি। যেমন—(১) নাটিকা (শ্রীহর্ষের রত্নাবলী), (২) ত্রোটক (কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়), (৩) গোষ্ঠী (রৈবত মদনিকা), (৪) সট্টক (রাজশেখরের কর্পূর মঞ্জরী), (৫) নাট্যরাসক (বিলাসবতী), (৬) প্রস্থান (শৃঙ্গার তিলক), (৭) উল্লাপ্য (দেবী মহাদেব), (৮) কাব্য (যাদবোদয়), (৯) প্রেঙ্খণ (বালিবধ), (১০) রাসক (মেনকাহিত), (১১) সংলাপক (মায়া কাপালিক), (১২) শ্রীগদিত (ক্রীড়ারসাতল), (১৩) শিল্পক (কনকাবতী মাধব), (১৪) বিলাসিকা (সাহিত্য দর্পণে উল্লেখ নেই), (১৫) দুর্মল্লিকা (বিন্দুমতী), (১৬) প্রকরণিকা (সাহিত্যদর্পণে উল্লেখ নেই), (১৭) হল্লিশ (কালিরৈবতক), (১৮) ভাণিকা (কামদত্তা)।

সংস্কৃত নাটকে চরিত্র সৃষ্টির চেয়ে রস পরিস্ফুটনেরই প্রাধান্য। তবে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি নাটকে

সার্থক চরিত্র সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাস, বিশাখদত্ত ও শূদ্রক চরিত্র-চিত্রণে যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। সংস্কৃত নাট্যকারগণ শুধু যে রস সৃষ্টিতে নজর দিতেন, নাটকীয় গতিবেগ সৃষ্টির দিকে তাঁদের লক্ষ্য ছিলনা একথা বলা চলেনা। কারণ সাহিত্যদর্পণে নাটকের লক্ষণের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে 'নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধি সমন্বিতম্' অর্থাৎ নাটকের কাহিনী হবে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির প্রসিদ্ধ কাহিনী আর এখানে থাকবে পঞ্চসন্ধি—পাঁচটি জটিল সঙ্কট মুহূর্ত্ত—যথা :—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহৃতি।

সংস্কৃত নাটকের বৈশিষ্ট্য

এছাড়া নাটকে বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য্য এই পাঁচটিকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণরূপে যথাযথ প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে।[1] সংস্কৃত নাটকে কাহিনীর সঙ্গে রসের সম্পূর্ণ মিশ্রণ অবশ্য করণীয়। নাটকে নায়ক উচ্চবংশোদ্ভূত ঋষিজনোচিত, বহুগুণের আধার, ধীরোদাত্ত ও প্রতাপশালী দিব্য অথবা দিব্যাদিব্য গুণবান ব্যক্তি।[2] শৃঙ্গার বীর বা শান্ত রস এদের যে কোন একটি নাটকে প্রধান রস, অন্য রস অপ্রধান হয়ে থাকবে। এখানে পাঁচ থেকে দশটি পর্যন্ত অঙ্ক থাকবে। সংস্কৃত নাটক কখনো বিয়োগান্ত হবেনা।

১। বীজং বিন্দুঃ পতাকা চ প্রকরী কার্য্যমেব চ।
অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত্বা যোজ্যা যথাবিধি॥—সাহিত্যদর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২। নাটকলক্ষণ—সাহিত্য দর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রঙ্গমঞ্চে বধ, যুদ্ধ, রাজ্যবিপ্লব, শাপ, মৃত্যু, লজ্জাকর বা অশ্লীল কোন বিষয়ের অবতারণা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

সংস্কৃত নাটকের আরম্ভ নান্দীপাঠ দিয়ে। এর উদ্দেশ্য বিঘ্ননাশ ও শ্রোতৃগণের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা। এখানে দেবতা, নৃপতি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির স্তুতি করা হয়। নাটকের শেষেও এই রকম মঙ্গল প্রার্থনা করা হয় ভরতবাক্যে।

নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল নান্দীর পর গ্রন্থারম্ভে প্রস্তাবনা অংশ। এখানে সূত্রধার, নট বা নটীর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে নাট্যকাব্যের ও নাট্যবস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়। প্রত্যেক অংশের প্রথমে থাকে প্রবেশক বা বিষ্কম্ভক। এ ছাড়া সংস্কৃত নাটকে হাস্যোদ্দীপক চরিত্র বিদূষকের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান আছে।

সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের অনুবাদের ভিত্তিভূমিতে বাংলা নাটকাভিনয়ের সূচনা। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটকটি বাংলাভাষায় আদি মৌলিক নাটক। রামনারায়ণ এই নাটক রচনায় নান্দী, প্রস্তাবনা প্রভৃতি দিয়ে সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক রীতি অনুসরণ করলেও সংস্কৃত নাটকের মত শুভপরিণতি দেখাননি। মাইকেলে এসে বাংলা নাটকে সংস্কৃত নাটকের আদর্শচ্যুতি সম্পূর্ণ হলেও সংস্কৃত প্রভাব কিছু কিছু থেকে যায়। এরপর কালক্রমে বাংলা নাটক নিজের গতিপথে এগিয়ে চলে।

বাংলা নাটক

সংস্কৃত নাটকে বিয়োগান্ত পরিণতি না থাকলেও বিরহ-বেদনাকে মর্মস্পর্শী ভাবে রূপায়িত করা হয়েছে। এর নিদর্শন

পাই অভিজ্ঞান শকুন্তলার ষষ্ঠ অংকে শকুন্তলার স্মৃতি-জাগরিত রাজার বিলাপের মধ্যে এবং উত্তররামচরিতে তৃতীয় অঙ্কে জনস্থান অরণ্যে ভ্রমণকালে সীতার বিরহে ব্যথিতচিত্ত রামের করুণ হাহাকারের মধ্যে।

সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত নাটকেরও মূল সুর ধর্মবোধের সঙ্গে যুক্ত। নীতি ও ধর্মবিরোধী কোনো ঘটনা সংস্কৃত নাটকে অবতারণা করা হয়নি।

ধর্মভিত্তি

সংস্কৃত নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে এখানকার পাত্রপাত্রীরা নিজেদের সামাজিক মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। নাটকে রাজা, নায়ক, ব্রাহ্মণ ও সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভাষা সংস্কৃত, সমাজের নিম্নস্তরের লোক ও নারীগণের ভাষা প্রাকৃত। তবে শিক্ষিতা নারীর ভাষা সংস্কৃত। সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীগণ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাকৃত ব্যবহার করে। উচ্চশ্রেণীর নারী মহারাষ্ট্রী, শিশু ও ভাল শ্রেণীর পরিচারকগণের ভাষা শৌরসেনী, সমাজের সর্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোক, ঘৃণ্য ও বর্বর জাতি অপভ্রংশ ভাষার ব্যবহার করে। সংস্কৃত নাটকে এইরূপ নিয়ম থাকায় বোঝা যায় নাট্যকারগণের যথেষ্ট বাস্তববোধ ছিল এবং নাটক যে সমাজ ও জীবনের চিত্র হবে এ বিষয়েও তাঁরা বিশেষ সচেতন ছিলেন।

সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের বিশেষ ভূমিকা থাকে। সে হাস্যরসিক, ভোজনপ্রিয় ব্রাহ্মণ এবং রাজার বয়স্য। সে

তার শারীরিক বিকৃতি, অঙ্গভঙ্গি ও বোকার মত উক্তির দ্বারা যে হাস্যরস সৃষ্টি করে, তা উচ্চশ্রেণীর নয়। এরা শুধু ভাঁড়ামিই করে না, নায়ককে নাট্যকার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করে মাঝে মাঝে বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।

রূপক ও উপরূপকের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ত্রোটক শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য বেশি পাওয়া গেছে।

প্রকরণের বিষয়বস্তু কাল্পনিক কোনো বাস্তবানুগ কাহিনী। এর নায়ক ধীরপ্রশান্ত ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী বা সদাগর আর নায়িকা কুলবধূ, বেশ্যা বা অনূঢ়া তরুণী। প্রকরণের সাধারণত দশটি অঙ্ক থাকে। প্রধান রস শৃঙ্গার।

প্রকরণ

ভাণ একাঙ্ক নাট্যরচনা। 'বিট' এর একমাত্র চরিত্র। এর মূল বিষয় চতুর নায়কের ক্রিয়াকলাপ। শৃঙ্গার ও বীর রস।

ভাণ

নাটিকা-র চার অঙ্ক, কল্পিত কাহিনী, নায়ক ধীরললিত রাজা।

নাট্যরচনার উৎপত্তি

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য বা নাট্যরচনার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত। (১) সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ ভরতের নাট্যশাস্ত্র। এর আনুমানিক সময় খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক। এই গ্রন্থে নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক

কাহিনী আছে। ব্রহ্মা ঋগ্বেদ থেকে আবৃত্তির জন্য বাক্য, সাম থেকে সঙ্গীত, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় ও অথর্ববেদ থেকে রস নিয়ে নাটক সৃষ্টি করেন। সেজন্য নাটককে বলা হয় পঞ্চমবেদ। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা এক রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করেন। নাটকের জন্য শিব ও পার্বতীর কাছ থেকে যথাক্রমে তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্য এবং বিষ্ণুর কাছ থেকে নেওয়া হয় রীতি। তারপর ভরতের পুত্র ও শিষ্যগণ গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সহযোগিতায় ইন্দ্রধ্বজ উৎসবের সময় নাটকাভিনয় করে। সর্বপ্রথমে 'অমৃতমন্থন' ও ত্রিপুরদাহ' নামে ব্রহ্মার রচিত দুটি নাটকের অভিনয় হয়।

নাট্যশাস্ত্র

(২) অনেকে নাট্যরচনার উৎপত্তির বীজ স্মরণাতীত কালের রচনা বৈদিক সূক্তের মধ্যে নিহিত আছে বলে মনে করেন। ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তগুলিই নাট্যরচনার আদিম বা প্রাচীনতম রূপ। এরকম সংবাদসূক্ত সংখ্যায় প্রায় কুড়িটি। এদের মধ্যে যম-যমী, পুরূরবা-উর্ব্বশী, পণি-সরমা প্রভৃতি সূক্তগুলি কথোপকথনাত্মক বলে অনেকে মনে করেন এইগুলিই নাট্যসাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ। অধ্যাপক কীথ এই মতে বিশ্বাসী। Hartel কীথের মত মেনে নিয়ে আরও বেশি উৎসাহের সঙ্গে বলেছেন যে সুপর্ণাধ্যায় নামে পরবর্ত্তী কালের একটি বৈদিক রচনা সম্পূর্ণ নাটকের প্রাচীনতম নিদর্শন।

বৈদিক সূক্ত

(৩) বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান-পদ্ধতির মধ্যে কিছু

নাটকীয় আচরণ দেখা যায়। এইগুলি নাটকের বীজ বলে অধ্যাপক কীথ মনে করেন।[১] সোমযাগে সোম-ক্রেতা সোম-বিক্রেতাকে দাম না দিয়ে প্রহার করত। এই রকম প্রহার করা যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হত। মহাব্রত নামক ব্রতানুষ্ঠানের ভেতরও কিছু কিছু নাটকীয়তা দেখা যায়। যজুর্বেদে সমস্ত বৃত্তি-জীবীরই উল্লেখ আছে। কিন্তু অভিনেতা অর্থের বোধক 'নট' শব্দের উল্লেখ নেই। তবে সেখানে উল্লিখিত শৈলূষ শব্দটি অভিনেতা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়। বেদে 'নট' শব্দটি কোথাও নেই।

বেদের কর্মকাণ্ড

মহাভারতে 'নট' শব্দ পাওয়া গেলেও ঐ শব্দটি যে অভিনেতা অর্থে ব্যবহৃত তা বোঝা যায় না। তবে সম্পূর্ণ মহাভারত সূত ও তার শিষ্যগণের কথোপ-কথনের আকারে রচিত। শুধু তাই নয়, মহাভারতে যে মাঝে মাঝে যুধিষ্ঠির ঃ উবাচ, দ্রৌপদী উবাচ, বৈশম্পায়নঃ উবাচ প্রভৃতি আকারে বিভিন্ন বক্তার উল্লেখ আছে—এই পদ্ধতির মধ্যে নাটকের সূত্র পাওয়া যায়।

রামায়ণ ও মহাভারত

মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের মধ্যে দেখা যায় যে এক শ্রেণীর লোক রামায়ণের কাহিনীকে নাটকে রূপায়িত করেছিল। প্রাচীনকাল থেকেই মহাভারত-আবৃত্তি প্রচলিত ছিল জানা যায়। বাণভট্ট কাদম্বরীতে মহাভারত আবৃত্তির বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাল্মীকি রামের পুত্র কুশ ও লবকে রামায়ণ কাব্য শিখিয়েছিলেন এবং অযোধ্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়

রাম তাদের কাছে নিজের কাহিনী আবৃত্তি শুনে তাদের নিজের পুত্র বলে চিনতে পারেন। এই সমস্ত ঘটনা নাট্যবোধের পরিচায়ক।

Ridgewayর মত

(৪) Ridgewayর মতানুসারে মৃত পূর্ব-পুরুষগণের পূজানুষ্ঠান পরবর্তীকালের নাট্য রচনার উৎস। কিন্তু এ মত সমর্থিত হয়নি।

(৫) Pischel মনে করেন ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত পুতুলনাচই নাট্যরচনার উৎস। সংস্কৃত

Pischel এর মত
পুতুল নাচ

সাহিত্যে অনেক জায়গায় পুতুলের উল্লেখ আছে। পুতুলগুলিকে নাচান চালান এমনকি কথা বলান হত। সীতারূপে কথা বলা— এই ধরনের একটি পুতুলের নিদর্শন পাওয়া যায় রাজশেখরের একটি নাট্যরচনার মধ্যে। ছায়া-নাটকের আভাস পাওয়া যায় ভবভূতি-রচিত উত্তররামচরিতের ছায়া-সীতায়। নাটকের সূত্রধার ও স্থাপকের কাজ নাট্য-কাহিনীর যথাযথ অংশে চরিত্রগুলি স্থাপন করান। এই সমস্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করে এরকম মতবাদের সৃষ্টি। কিন্তু এই মত খণ্ডিত হয়েছে।

বসন্তোৎসব

(৬) কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে ইন্দ্রধ্বজ উৎসব নামে বসন্তোৎসব নাটকের উৎপত্তির উৎস। এমতও স্বীকৃতি পায়নি।

---

১ ...The vedic ritual contained within itself the germs of drama.

—Sanskrit Drama. Keith.

অনেকের মতে কৃষ্ণপূজা ভারতে নাট্যরচনার প্রেরণা এবং নাট্যরচনার বিকাশে রাম কাহিনীর প্রভাবও কম নয়। এমন কি নাট্যরচনার প্রসারে শিবপূজাও জড়িত। কিন্তু এ সমস্ত মত স্বীকৃতি লাভ করেনি। ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে নাট্যরচনার উৎপত্তি জড়িত নয় বলেই মনে করা হয়। Hille-brandetএর মতে মানুষের অন্তর্নিহিত রসচেতনা ও আনন্দের প্রেরণা থেকেই দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টি।

কৃষ্ণপূজা

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য গ্রীক প্রভাবিত বলে প্রথমে Weber মত প্রকাশ করেন এবং এই মতের প্রধান সমর্থক অধ্যাপক Windisch. তাঁর মতে সংস্কৃত ও গ্রীক নাট্যরচনার মধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য দেখা যায়। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর অনেকদিন ধরে গ্রীকগণ এদেশে বাস করে। এই সময় গ্রীক শিল্প সাহিত্যের প্রভাব ভারতের ওপর এসে পড়ে। এই যুগে গ্রীক নাটকাভিনয়ের আদর্শে ভারতে ধীরে ধীরে নাট্যসাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকে। এ সম্বন্ধে প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে সংস্কৃতনাটকে দৃষ্ট যবনী ও যবনিকা শব্দ দুটি গ্রীক থেকে আগত। সংস্কৃতনাটকে অনেক জায়গায় বিশেষ ভাবে অভিজ্ঞান শকুন্তলায় দেখা যায় রাজা যবনী-পরিবৃত অবস্থায় চিত্রিত। এই মতের সমর্থকগণ যবনী শব্দে গ্রীক রমণীই মনে করেছিলেন। কারণ ভারতের রাজারা গ্রীক সুন্দরী পছন্দ করতেন এবং গ্রীক বণিকগণ ব্যবসায়ে সুবিধা লাভের জন্য ভারতবর্ষের রাজাদের গ্রীক সুন্দরী উপহার দিতেন।

গ্রীক প্রভাব

সংস্কৃত নাটকে অঙ্কবিভাগ, প্রস্তাবনা, ভরতবাক্য, অভিনেতাদের প্রবেশ ও প্রস্থান পদ্ধতি, যবনিকা, নাট্যবিষয়, বিভিন্ন রকমের মঞ্চনির্দেশ, বিদূষক, প্রতিনায়ক প্রভৃতি চরিত্রের অবস্থিতি গ্রীক নাটকের প্রভাবজাত বলে তাঁরা মনে করেন। দাক্ষিণাত্যে সীতাবেঙ্গা গুহায় গ্রীক রঙ্গমঞ্চের মত ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ আবিষ্কার হওয়ার পর এই মতের সমর্থকগণ আরো উৎসাহ লাভ করেন। তাছাড়া স্মারক চিহ্ন ব্যবহারে গ্রীক নাটকের সঙ্গে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের সাদৃশ্য দেখা যায়।

সাদৃশ্য

কিন্তু সংস্কৃত নাট্যরচনার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ও গ্রীক নাটকের সঙ্গে অনেক বৈসাদৃশ্য থাকায় এই মত খণ্ডিত হয়েছে। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে গ্রীক নাটকের স্থান কাল ও কার্যের ঐক্য মানা হয়নি। যেমন উত্তররামচরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় অংকের ঘটনার মধ্যে বার বছরের ব্যবধান। অভিজ্ঞান শকুন্তলাতেও ষষ্ঠ অংক ও সপ্তম অংকের মধ্যে স্থান ও কাল উভয়ের বহু ব্যবধান। শকুন্তলার ষষ্ঠ অংকে মর্ত্যের রাজা দুষ্মন্তের প্রাসাদের চিত্র আর সপ্তম অংকে দীর্ঘকাল ব্যবধানের পর হেমকূট নামে কিম্পুরুষ পর্বতে মারীচের আশ্রমের দৃশ্য। সংস্কৃত নাটকে দৃষ্ট যবনী ও যবনিকা শব্দ দুটি পণ্ডিতগণ পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। তাছাড়া যবনিকা শব্দে পারস্য দেশীয় চিত্রিত পরদাকে বোঝায়।

গ্রীকপ্রভাব খণ্ডিত

পরিশেষে একথা বলা যেতে পারে যে গ্রীকগণ এদেশে

বহুদিন বাস করার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রীক সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ ·যোগ স্থাপিত হয়। তাতে পরস্পরের কাছে উভয়ের সভ্যতার কিছু গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক। এ কথাও ঠিক যে প্রত্যেক সভ্যতার নিজস্ব মৌলিক রূপ থাকে। সে অপরের কাছ থেকে কিছু নিলে তা নিজের আদর্শমত গড়ে নেয়, তাকে অনুকরণ বলা চলে না। ভারত যদি নাট্যসাহিত্যে গ্রীসের কাছ থেকে কিছু নিয়ে থাকে, তা তার নিজের মত করেই গড়ে নিয়েছে। একে স্বকরণ বলা হয়। ঋণ বললে বেশি বলা হয়। সমস্ত সভ্যতারই এই ধর্ম।

আমরা বৈদিক যুগ থেকে নাট্য রচনা জাতীয় রচনার কিছু কিছু আভাস ইঙ্গিত পেয়েছি। সমস্ত দেশেই শিল্প সাহিত্যের সৃষ্টি হয় সেই জাতির অন্তর্নিহিত রসচেতনা, আনন্দপ্রেরণা থেকে এবং সেই সঙ্গে এর সহায়ক হন রাজা ও অভিজাত-সম্প্রদায়। এদেশেও তাই ঘটেছে। এই কারণে আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি ভারতে দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে ভারত মানসের রসচেতনা ও রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীন ভাবে, পরবর্ত্তীকালে নাট্যসাহিত্যের অগ্রগতির পথে অন্য সাহিত্য থেকে কিছু প্রেরণা এলেও এসে থাকতে পারে, সেজন্য ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ভারতের মাটিতে স্বাধীন উৎপত্তির সিদ্ধান্ত কোনোরূপে ব্যাহত হয় না।

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টির অনেক পরবর্ত্তীকালের ইংরাজী সাহিত্যে এলিজাবেথীয় যুগের—বিশেষভাবে শেক্সপীয়রের নাটকাবলীর সঙ্গে সংস্কৃত নাট্যরচনার অদ্ভুতধরণের সাদৃশ্য দেখা

ইংরাজি নাটকের সাদৃশ্য

যায়। আঙ্গিকের দিক থেকে উভয় শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য অঙ্কে বিভক্ত, উভয় ক্ষেত্রে স্থান ও কালের ঐক্য মানা হয়নি। উভয়ের কাহিনী প্রণয়ভিত্তিক বা উপকথামূলক। দুই স্থলেই গদ্য ও পদ্যের একত্র ব্যবহার। গাম্ভীর্যপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে হাস্যরসের মিশ্রণ দেখা যায়। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের বিদূষক শেক্সপীয়রের নাটকের clownএর সমধর্মী। এ ছাড়া চিঠিলেখা, মূল নাটকের মধ্যে গর্ভনাট্য, মৃতের পুনর্জীবন লাভ প্রভৃতি একই ধরনের বিষয় উভয় সাহিত্যের নাট্যরচনায় দেখা যায়। এক্ষেত্রে একথাতো কোনো ক্রমেই বলা চলে না যে এক সাহিত্য অন্যের কাছে ঋণী। উভয়ক্ষেত্রে নাট্যসাহিত্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই গড়ে উঠেছে।

নাট্য-সাহিত্যের ক্রমবিবর্ত্তন

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য বা নাট্যরচনার উৎস ও উৎপত্তি বিষয়ে পূর্ব্বে যে আলোচনা করা হল তাতে সঠিক কোন সময়ে সম্পূর্ণ দৃশ্যকাব্য সৃষ্টি হয়েছে বোঝা গেল না। শুধু তার উৎপত্তির সূত্রটুকু জানা গেছে।

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতকে আবির্ভূত পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী ব্যকরণে নটসূত্রের উল্লেখ করেছেন এবং খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের রচনা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কুশীলব শব্দটি পাওয়া যায়। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) কংসবধ ও বলিবন্ধ নামে দুটি দৃশ্য কাব্যের নাম উল্লেখ করেছেন। রামায়ণে নাটক

শব্দটি পাওয়া যায় আর মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশে কৃষ্ণের বংশধরগণের অভিনীত সম্পূর্ণাঙ্গ নাটকের উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত যে সমস্ত দৃশ্যকাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে প্রাচীনতম অশ্বঘোষের 'শারিপুত্তপ্রকরণ'। ভাসের নাটকগুলি এর সমসাময়িক কালের বলে মনে করা হয়। অশ্বঘোষ, ভাস ও কালিদাসের জীবন ও রচনা বিষয়ে বিস্তৃতভাবে পূর্বে পৃথক আলোচনা করা হয়েছে। এখন শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক থেকে আলোচনার আরম্ভ।

মৃচ্ছকটিক—দৃশ্যকাব্যটির রচয়িতা হিসাবে শূদ্রকের অধিকার। কিন্তু তাঁর আবির্ভাবকাল নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। কারও কারও মতে এই নাটকটির রচয়িতা দণ্ডী এবং তিনি তাঁর কাব্যাদর্শে এই গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ভাসের নাট্যরচনাগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেখা যায় যে ভাসের চারুদত্ত ও বালচরিতে ঐ শ্লোকটি আছে। এজন্য মনে করা হয় যে চারুদত্ত রচিত হওয়ার পর খৃষ্টীয় প্রথম শতকের কাছাকাছি সময়ে মৃচ্ছকটিক রচিত।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত যে কালিদাস ভাস, সৌমিল্ল ও কবিপুত্রের নামোল্লেখ করেছেন কিন্তু শূদ্রকের কথা কোথাও বলেননি। অধ্যাপক কীথ শূদ্রক কালিদাসের আগে না পরে আবির্ভূত, কিছু ঠিক ক'রে বলেননি। আমরা ডাঃ সুশীলকুমার দের অনুসরণে শূদ্রকের নাম কালিদাসের পর দিলাম।

মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবনা থেকে নাট্যকার রাজা শূদ্রকের

জীবনের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তিনি অশ্মক দেশবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঋগ্বেদ, সামবেদ, অঙ্কশাস্ত্র, গণিকাগণের কৌশল বিষয়ে ও হস্তী বিদ্যায় তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং এর পরিচয় তিনি গ্রন্থের মধ্যেই রেখে গেছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের পর পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে তিনি একশ বছর দশদিনে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। মৃচ্ছকটিকের প্রারম্ভের এই লেখাটি দেখে বোঝা যায়, হয় এটি প্রক্ষিপ্ত অংশ অথবা এই গ্রন্থের রচয়িতা অপর কোনো ব্যক্তি। কথাসরিৎসাগর, রাজতরঙ্গিণী, স্কন্ধ পুরাণ, কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থে শূদ্রকের নাম ও তাঁর ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়। বীরচরিতে উল্লিখিত একটি কিম্বদন্তীতে বলা হয়েছে—প্রথমে শূদ্রক সাতবাহনের মন্ত্রী ছিলেন। পরে তিনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজ্য লাভ করেন রাজার কাছ থেকে।

শূদ্রকের জীবনী

Sten Konowর মতে আভীর রাজকুমার (২৫০ খৃষ্টাব্দ) শিবদত্তই শূদ্রক। ডাঃ ফ্লীট মনে করেন যে শূদ্রকের পুত্র অন্ধ্রগণকে পরাজিত করে ২৪৮–৪৯ খৃষ্টাব্দে চেদি সম্বৎ প্রচলন করেন।

শূদ্রক সম্বন্ধে এত কাহিনী ও কিম্বদন্তী প্রচলিত যে সঠিক কোন্ ব্যক্তি যে মৃচ্ছকটিক রচয়িতা শূদ্রক, তা নির্ণয় করা যেমন কঠিন তেমনি তাঁর সময় নির্ণয় করাও দুরূহ। তাছাড়া আবার অনেকে মনে করেন শূদ্রক নামে কোনো ব্যক্তিই মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা নয়। তিনি কোনো

সময়

কাল্পনিক ব্যক্তি, কারণ তিনি লিখেছেন যে আগুনে প্রবেশ করে তিনি মৃত্যু বরণ করেন একশ বছর দশদিনে এবং এত সঠিকভাবে কারো পক্ষে মৃত্যুর সময় বলে রাখা সম্ভব নয়।

আবার কারও মতে শূদ্রক নামে কোনো রাজা তাঁর সভাপণ্ডিতের দ্বারা গ্রন্থটি রচনা করিয়ে গ্রন্থকার হিসাবে নিজের নাম যুক্ত করে দিয়েছেন।

শূদ্রকের কাল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। কারও মতে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে বা প্রথম শতকে শূদ্রকের আবির্ভাব হয়। আবার কেউ তাঁকে খৃষ্টীয় প্রথম শতক পর্যন্ত নিয়ে যান।

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে মৃচ্ছকটিকের প্রথম চারটি অঙ্ক ভাসের চারুদত্তের কিছু পরিবর্ত্তিত সংস্করণ।[১] আবার কেউ বলেন চারুদত্ত মৃচ্ছটিকের সংক্ষিপ্ত রূপ। সে যাই হোক মৃচ্ছকটিক নাটকটি (প্রকরণ) সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের চিরাচরিত ধারানুযায়ী নয়, সম্পূর্ণভাবে মৌলিক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে একক। প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে রাজনৈতিক চক্রান্তের মিশ্রণে এরকম অপূর্ব গতিবান নাট্যকাহিনী সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে আর নেই। এর দশটি অঙ্ক। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

---

১. The first four acts of the play are a reproduction with slight changes of the Chaudutta of Bhasa.—Sanskrit Drama. Keith.

চারুদত্ত নামে উজ্জয়িনীবাসী একজন বিত্তবান ব্রাহ্মণ বণিক দান-দাক্ষিণ্যের জন্য এক সময় দরিদ্র হয়ে পড়েন। বারাঙ্গনা বসন্তসেনা তাঁর সব গুণের কথা শুনে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়। একদিন সে রাজার শ্যালক শকারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য চারুদত্তের গৃহে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে তার কাছে অলংকার রেখে চলে আসে।

কাহিনী

এরপর আর একদিন সুযোগ পেয়ে শকার বসন্তসেনাকে নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে কিন্তু তাতে অকৃতকার্য্য হয়ে তাকে এমন আঘাত করে যে সে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে যায়। বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রণয়াসক্তা বলে চারুদত্তের ওপর শকারের আক্রোশ ছিল। সে সুযোগ পেয়ে চারুদত্তকে বসন্তসেনার হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। বিচারে চারুদত্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কিন্তু ইতিমধ্যে শকারের আঘাতে মূর্চ্ছিতা বসন্তসেনাকে সুস্থ করে তোলে এক ভিক্ষু। চারুদত্তকে বধ্যভূমিতে আনা হলে সেখানে হঠাৎ ভিক্ষুর সঙ্গে বসন্তসেনা এসে উপস্থিত হয়। চারুদত্তের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় তৎকালীন রাজা আর্যক তাঁর বিপদের বন্ধু চারুদত্তকে একটি রাজ্য দান করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুকে পুরস্কার স্বরূপ বৌদ্ধ মঠের প্রধানের পদে নিযুক্ত করা হয় এবং বসন্তসেনা চারুদত্তের পত্নীর মর্যাদা লাভ করে।

নাটকের অন্তর্গত একটি অত্যন্ত সামান্য বিষয়ের নামে

গ্রন্থটির মৃচ্ছকটিক নাম হয়েছে। মৃচ্ছকটিক শব্দের অর্থ মাটির তৈরি গাড়ি (মৃৎ+শকটিকম্)। প্রকরণটির মধ্যে এক জায়গায় আছে চারুদত্তের পুত্র সোনার গাড়ি না পেয়ে মাটির গাড়ি পাওয়ার জন্য কাঁদছে। এই মাটির গাড়ির নামে প্রকরণটির নাম 'মৃচ্ছকটিকম্'।

গ্রন্থটির রচয়িতা সংস্কৃত নাট্যরচনার গতানুগতিকতা বর্জন করে মানুষের জীবনকে সোজাসুজি ব্যাপক সম্পূর্ণ ও গভীর-ভাবে দেখতে চেষ্টা করেছেন। সেজন্য মৃচ্ছকটিককে সাধারণ সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের মত দেখা হয় না। এখানকার নাট্যরস আধুনিক রুচিসম্পন্ন পাঠকের মনেও গভীর আবেদন জানায়। এই প্রকরণটির সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে অন্যান্য সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের মত অভিজাত ব্যক্তি বা রাজারাণীর প্রণয় কাহিনীকে নাট্য বিষয় না করে এখানে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন রুচি ও প্রকৃতির মানুষকে নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। হীন চরিত্রের মানুষও এখানকার বিভিন্ন চরিত্র। প্রকরণটিকে তৎকালীন সমাজের একদিকের নিখুঁত চিত্র বলা যেতে পারে। এখানে আমরা সংস্কৃত নাটকের চিরাচরিত আদর্শ চরিত্রের পরিবর্তে পারিপার্শ্বিক সমাজে পরিদৃশ্যমান বিভিন্ন রুচিপ্রকৃতির মানুষের বাস্তব ব্যক্তিচরিত্র জীবন্তরূপে দেখতে পাই। লেখক শ্রব্যকাব্যকে কাব্যরসময় পরিবেশ থেকে রূঢ় বাস্তবের ঊষর ভূমিতে নিয়ে এসেছেন। এখানে আমরা সদাশয় ব্রাহ্মণ, পরোপকারী উদারহৃদয় বৌদ্ধ

সাহিত্যগুণ

সন্ন্যাসী থেকে চোর, জুয়ারী, নিচাশয়, শয়তান, লম্পট, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারী, চাটুকার, পরিচারিকা, কুটনী, গণিকা প্রভৃতি চরিত্র এক জায়গায় দেখতে পাই। নাট্যকার অতিশয় নিপুণ নাট্যশিল্পী। এখানে চিত্রিত মোট সাতাশটি চরিত্র স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। লেখক নায়ক চারুদত্ত ও নায়িকা বসন্তসেনাকে যেমন আকর্ষণীয় করে এঁকেছেন তেমনি অন্যান্য চরিত্রগুলিকেও সমান দরদ দিয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে জীবন্ত করে তুলেছেন। একজায়গায় এতগুলি চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ নাট্যরচনায় লেখকের অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়। গ্রন্থটিতে মূল কাহিনীর গতিবেগ বজায় রেখে বহু ঘটনার বিন্যাস এমন সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছে যাতে পাঠক বা দর্শকের ক্লান্তি আসে না বরং উত্তরোত্তর কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। নাট্যকারের ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল। প্রকরণটি মিলনান্ত হয়েও পাঠক বা দর্শক মানসে এর রসাবেদনের গভীরতা বিয়োগান্ত রচনার (Tragedy) মতই। মৃচ্ছকটিক-রচয়িতাই বোধ হয় সাহিত্যে সর্বপ্রথম সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে স্থান দিয়েছেন এবং তা যদি সত্য হয় তাহলে মৃচ্ছকটিককে গণনাট্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যেতে পারে।

মৃচ্ছকটিকের অনুরূপ পরিবেশ ও ভাব অবলম্বনে রচিত 'চতুর্ভাণী' নামে পরিচিত চারটি ভাণ এক একজনের স্বগতোক্তিমূলক এক জাতীয় একাঙ্কিক নাট্যরচনা ১৯২২ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে একটি 'পদ্মপ্রাভৃতক' শূদ্রকের রচিত

বলা হয়েছে। উভয়াভিসারিকা, ধূর্ত্তবিটসংবাদ, পাদতাড়িতক —অন্য এই তিনটি ভাণের লেখক যথাক্রমে বররুচি, ঈশ্বরদত্ত এবং শ্যামলিক। এই চারজন ভাণ রচয়িতার প্রশংসা করা হয়েছে একটি শ্লোকে।[১]

এই ভাণ চারটিকে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পরবর্ত্তী ও ধনঞ্জয়ের দশরূপকের অগ্রবর্ত্তী বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।[২] অর্থাৎ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে এগুলি রচিত হয়েছে।

চতুর্ভাণী

এদের প্রত্যেকটির দৃশ্য অবতারণা করা হয়েছে রাজধানী উজ্জয়িনী বা কুসুমপুরে।

সমস্ত বড় বড় নগরনগরীতে পরিদৃশ্যমান এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জীবন, তাদের গ্লানিকর ক্রিয়াকর্মের চিত্র এই নাট্যরচনাগুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই ভাণ গুলিতে যথেষ্ট হাস্যরস ও ব্যঙ্গের সাক্ষাৎ মেলে। এখানে চিত্রিত সমাজজীবনের সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের সমাজজীবনের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষণীয়

১। বররুচিরীশ্বরদত্তঃ শ্যামলিকঃ শূদ্রকশ্চঃ চত্বারঃ।
এতে ভাণান্ বভন্নুঃ কা শক্তি কালিদাসস্য॥

2. Hist of Sanskrit Lit. Page-242—Dasgupta & S. K. De.

শ্রীহর্ষ

প্রিয়দর্শিকা, রত্নাবলী, নাগানন্দ এই তিনটি নাট্যগ্রন্থ শ্রীহর্ষের রচিত বলে প্রচলিত। শ্রীহর্ষবর্ধন শিলাদিত্য ৬০৬ থেকে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থানীশ্বর ও কনৌজে রাজত্ব করেন। বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতে তাঁর উৎসাহদাতা রাজা হর্ষবর্ধনের প্রশংসা করেছেন। এই হর্ষবর্ধনই এই তিনটি দৃশ্যকাব্যের রচয়িতা কিনা এ বিষয়ে অনেকে প্রথমে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। মম্মটের কাব্যপ্রকাশের—শ্রীহর্ষাদের্বাণাদীনামিব-ধনম্—এই উক্তি থেকে অনেক পণ্ডিত মনে করেছিলেন বাণ বা ধাবক নামে কোনো গ্রন্থকার এই নাট্যগ্রন্থগুলিকে রচনা করেন কিন্তু শ্রীহর্ষের কাছ থেকে কিছু অর্থলাভ করে নিজের নামের পরিবর্তে এগুলির লেখক হিসাবে অর্থদাতা হর্ষের নামে প্রচলিত করেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে এই গ্রন্থগুলিকে শ্রীহর্ষেরই রচনা বলে বলে মেনে নেওয়ার পক্ষে অনেক প্রমাণ্য তথ্য পাওয়া গেছে। খৃষ্টীয় নবম শতকে দামোদর গুপ্ত 'রত্নাবলী' হর্ষরচিত বলেছেন। আর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর I-tsang বলেছেন, নাগানন্দ হর্ষের রচনা। তাছাড়া রাজা হর্ষের যে কবিত্বশক্তি ছিল একথা বাণভট্ট প্রশংসা করে বলেছেন। এই তিনটি নাট্যগ্রন্থই যে একজনের রচনা এতেও কোনো সন্দেহ নেই। এগুলির পরস্পরের বিষয়বস্তু, ভাব ও ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

প্রিয়দর্শিকা :—এটি চার অঙ্কের একটি নাটিকা। উদয়ন ও প্রিয়দর্শিকার মিলনকাহিনী এর বিষয়বস্তু। অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মার ইচ্ছা ছিল বৎসরাজ উদয়নের সঙ্গে তাঁর কন্যা প্রিয়দর্শিকার বিবাহ দেন কিন্তু কলিঙ্গরাজ প্রিয়দর্শিকাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি এক সময় দৃঢ়বর্মাকে বন্দী করেন। ঘটনাক্রমে প্রিয়দর্শিকা আরণ্যিকা নাম গ্রহণ করে উদয়নের অন্তঃপুরে পরিচারিকা রূপে আত্মগোপন করে থাকতেন। এই সময় উদয়ন তাঁর প্রণয়াসক্ত হন। কিন্তু উদয়নের রাণী বাসবদত্তা এই বিষয় জানতে পেরে আরণ্যিকাকে কারাগারে বন্দী করেন। পরে জানা যায় আরণ্যিকা বাসবদত্তার মাতুল কন্যা। শেষ পর্যন্ত উদয়নের সঙ্গে আরণ্যিকার বিবাহ হয়।

রত্নাবলী :—আর একটি চার অঙ্কের নাটিকা। রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা—উভয় নাটিকার কাহিনীতে যথেষ্ট ঐক্য বিদ্যমান। উভয়ের নায়ক একজনই। তিনি রাজা উদয়ন। রত্নাবলীতে উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ অত্যন্ত সুকৌশলে সিংহলের রাজকুমারী রত্নাবলীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ সম্পাদন করেন। দুটি নাটকের বিষয়বস্তু এক, শুধু কিছু পার্থক্য ঘটনাবিন্যাসে। নাটিকা-দুটির কাহিনীও লেখকের মৌলিক সৃষ্টি নয়। উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনী বহুকাল থেকে প্রচলিত ছিল। ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকে চিত্রিত উদয়ন চরিত্র শ্রীহর্ষের নাটিকার উদয়নের চেয়ে অনেক উন্নত। 'স্বপ্নবাসবদত্তা'র উদয়নের পত্নীপ্রেম গভীরতর। পদ্মাবতীকে বিবাহ

করলেও তাঁর মনে সব সময় বাসবদত্তার স্মৃতি জাগরূক ছিল। আর এখানকার বাসবদত্তা স্বামীর মঙ্গলের জন্ত আত্মোৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিতা নয় কিন্তু হর্ষের বাসবদত্তা তেমন নয়। সে স্বামীর অন্ত নারীর প্রতি আকর্ষণে ক্ষুব্ধ। দুটি নাটকেই দেখা যায়, একটি অপরিচিতা নিম্নশ্রেণীর নারীর সঙ্গে রাজার প্রণয়-লীলা। বিদূষক ও প্রণয়িনীর পরিচারিকাব সহায়তায় প্রণয়িনীর সঙ্গে রাজার গোপন মিলন প্রভৃতির চিত্র আছে।

নাগানন্দ ঃ—একটি পাঁচ অঙ্কের নাটক। কথাসরিৎ-সাগরের দ্বাদশ তরঙ্গে উক্ত বিদ্যাধর রাজকুমার জিমূতবাহনের পৌরাণিক কাহিনী এই নাটকটির মূল উপজীব্য। জিমূতবাহন সিদ্ধগণের রাজকুমারী মলয়াবতীর প্রণয়াসক্ত হন ও নানা বাধা বিঘ্নের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের পরিণয় হয়। এক সময় জীমূতবাহন সর্পকুলের বিপদে ব্যথিত হয়ে তাদের গরুড়ের অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্য গরুড়ের কাছে আত্মোৎসর্গ করেন। কিন্তু গৌরীর দয়ায় তিনি পুনর্জীবন লাভ করে মলয়াবতীর সঙ্গে মিলিত হন।

এই নাটকে নাট্যকার জীমূতবাহনের চরিত্রের উদারতা, পরের মঙ্গলের জন্য আত্মদানের মহিমা সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে মলয়াবতীর প্রণয় এখানে জীমূতবাহনের এই আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা নয়। এই ত্যাগ নিজ স্বাতন্ত্র্যেই গৌরবান্বিত। এখানে বিট ও বিদূষক দর্শকদের যথেষ্ট হাস্য-কৌতুক পরিবেশন করে।

এই তিনটি নাটকের মধ্যে রত্নাবলী সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়

ও প্রশংসিত। এই গ্রন্থগুলি শ্রীহর্ষের নাট্যরচনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। গ্রন্থগুলিতে চিত্রিত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী নাট্যকারের সূক্ষ্ম বর্ণনাশক্তির স্বাক্ষর।

মৌলিকতা না থাকলেও শ্রীহর্ষের নাট্যরচনা তিনটি মাধুর্য ও প্রাঞ্জলতার জন্য বিখ্যাত ও আদৃত। লেখক এখানে অলংকার প্রয়োগ ও কল্পনার রূপায়ণে রুচি ও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন।

মহেন্দ্রবিক্রম :—মত্তবিলাস নামে এক অঙ্কের একটি প্রহসন রচনা করেন। ইনি শ্রীহর্ষের সমসাময়িক পল্হবরাজ সিংহবিষ্ণুবর্মণের পুত্র এবং নিজে কাঞ্চীর রাজা ছিলেন। এঁর আবির্ভাব সময় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী। এঁর লেখা প্রহসনটি কেরালায় পাওয়া গেছে। এই ক্ষুদ্র নাট্যরচনায় শৈব সম্প্রদায়ের সুরাসক্তি ও বৌদ্ধভিক্ষুদের মদ্যপান লালসার চিত্র অঙ্কিত আছে। এখানে লেখক সমসাময়িক কালের সমাজের নীতিহীন দিকটাই ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে প্রস্তাবনা অংশে নাট্যকারের নামোল্লেখ ছাড়া ভাসের নাট্যরচনার মঞ্চ-কৌশল ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়। প্রহসনটিতে নানা রকমের প্রাকৃত ও ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে। লেখকের রচনাকৌশল শ্রীহর্ষের মত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ উপযোগী ও প্রাঞ্জল।

ভবভূতি

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে কালিদাসের পর শক্তিশালী নাট্যকার হিসাবে ভবভূতির খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তিনি রামের কাহিনী অবলম্বনে মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত নামে দুটি নাটক ও কাল্পনিক কাহিনী অবলম্বনে মালতীমাধব নামে একটি প্রকরণ—এই মোট তিনটি নাট্যগ্রন্থ রচনা করেন।

ভবভূতি তাঁর নাটকের প্রস্তাবনা অংশে নিজের পরিচয় কিছু লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন কিন্তু নিজের আবির্ভাব সময় সম্বন্ধে কিছু বলেননি। সেখান থেকে আমরা জানতে পারি

জীবনী

ভবভূতির অন্য নাম বা উপাধি ছিল শ্রীকণ্ঠ। তিনি কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান নীলকণ্ঠের পুত্র, মাতার নাম জাতুকর্ণী। এঁদের বাসভূমি ছিল বিদর্ভ দেশে পদ্মপুর নগরে। কল্হণ তাঁর রাজতরঙ্গিণীতে ভবভূতি কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মনের (৭৩৬ খৃষ্টাব্দ) রাজসভার কবি ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন ও ভবভূতির কাছে সাহিত্য-ঋণ স্বীকার করেছেন। এই সব সংবাদের ওপর নির্ভর করে ভবভূতিকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ পাদ ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগের নাট্যকার বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

উত্তররামচরিতের প্রস্তাবনা অংশে নাট্যকারের উক্তি[১] থেকে মনে হয় তাঁর নাটকগুলি এককালে বিরুদ্ধ সমালোচনায়

---

১. যথা স্ত্রীণাং তথা তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ। উত্তররামচরিত এবং—তৎ কিমিতি বিশ্রান্তচারণানি চত্বরস্থানানি।

—১ম অংক, প্রস্তাবনা।

সম্মুখীন হয়েছিল ও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু ভবভূতির নিজের রচনার উচ্চমান সম্বন্ধে গভীর আত্ম-বিশ্বাস ছিল যে এক সময় সুধীসমাজে তাঁর রচনা নিশ্চয়ই আদৃত হবে। মালতীমাধবে তাই তিনি বলেছেন—যাঁরা তাঁর রচনার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন তাঁদের জন্য তাঁর রচনা নয়। অসীম কাল ও বিশাল এই পৃথিবীতে তাঁর সমান যোগ্যতাসম্পন্ন কেউ নিশ্চয়ই জন্মাবেন বা আছেন যিনি তাঁর রচনার গৌরব ও গুণ উপলব্ধি করতে পারবেন।[১]—নিজের লেখার বিষয়ে ভবভূতির এই উক্তি গর্বিত হলেও পরবর্ত্তীকালে সত্য বলে বিবুধ সমাজে স্বীকৃত। তিনি তাঁর নাট্য-রচনায় শাস্ত্রজ্ঞান, বর্ণনানৈপুণ্য ও নাট্যরস পরিবেশনে অসাধারণ দক্ষতার যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

উত্তররামচরিত—রাবণের কবল থেকে পত্নী সীতাকে উদ্ধারের পর রামের অযোধ্যায় এসে রাজসিংহাসন লাভ ও প্রজারঞ্জনের জন্য সীতার নির্বাসন ও তজ্জনিত মনঃকষ্ট লাভ, অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে নিজ পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে পরিচয় ও পরে সীতার পুনর্দর্শন পর্যন্ত ঘটনা—এই নাটকটির উপজীব্য কাহিনী। অলংকারশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী উত্তররামচরিত

---

১. যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাম্ জানন্তু তে কিমপি তান্
প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা কালো হ্যয়ং
নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

একটি সম্পূর্ণাঙ্গ নাটক। এখানে নাট্যকার রামায়ণের মূল কাহিনী কিছু পরিবর্ত্তন করে তাঁর নাট্য-কাহিনীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য অনেক আকর্ষণীয় ঘটনার সমাবেশ করেছেন; যেমন,—আলেখ্যদর্শন, রামের সঙ্গে জনস্থান অরণ্যে বনবাস-কালের প্রিয়সখী বাসন্তীর সাক্ষাৎকার, ছায়াসীতা দর্শন, লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী ও রামের জননীদের বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিতি প্রভৃতি। রামায়ণের কাহিনী বিয়োগান্তক কিন্তু এখানে নাট্যকার অলংকারশাস্ত্রের নিয়মানুসারে শেষে অলৌকিক উপায়ে রামের সঙ্গে সীতার পুনর্মিলন ঘটিয়ে নাট্যকাহিনী মিলনান্তক করেছেন। নাটকটির সাতটি অঙ্ক।

এখানে ভবভূতি প্রকৃতির গহন গাম্ভীর্য, শান্ত সৌন্দর্য ও মানব মনের অন্তর্নিহিত কোমল করুণ ভাবগুলি এমন মর্মস্পর্শী করে জীবন্তভাবে রূপায়িত করেছেন, যা অন্যত্র দুর্লভ। অন্যদিকে চরিত্র বিশ্লেষণ ও বীররসের বর্ণনাতেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সীতাবিরহে রামের মর্মবিদারী মনোব্যথা ও তাঁর পত্নীপ্রেমের প্রতি নির্বাসিতা বিরহব্যথিতা সীতার গভীর শ্রদ্ধা নাট্যকারের লেখনীতে অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। সীতার ক্ষমাশীল মধুর কোমল প্রকৃতির মনোজ্ঞ বাণীচিত্র রচনা করেছেন ভবভূতি। তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে বলা যায়, সীতার বিচ্ছেদে রামের হৃদয়বিদারী বিলাপে পাথরও গলে যায়, বজ্রের মত কঠিন হৃদয়ও অভিভূত হয়ে পড়ে;—'অপি গ্রাবা রোদিতি, অপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্।'

প্রভূত নাটকীয়তা থাকা সত্ত্বেও উত্তররামচরিত গীতি-কাব্যের সুরমূর্চ্ছনায় প্রতিধ্বনিত, মধুর করুণ রসের গীতি মাধুর্যে অভিষিক্ত। তাই অনেক সমালোচক নাটকটিকে dramatic lyric বা নাট্যকাব্য বলেছেন। নাটকটি ভবভূতির পরিণত হাতের রচনা ও তিনটি নাট্য রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলমের পরই এই নাটকটির খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং শকুন্তলার মত বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্রের 'সীতার বনবাস'এর ভাবানুবাদ।

মহাবীরচরিত—নাটকটিরও সাত অঙ্ক। রামের বনবাস-পূর্ব জীবনের কাহিনী এর নাট্যবিষয়। নাট্যকারের প্রথম রচনা হলেও এখানে নাট্যকৌশলের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়, তবে এখানকার চরিত্র-চিত্রণ সার্থক হয়নি। প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে ভবভূতি নাকি এই নাটকটি সম্পূর্ণ লেখেননি। পঞ্চম অঙ্কে ছেচল্লিশটি শ্লোক পর্যন্ত তাঁর রচিত, পরবর্ত্তী অংশ রচনা করেন সুব্রহ্মণ্য নামে এক কবি। এই কিম্বদন্তীর সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

মালতীমাধব—অলংকারশাস্ত্রের নিয়মানুসারে একটি প্রকরণ। এর দশটি অঙ্ক। একজন বিদ্যার্থী ছাত্র মাধব ও মন্ত্রীর কন্যা মালতীর প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে প্রকরণটি রচিত। বহু বাধাবিঘ্নের ভেতর দিয়ে অবশেষে বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা কামন্দকীর সহায়তায় মাধবের সঙ্গে মালতীর মিলন ঘটে। এই মূল কাহিনীর সঙ্গে নাট্যকার বেশ সুকৌশলে মদয়ন্তিকা ও মকরন্দের প্রেমের কাহিনী সংযোজন করেছেন। বহু

উত্তেজনাকর ও অভাবিত ঘটনার সমাবেশে দুটি প্রেম-কাহিনী সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়ে শেষে মধুর মিলনে পরিসমাপ্ত হয়েছে। ভবভূতি এই গ্রন্থটির মধ্যে স্বাধীনভাবে ভয়াবহ বীভৎস ও অলৌকিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে নায়ক নায়িকাকে নিয়ে গেছেন। নাটকটির ত্রুটি এই যে মদয়ন্তিকা ও মকরন্দের সহায়ক-কাহিনী প্রাধান্য লাভ করে মালতী-মাধবের মূল কাহিনীটিকে ম্লান করার চেষ্টা করেছে। ভবভূতির নাট্য-রচনায় হাস্যরসের অত্যন্ত অভাব থাকলেও মালতী-মাধবের দ্বিতীয় কাহিনীতে বেশ কিছু হাস্যের উপাদান আছে।

এই নাটকে আমরা কপালকুণ্ডলা নামে কাপালিক অঘোর ঘণ্টের এক শিষ্যার সঙ্গে পরিচিত হই। বাংলার সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত তাঁর কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলার নাম এখান থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। এখানকার কাপালিক অঘোরঘণ্টের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কাপালিকের কিছু মিল আছে বটে তবে এখানকার কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তাঁর কপালকুণ্ডলা চরিত্রের ঐক্য নেই। মালতীমাধবের কপালকুণ্ডলা হিংসাপরায়ণা, বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা ক্ষেমঙ্করী।

ভবভূতির রচনার ত্রুটি এই যে তাঁর বাক্য দীর্ঘ, জটিল সমাসবদ্ধ, অর্থবোধে কষ্টকর। লেখক ভাবাবেগ সংযমে অক্ষম। তার ফলে তিনি যখন যে ভাবের বর্ণনা করেছেন তা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ দীর্ঘ হয়ে পাঠকদের কাছে ক্লান্তিকর হয়েছে এবং নাট্যরসও কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে। তাঁর

নাট্য-রচনা উন্নত শ্রেণীর কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ, তবে তাতে নাটকীয় গতি কিছু ব্যাহত হয়েছে। ভবভূতির নাটকগুলি পাঠ করে মনে হয়, তিনি যেন সব সময় কাব্য পরিবেশনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন, সুযোগ পেলেই তাঁর কাব্যবীণার ঝংকার শোনাবেন। এই ভাবপ্রবণতা কবির পক্ষে গুণ হতে পারে নাট্যকারের নয়। তাই ভবভূতি যতটা নাট্যকার তার অনেক বেশি তিনি কবি।

বিশাখদত্ত—মুদ্রারাক্ষস নামে একটি সাত অঙ্কের নাটক রচনা করেন। নাটকটির প্রস্তাবনায় নিজের কিছু পরিচয় রেখে গেছেন। তিনি সামন্ত বটেশ্বর দত্তের পৌত্র ও মহারাজ (মহাসামন্ত) ভাস্কর দত্তের পুত্র। তাঁর

সময়

আবির্ভাব সময় নিয়ে বিভিন্ন মত আছে। Wilsonএর মতে তাঁর সময় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী। Telang নাটকটির ভরতবাক্যে স্থিত 'পার্থীবোঽবন্তীবর্মা' বাক্যে ৭ম শতাব্দীর মৌখরীরাজকে মনে করে বলেছেন এই সময় নাটকটির রচনাকাল। আবার কেউ বিশাখদত্তকে পঞ্চম শতাব্দীর মানুষ বলে মনে করেন। তাঁর নাটকে উল্লিখিত চন্দ্রগ্রহণের কাল অনুসারে খৃঃ ৮৬০ অব্দ তাঁর সময় বলে কেউ কেউ মনে করেন। আসলে তাঁর সময় সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত হয়নি। তবে তিনি যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বের নাট্যকার ছিলেন একথা জোরের সঙ্গেই অনেকে বলেছেন।

গুণাঢ্যের বৃহৎকথা নাটকটির কাহিনীর উৎস। এর মূল

বিষয়বস্তু হল নন্দের মন্ত্রী রাক্ষস ও বিখ্যাত রাজনীতিবিদ চাণক্যের লড়াই। এই লড়াইয়ে চাণক্য শেষ পর্যন্ত নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করে সেই বংশের অনুগত মন্ত্রী রাক্ষসকে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে নিয়ে আসতে সমর্থ হন। নাটকটির বড় আকর্ষণ হল রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং ঐ বিষয়টি নাট্যকার এমন সুকৌশলে নাট্যায়িত করেছেন যে দর্শক ও পাঠকগণ পরবর্ত্তী ঘটনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে।

বিষয়বস্তু

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাটকটির বৈশিষ্ট্য এই যে অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের মত শৃঙ্গার রসের এখানে প্রধান্য না থাকলেও নাট্যকাহিনী ক্লান্তিকর হয়নি, বরং হয়েছে কৌতূহলোদ্দীপক। সাধারণ সংস্কৃত নাট্যরচনার মত এখানে কবিত্বেরও বাড়াবাড়ি নেই। ভাষা আবেগপ্রধান, অলংকারবহুল নয় অথচ ঘটনা-বিন্যাসের পরিপাট্যে নাটকীয়তা বেশ আছে। রাক্ষস ও চাণক্য চরিত্রের বিশ্লেষণে চিত্রণে নাট্যকার বেশ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। পরস্পর প্রতিযোগী দুই চরিত্র স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত। রাক্ষস ও চাণক্য দুজনেই সমান বুদ্ধিমান কূটনীতিজ্ঞান-সম্পন্ন। এদের মধ্যে চাণক্য বেশি হুঁসিয়ার ও আত্মবিশ্বাসী। আর রাক্ষস সে তুলনায় কোমল প্রকৃতির, একটু অসাধারণ ও আবেগপ্রবণ। অন্য দুটি প্রতিযোগী চরিত্র চন্দ্রগুপ্ত ও মলয়কেতু। তাদের স্বাতন্ত্র্যও বেশ ফুটে উঠেছে। চন্দ্রগুপ্ত সুশিক্ষিত, দৃঢ়চরিত্র, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি আর মলয়কেতু

গর্বিত, অব্যবস্থিতচিত্ত ও দুর্বল চরিত্রের মানুষ। সাধারণভাবে নাটকটির ভাষা সহজ সরল, কোথাও ভাষার ভারে বা আবেগপ্রাবল্যে নাটকীয় গতি ব্যাহত হয়নি। বিশাখদত্তের রচনার এইটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

ভট্টনারায়ণ:—এর রচিত বেণীসংহার ছয় অংকে সম্পূর্ণ একটি নাটক। দুইজন আলংকারিক বামন ও আনন্দবর্ধনের লিখিত কাব্যালংকার ও ধ্বন্যালোকে যথাক্রমে বেণীসংহারের শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। ভট্টনারায়ণের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। বেণীসংহারের কাহিনীর উৎস মহাভারত।

দুর্যোধনের সভায় দুঃশাসনের হাতে দ্রৌপদীকে অপমানিতা হতে দেখে ভীম শপথ করেছিলেন যে তিনি দুঃশাসনকে হত্যা করে, তার রক্তে রঞ্জিত হস্তে দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন করবেন। ভীমের এই প্রতিজ্ঞা পালন ও দুঃশাসনবধ এই নাটকটির বিষয়বস্তু।

ভট্টনারায়ণ তাঁর নাটকে বীররস রূপায়ণে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই নাটকটিকে দাশগুপ্ত ও দে রচিত History of Sanskrit Literature এ বলা হয়েছে—The Veni-Samhara is one of the earliest and best example of the peculiar kind of half-poetical and half-dramatic composition which may be called the declamatory drama.

বেণীসংহারের কাব্যাংশ বা নাট্যাংশ কোনোটাই খুব

উন্নত শ্রেণীর নয়। তবে বীর, করুণ ও ভীতিরস মোটামুটি ভাবে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম তিনটি অঙ্কে বেশ নাটকীয় গতি আছে। তবে নাট্যকার এখানে নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগের যে যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন, তা অস্বীকার করা যায়না। তবে তাঁর দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাক্য নাটকের উপযোগী হয়নি। এই গ্রন্থটিতে কাব্য ও নাটকীয়তা কোনটির খুব ভাল পরিচয় পাওয়া যায়না।

মুরারি রচনা করেন 'অনর্ঘরাঘব' নামে একটি সাত অঙ্কের নাটক। তাঁর সময় নবম শতাব্দী বলে ধরা হয়। নাটক হিসাবে এটি খুব সার্থক হয়নি। এখানে নাট্যকারের কবিপ্রতিভারই বেশি পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। রামের কাহিনীই নাটকটির বিষয়বস্তু। কবি হিসাবেও তাঁকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়না।

রাজশেখর—চারটি দৃশ্যকাব্য রচনা করেন। এদের মধ্যে বালরামায়ণ, বালভারত, ও বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটক এবং চার অঙ্ক বিশিষ্ট প্রাকৃতে রচিত কর্পূরমঞ্জরী সট্টক শ্রেণীর অন্তর্গত। এখানে রাজা চন্দ্রপালের ও কুন্তলার রাজকুমারীর প্রণয়কাহিনী, ওদের প্রেমের পথে ঈর্ষাপরায়ণ রাণীর বাধাসৃষ্টি, প্রণয়ী-প্রণয়িনীর গোপন সাক্ষাৎকার ও শেষে উভয়ের মিলনে নাট্যকাহিনীর পরিসমাপ্তি বর্ণনা করা হয়েছে। বাল রামায়ণের দশটি অঙ্ক। এর বিষয়বস্তু রামের জীবনী। বালভারতের দুটি মাত্র অঙ্ক পাওয়া গেছে।

বিদ্ধশালভঞ্জিকা—নাটকের চারটি অঙ্ক। রাজা বিদ্যাধরের

সঙ্গে রাজা চন্দ্রবর্মণের কন্যা মৃগাঙ্কবতীর গোপন বিবাহ নাটকটির বিষয়বস্তু।

রাজশেখরের রচনাশৈলী স্বচ্ছন্দ নয়। রাজশেখর তাঁর পূর্ববর্ত্তী শক্তিশালী কবি ও নাট্যকারগণের কলাকৌশল অনুসরণের চেষ্টা করেছেন বটে তবে তাঁর রচনায় পূর্ব্বসূরিগণের স্বাভাবিকতা ও দীপ্তি আনতে পারেননি।[১]

ক্ষেমীশ্বর—চণ্ডকৌশিক নামে পাঁচ অঙ্কের একটি নাটক রচনা করেন। নাটকটির প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে গ্রন্থটি কনৌজের রাজা মহীপালের (খৃষ্টাব্দ ৯১৪) রাজসভায় উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এই রাজাকে কেউ কেউ বাংলার রাজা মহীপাল বলে মনে করেন।

হরিশ্চন্দ্র ও বিশ্বামিত্রের বিখ্যাত কাহিনী এই নাটকের মূল আখ্যান। নাটকটির রচনাশৈলী কৃত্রিম। এর নাটকীয়তা খুবই কম।

দামোদর মিশ্র—মহানাটক বা হনুমান নাটকের রচয়িতা। একাদশ শতাব্দী তাঁর আবির্ভাবকাল। নয়, দশ ও চৌদ্দ অঙ্কে তিন শাখায় নাটকটি পাওয়া গেছে। রামায়ণের কাহিনী

---

১. He deliberately models his style and even copies from the splendid examples of poetry and drama of his predecessors, but he fails to transfer to his own works their ease and brilliancy. Hist. of Sans. Lit.—Dr. S. K. De.

অবলম্বনে এর নাট্যকাহিনী গঠিত। এতে নাটকীয়তা অপেক্ষা কবির কবিত্বেরই বেশি পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকটির একটি বৈশিষ্ট্য যে এখানে বিদূষক চরিত্র নেই। Luders এর মতে এটি ছায়া-নাটকের নিদর্শন। এই নাটকের অধিকাংশই পদ্যে লিখিত, গদ্যের অংশ খুবই কম। এখানকার শ্লোকগুলি নাট্যধর্মী নয়, বর্ণনামূলক। এখানে একেবারে প্রাকৃতের ব্যবহার নেই।

মহানাটক

রূপক নাটক

কৃষ্ণমিশ্রের রচিত প্রবোধ-চন্দ্রোদয় সংস্কৃত রূপক-নাট্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। নাট্যকারের অবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। কৃষ্ণমিশ্র তাঁর নাটকের প্রস্তাবনায় বলেছেন যে তিনি গোপাল নামে কোনো এক ব্যক্তির অনুরোধে রাজা কীর্তিবর্মণের চেদিরাজ্য বিজয়-স্মৃতি পালন উপলক্ষে এই দৃশ্যকাব্যটি রচনা করেন। নাটকটিতে বিবেক, মন, বুদ্ধি, বৈরাগ্য, মোহ, মহামোহ প্রভৃতি ভাববস্তুকে জীবন্ত চরিত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে। বারাণসীর রাজা মোহ বিবেককে তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে রাজ্য থেকে নির্বাসন দেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবেকই জয়ী হয় এবং মোহ ও তার সঙ্গীদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে। এইটি হল গ্রন্থটির বিষয়বস্তু।

প্রবোধচন্দ্রোদয়

কৃষ্ণমিশ্রের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য এইখানে যে তিনি সর্বপ্রথম ভাববস্তুকে নাট্যচরিত্ররূপে ব্যবহার করে সাংকেতিক নাটক

সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে সাংকেতিক নাটকের প্রাচীনতম সূত্র এখানে পাওয়া যায়। নাট্যকার এখানে মানুষের মানসিক দ্বন্দ্বের নাট্যায়নে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং এর সঙ্গে শৃঙ্গার, হাস্য ও ভক্তিরসের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সাংকেতিক নাটক রচনায় এখান থেকে কিছু প্রেরণা পেয়ে থাকতে পারেন।

প্রবোধচন্দ্রোদয়ের আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় পরবর্ত্তীকালে এই শ্রেণীর অনেকগুলি নাট্যগ্রন্থ রচিত হয় কিন্তু এগুলির নাট্য ও সাহিত্যিক মূল্য অত্যন্ত কম। নিম্নে কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হল।

১। ত্রয়োদশ শতাব্দীর লেখক যশঃপাল রচিত—মহাপরাজয়—পাঁচ অঙ্কের নাটক।

২। ষোড়শ শতাব্দীর লেখক পরমানন্দদাস কবিকর্ণপুর রচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয়।

৩। ষোড়শ শতাব্দীর লেখক ভুদেব শুক্ল-রচিত—ধর্মবিজয় (পঞ্চাঙ্ক নাটক)

৪। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বেদকবির রচিত বিদ্যাপরিণয় ও জীবানন্দ (দুটি সপ্তাঙ্ক)

৫। সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক গকুল নাথের পঞ্চাঙ্ক নাটক অমৃতোদয়।

৬। সপ্তদশ শতাব্দীর সামরাজা দীক্ষিত রচিত—শ্রীদাম (পঞ্চাঙ্ক)।

৭। কবি কৃষ্ণমিশ্র রচিত সঙ্কল্পসূর্যোদয় (দশ অঙ্ক)।

৮। বরদাচার্যের যতিরাজবিজয় (ছয় অঙ্ক)।

দর্শন

ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের বিরাট আয়তন। ভারতে দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসার সূচনা বেদের সংহিতা যুগ থেকে। ন্যায়, বৈশেষিক সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত—এই ছয়টি দার্শনিক মতবাদের উৎসভূমি বেদ। জীবন, জীবনের উদ্দেশ্য ও বিশ্বরহস্য জানার আকাঙ্ক্ষা থেকেই দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব। দর্শন শাস্ত্রের লক্ষ্য হল সত্যানুসন্ধান। সাধনার দ্বারা সেই শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি সম্ভব। বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য-সৃষ্টি ঋগ্বেদের সূক্তে যার প্রথম সূচনা, সেই দার্শনিক চিন্তার প্রাথমিক স্তর উপনিষদগুলি। এই গুলিই দর্শনশাস্ত্রের প্রধান উৎস।

উপনিষদ হল বেদান্ত অর্থাৎ বেদের শেষ ভাগ। ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনাই এর লক্ষ্য। উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাণ্ড।

নাস্তিক ও আস্তিক—দর্শনের এই দুই শ্রেণী। যেসব দর্শন ঈশ্বর, পরলোক ও বেদের প্রধান্য স্বীকার করেনা সেগুলি নাস্তিক দর্শন, যেমন—জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বাক দর্শন। আর যেগুলি বেদের প্রাধান্য ও পরলোকে বিশ্বাসী—সেগুলি আস্তিক দর্শন, যেমন—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত।

এই আস্তিক দর্শনগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। চার্বাক দর্শনও সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ। তবে এই দর্শনের অন্য নাম "লোকায়ত" থেকে মনে হয় এই মতবাদ হয়তো প্রথমে

লৌকিক ভাষায় লিখিত হয়েছিল, পরে সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

জৈনদের দার্শনিক গ্রন্থগুলি প্রাকৃতে রচিত। তবে পরে এদের মধ্যে সংস্কৃতের মিশ্রণ ঘটেছে। বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদ প্রথমে পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল বলা হয় এবং পরে সংস্কৃতেও বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্র লিখিত হয়েছে। বিশেষভাবে হিন্দু দার্শনিকগণের সঙ্গে আলোচনার সুবিধার জন্য জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন সংস্কৃতকে আশ্রয় করে।

আস্তিক দর্শনগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয়—জীব, জগৎ ও আত্মা বা পরমাত্মা ব্রহ্ম। সকল দর্শনের মতে মোক্ষই হল জীবের চরম লক্ষ্য। অবিদ্যা বা অজ্ঞান জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে রাখে, দুঃখবেদনা দেয়। এই অজ্ঞান থেকে, দুঃখের কবল থেকে মুক্তি, বা ভ্রান্তজ্ঞানের নিরসনে যখন সত্যজ্ঞান আবির্ভূত হয়—তখনই জীবের মুক্তি সেই শাশ্বত সত্যের উদ্বোধনে। সকল দর্শনেরই বিচার্য্য বিষয়—প্রমাণ ও প্রমেয়। জীব, জগৎ ও পরমাত্মা—প্রমেয় এবং যে যুক্তিতে এগুলি জানা যায় তা প্রমাণ।

সাংখ্য

সাংখ্যমতই ভারতবর্ষে প্রাচীনতম দার্শনিক মত। মহর্ষি কপিল এই মতবাদের প্রবর্ত্তক। বেদ, স্মৃতি, মহাভারত, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র, চরকসংহিতা প্রভৃতিতে সাংখ্যমত বিক্ষিপ্তভাবে আছে। সাংখ্যদর্শনের বহু গ্রন্থ কালের গর্ভে

বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কতকগুলি গ্রন্থের নাম জানা যায় কিন্তু পাওয়া যায় নি। এই দর্শনের কপিলরচিত সাংখ্যসূত্র প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি হওয়ার জন্য সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র নামে আর একটি গ্রন্থ রচিত হয়। এটি অনেক পরবর্ত্তীকালের রচনা বলে মনে করা হয়। অন্য দুটি মৌলিক গ্রন্থ হল,—তত্ত্বসমাস ও ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা। সাম্প্রতিককালে যুক্তিদীপিকা নামে একটি সাংখ্যশাস্ত্রের গ্রন্থ পাওয়া গেছে। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার টীকা বাচস্পতি-মিশ্রকৃত—'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' অতিশয় প্রামাণ্য গ্রন্থ। ১৬শ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বিজ্ঞানভিক্ষু নামে একজন বাঙালী কপিলরচিত সাংখ্যপ্রবচনের একটি ভাষ্য রচনা করেন।

সাংখ্যাচার্য্যগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটিকে জ্ঞানের প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। সাংখ্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, জ্ঞানের সহায়তায় পরমাত্মতত্ত্ববোধ। সাংখ্য মতে 'দুঃখ একটি প্রধান স্বীকৃত সত্য।' আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক—এই তিন প্রকার দুঃখের কবল থেকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আত্যন্তিক মুক্তিলাভই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রধান বক্তব্য। এই ত্রিবিধ দুঃখের চিরতরে উচ্ছেদই হল সাংখ্যের মুক্তি বা পুরুষার্থ।

সাংখ্য সৃষ্টির মূলে পুরুষ (আত্মা) ও প্রকৃতি নামে দুই সত্তা স্বীকার করে। এদেরই মিলনে সৃষ্টি কিন্তু প্রকৃতিই সৃষ্টির মূল কারণ। পুরুষ নিরপেক্ষ দ্রষ্টামাত্র। প্রকৃতি

জড় ও পরিবর্তনশীল। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের আধার প্রকৃতি। এটি তিনগুণের সাম্যাবস্থা। তিনগুণের বিকৃতি অর্থাৎ হ্রাস বৃদ্ধিই সৃষ্টির কারণ। একে বিরূপ পরিণাম বলা হয়। কিন্তু গুণগুলি সদাপরিবর্তনশীল বলে যখন এদের নিজেদের মধ্যেই নিজেরা পরিবর্তিত হয়—সেই অবস্থাকে স্বরূপ পরিণাম বলে।

সাংখ্য মতে পুরুষকে নিয়ে ২৫টি তত্ত্ব। পুরুষ ছাড়া বাকি ২৪টি তত্ত্ব জগৎ সৃষ্টির মূল। ২৫টি তত্ত্ব, যেমন—পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ), একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পানি পাদ, পায়ূ, উপস্থ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এবং একাদশ মন।), পঞ্চ মহাভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। সাংখ্যের পুরুষ বহু এবং পুরুষ ও আত্মা অভিন্ন। এই পুরুষ ভোগ করে, কাজ করে না। উদাসীন নিষ্ক্রিয় সাক্ষীমাত্র। এই মতে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই বন্ধন। বন্ধনমুক্ত হলে পুরুষ (আত্মা) তাঁর স্বরূপ নিত্য, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না বলে সাংখ্যমতে ঈশ্বর অসিদ্ধ,—'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। ঈশ্বর জগতের কারণ নয়, প্রকৃতি মূল কারণ। সাংখ্যমতে পুরুষ বা আত্মার স্বরূপ সাময়িকভাবে অবিদ্যা প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়। আবার বন্ধনমুক্ত হলে তার নিজের শুদ্ধরূপ ফিরে পায়। এইমতে আত্মার বন্ধনও, মুক্তি দুইই সত্য। সাংখ্যের একটি অন্য বৈশিষ্ট্য সৎকার্যবাদ। সাংখ্যমতবাদিগণ বলেন, কার্য্য উৎপত্তির আগে কারণে বিলীন

বা অব্যক্ত হয়ে থাকে। কার্য্য কারণে সম্ভাবনা রূপে থাকে। সমস্ত জগৎ প্রকৃতিতে অব্যক্তভাবে বিলীন হয়ে থাকে। তাই সৃষ্টির মূল কারণ প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হয়। এই মতকেই সৎকার্য্যবাদ বলা হয়। সাংখ্যমতে আত্মায় প্রতিবিম্বিত সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ধর্মের উচ্ছেদেই আত্মার মুক্তি।

যোগ

যোগ সেশ্বর সাংখ্য। যোগের সঙ্গে সাংখ্যমতের এই তফাৎ যে সাংখ্য প্রমাণাভাবে ঈশ্বর স্বীকার করে না আর যোগ করে।

যোগদর্শন দর্শনের চেয়ে বেশি বিজ্ঞান। যোগও পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করে। যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ পতঞ্জলির যোগদর্শন। সেখানে চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ বলা হয়েছে—যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। এই নিরোধের চরম পরিণতি চিত্তের পূর্ণ বিলীনতায়—এবং একেই বলা হয় সমাধি। সমাধি দুরকম —সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয়তে ধ্যাতার চিত্ত সম্পূর্ণ সমাহিত হয়েও একেবারে ধ্যেয়তে বিলীন হয়ে যায় না, চিত্তে ধ্যেয়ের স্বরূপ মাত্র উদ্ভাসিত হয়। তখনো ধ্যেয় ও ধ্যাতার পার্থক্যবোধ থাকে কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাতে ধ্যাতার চিত্ত ধ্যেয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে লীন হয়ে যায়। তখন আর ধ্যাতা ধ্যেয় কোন বোধ থাকে না। এই অবস্থাই নির্বিকল্প সমাধির নামান্তর মাত্র। যোগশাস্ত্রের মতে ঈশ্বরই ধ্যেয়, জ্ঞেয়,

ঈশ্বর অনাদি, সর্ববন্ধনমুক্ত। এই ঈশ্বর আবার মুক্ত পুরুষ থেকে পৃথক। ঈশ্বর মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নন, মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ প্রকৃতিপুরুষবোধ, এতে ঈশ্বরের উপাসনা মুক্তির সহায়তা করে। যোগদর্শন ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলে স্বীকার করে না। জগতের কারণ পুরুষ এবং প্রকৃতি। এখানে ঈশ্বর পুরুষ বিশেষ তবে তিনি অনাদি ও সর্ববন্ধনমুক্ত। যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ সাধনা নির্দেশ করা হয়েছে,—এই সাধনা চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তনিরোধের কারণ। যোগের আটটি স্তর—যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। যোগী এই সব সাধনা করে শেষে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করেন এবং এই অবস্থা লাভই যোগীর চরম প্রাপ্তি।

পতঞ্জলির যোগসূত্র ছাড়া অনেকগুলি উপনিষদের মধ্যে যোগমত পাওয়া যায়। এছাড়া অনেকগুলি যোগগ্রন্থ আছে, যেমন,—শিবসংহিতা, অষ্টাবক্রসংহিতা, যোগিযাজ্ঞবল্ক, ষটচক্র-নিরূপণ প্রভৃতি। যোগসূত্রের ভাষ্যকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে যোগের প্রথম প্রবর্ত্তক হিরণ্যগর্ভ, তিনিই আদি বক্তা। পতঞ্জলি যোগানুশাসন সুসম্বদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর আবির্ভাব সময় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী।

ন্যায়

ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম। এঁর অন্য নাম অক্ষপাদ বলে এই দর্শনের অপরনাম অক্ষপাদ-দর্শন। এই শাস্ত্র যুক্তি ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে একে অন্বীক্ষিকী

বিদ্যা বলা হয়। এই মতে জ্ঞানের চারটি প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, আর প্রমেয়—সত্যজ্ঞান। ন্যায়মতে ষোলটি পদার্থ,—যথা, প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। এই ষোলটির সঠিক জ্ঞান লাভই মুক্তি।

ন্যায়-দর্শন আত্মাকে শরীর ও মন থেকে ভিন্ন বস্তু মনে করে। মনের সহায়তায় আত্মা সুখ দুঃখ উপলব্ধি করে, আসলে আত্মার নিজের অনুভব শক্তি নেই। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যোগের ফলে আত্মার অনুভূতি জন্মে। এই তত্ত্বজ্ঞানের বা সত্যজ্ঞানের দ্বারা সুখ দুঃখ বোধ থেকে মুক্তি হল অপবর্গ লাভ।

ন্যায় যুক্তি ও বিচারের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ, ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ ও জীবের হিতার্থে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। তাঁর নির্দেশ মেনে চললে তাঁরই দয়ায় জীব একদিন তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সাংসারিক সুখদুঃখ ভোগ থেকে মুক্ত হয়ে অপবর্গ বা সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করবে। অণু সৃষ্টির উপাদান কারণ।

ন্যায়দর্শনের প্রাচীনতম গ্রন্থ বাৎস্যায়ন-ভাষ্য। নিচে কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ করা হল :—

(১) ন্যায়বার্ত্তিক—উদ্দ্যোতকর-রচিত (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী)।

(২) ন্যায়সার ও গ ণ কা রি কা—ভাসসর্বজ্ঞরচিত।

(৩) ন্যায়মঞ্জরী-রচয়িতা জয়ন্ত ভট্ট (অষ্টম শতাব্দী)। (৪) ন্যায়বার্ত্তিকতাপর্য পরিশুদ্ধি—উদয়নাচার্য

গ্রন্থ

কৃত—৮ম শতাব্দী। এছাড়া মিশ্রউদয়নাচার্য্য রচিত কুসুমাঞ্জলীর টীকা—কুসুমাঞ্জলিবোধিনী, কিরণাবলীর টীকা—তর্ককারিকা, বর্ধমান উপাধ্যায়রচিত গৌতমের ন্যায়-সূত্রের টীকা—অম্বীক্ষানয়-তত্ত্ববোধ, কুসুমাঞ্জলির টীকা—কুসুমাঞ্জলি প্রকাশ, কিরণাবলীর টীকা—কিরণাবলীপ্রকাশ, তত্ত্বচিন্তমিণির টীকা—তত্ত্বাচন্তিমণিপ্রকাশ প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

বৈশেষিক

মহর্ষি কণাদ এই দর্শনের প্রবর্ত্তক। এঁর অপর নাম উলূক বলে এই দর্শনের নাম ঔলূকীয় দর্শন। কণাদকৃত বৈশেষিক সূত্র এই দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ। ন্যায়ের সঙ্গে বৈশেষিকের যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্ত্তমান। বৈশেষিক ন্যায় থেকে প্রাচীন বলে অনেকে মনে করেন।

বৈশেষিক-দর্শনের মতে সাতটি পদার্থ; যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। 'বিশেষ' কে একটি পদার্থ স্বীকার করে তার ওপর বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে বলে এই দর্শনের নাম বৈশেষিক। এই মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ,—এই চারি শ্রেণীর পরমাণু থেকে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক পরমাণু এক একটা বিশেষ। এই পরমাণুর পরস্পর মিলন বা সংযোগে সৃষ্টি, আর বিশ্লেষে সৃষ্টির

ধ্বংস হয়। আবার এই পরমাণুর সংশ্লেষ বা বিশ্লেষ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছায়। জীবের অদৃষ্ট অনুসারে ঈশ্বর সৃষ্টিকার্য্য করেন। বৈশেষিক দর্শন অনুমানের সহায়তায় বিশ্বের স্রষ্টারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

কণাদরচিত বৈশেষিকসূত্র এই দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ। এর রচনাকাল খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের পরে নয় বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। গ্রন্থটির পরবর্ত্তীকালে অনেক সংস্করণ হয়েছে। বৈশেষিকসূত্রের ওপর প্রশস্তপাদাচার্য্যের ভাষ্য পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ—এই দর্শনের একটি প্রমাণ্য মৌলিক গ্রন্থ। এর সময় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী মনে করা হয়। উদয়নাচার্যের কিরণাবলী বৈশেষিক দর্শনের আর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। শিবাদিত্যের (১৫শ শতাব্দী) সপ্তপদার্থী ও শ্রীধরের (৯ম শতাব্দী) ন্যায়কন্দলী এই দর্শনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এছাড়া আরো অনেক গ্রন্থ আছে। যথা—শ্রীবৎসের ন্যায় লীলাবতী (১১শ শতাব্দী) প্রভৃতি। শঙ্করের উপস্কার বৈশেষিক সূত্রের একটি মূল্যবান ভাষ্য।

বৈশেষিক দর্শন গ্রন্থ।

মীমাংসা

মীমাংসা-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি জৈমিনি। এই দর্শনের ভিত্তি বেদের কর্মকাণ্ড। এই দর্শনের অপর নাম পূর্বমীমাংসা। জৈমিনির আবির্ভাবকাল খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক বলে গবেষকগণ মনে করেন।

মীমাংসা-দর্শন ঈশ্বর ও ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টারূপে স্বীকার করে না। এইমতে জীবের সৃষ্টি হয় জীবের কর্মফল অনুসারে পদার্থ সংযোগে। এখানে বেদকে অনাদি অভ্রান্ত সত্য বলা হয়। বৈদিক কর্মানুষ্ঠানই ধর্ম ও বেদবিরূদ্ধ কর্ম অধর্ম। এই মতে বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের ফলে জীবের বন্ধন মুক্তি হয় ও মৃত্যুর পর মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। এখানে আত্মা শাশ্বত—এর জন্ম মৃত্যু নেই। আত্মার ধর্ম চৈতন্য নয়, দেহাশ্রয়ী আত্মায় চৈতন্য সঞ্চারিত হয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিষয় সংযোগ ঘটলে।

প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি—জ্ঞানের এই পাঁচটি প্রমাণ মীমাংসা দর্শন স্বীকার করে। অনুপলব্ধি নামে আর একটি বেশি প্রমাণ কুমারিল ভট্ট প্রবর্ত্তিত শাখায় স্বীকার করা হয়।

অনেকে মনে করেন মীমাংসামত ন্যায় ও যোগমতের পরে প্রবর্ত্তিত। শবরস্বামীকৃত মীমাংসা-সূত্রের ভাষ্য এই দর্শনের প্রাচান গ্রন্থ।

তন্ত্রটীকা, বৃহট্টীকা, শ্লোকবার্ত্তিক, তন্ত্রবার্ত্তিক, টুপ্‌টীকা—প্রভৃতি মীমাংসাদর্শনের ওপর টীকা গ্রন্থ রচনা করেন এই শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ আচার্য্য কুমারিল ভট্ট (৬১০—৭০০ খৃষ্টাব্দ)। খণ্ডনমিশ্রের (৬০০—৭৫০ খৃঃ অঃ) মীমাংসানুক্রমিকা, বিধিবিবেক, ভাবনাবিবেক, বিভ্রমবিবেক, বাচস্পতিমিশ্রের (৮০০—৯০০ খৃঃ অঃ) ন্যায়কণিকা, সুচরিত-

অন্যান্য গ্রন্থ

মিশ্রকৃত (১০০০—৪১০ খৃঃ অঃ) কুমারিল-রচিত শ্লোকবার্ত্তিকের টীকা কাশিকা, পার্থসারথি মিশ্রের

ন্যায়-রত্নমালা, শাস্ত্রদীপিকা ও শ্লোকবর্ত্তিকের টীকা ন্যায়রত্নাকর প্রভৃতি মীমাংসাশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ ও টীকা উল্লেখযোগ্য।

বেদান্ত

বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি বেদের জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদ্। এর অপর নাম উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মমীমাংসা। বাদরায়ন-কৃত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র প্রাচীনতম প্রধান গ্রন্থ। আচার্য্য শঙ্কর-রচিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, বাচষ্পতিমিশ্রের শাঙ্করভাষ্য-টীকা 'ভামতী'-, অমলানন্দের বেদান্তকল্পতরু ও অপ্যয়দীক্ষিতের 'বেদান্ত-কল্পতরুপরিমল'—বেদান্তদর্শনের অতিশয় প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাছাড়া বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা, চিৎসুখী, অদ্বৈতসিদ্ধি, খণ্ডনপ্রতিপাদ্য প্রভৃতি বহুগ্রন্থ বেদান্ত শাস্ত্রের ওপর রচিত হয়েছে।

উপনিষদের শিক্ষাই বেদান্ত যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে। এই মতে জগতে একমাত্র সত্যবস্তু ব্রহ্ম, এই বিশ্বজগৎ এক ব্রহ্মের প্রকাশ মাত্র। সর্বং ব্রহ্মময় জগৎ, সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়। তিনিই সত্য, চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ, তিনি পরমাত্মা। এক ব্রহ্ম বহুর মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেন। (ব্রহ্ম যে শক্তির সহায়তায় এই জগৎ সৃজন করেন তাহার নাম মায়া।) এই সৃষ্টজগতে যে ভেদজ্ঞান, ব্রহ্ম থেকে যে ভিন্নবোধ এটি ভ্রমমাত্র, একেই বলা হয় মায়া অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান। অজ্ঞান বা অবিদ্যা এই ভ্রম জন্মায় সত্যজ্ঞানের

উদ্ভাসন, ব্রহ্ম থেকে জগতের পৃথকবোধ নিরসন ও চৈতন্যময় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মীভবনই জীবের মোক্ষ বা মুক্তিলাভ, চরমপ্রাপ্তি। এই অবস্থা জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি। একেই বলা হয় অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ দুই-নেই। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জীবে ব্রহ্মে কোনো ভেদ নেই, ভেদজ্ঞান মিথ্যা, মায়ার প্রভাবজাত, সত্যজ্ঞানের উদ্বোধনে মিথ্যা ভেদজ্ঞানের উচ্ছেদ ও জীবের ব্রহ্মে একীভবন। উপনিষদের এই একত্ববাদকেই বেদান্ত প্রমাণ করে। বিশ্বজগৎ যতদিন সত্য বলে মনে হয়, ততদিন এর স্রষ্টা ঈশ্বর জীবের কাছে সগুণ আর যখন জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য,—এই বোধ জন্মে তখন ব্রহ্ম নির্গুণ। শঙ্করাচার্য্যের মত এইরকম।

বেদান্তের ছায়ায় অনেকগুলি মতবাদ পরবর্ত্তীকালে সৃষ্টি হয় ; যেমন—মাধবাচার্য্যের দ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভাস্কর ও নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদ, গৌরীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, প্রভৃতি।

নাস্তিক দর্শন

চার্বাক-দর্শন জড়বাদী। চার্বাক এই মতবাদের প্রবর্ত্তক বলে এর নাম চার্বাকদর্শন—অনেকে এই বিশ্বাস করেন। এই মতে জ্ঞানের প্রমাণরূপে একমাত্র প্রত্যক্ষকে স্বীকার করা

চার্বাক

হয়েছে। বেদবাক্য বা অন্য প্রমাণ চার্বাক স্বীকার করে না। জড় পঞ্চমহাভূতের সম্মিলনে সৃষ্টি, চৈতন্য মহাভূতের সংমিশ্রণের ফল। এমতে

মোক্ষ বলে কিছু নেই। একমাত্র মৃত্যুই সকল সুখদুঃখ ভোগের হাত থেকে মুক্তি দেয়। চার্বাক দেহবাদী, দেহের শেষে সব শেষ।

জৈনদর্শন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্যকে জ্ঞানের প্রমাণ বলে মেনে নিয়েছে। এই মতে যত চেতন পদার্থ তত আত্মা, বিশ্বের সকল বস্তুতেই আত্মা আছে তবে সব আত্মার চেতনাশক্তি একরকম নয়। কর্ম আত্মার শক্তিকে আচ্ছন্ন করে। কর্মত্যাগ হলে আত্মা বন্ধনমুক্ত হয়। জৈনগণ ঈশ্বর মানেন না।

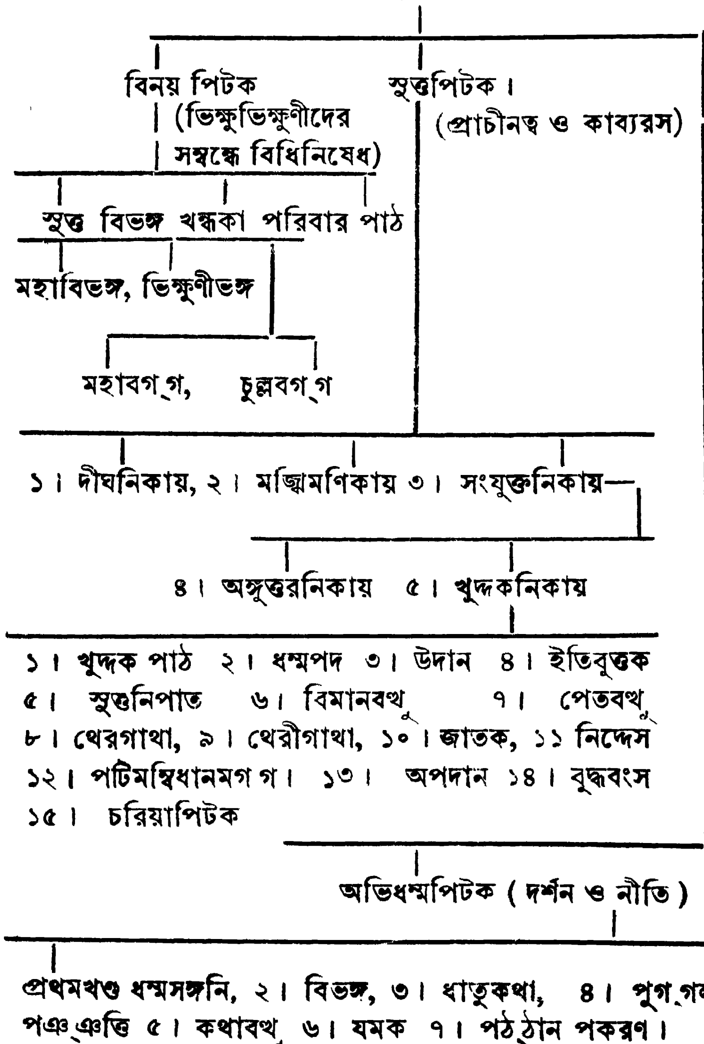
জৈন

বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশগুলি বৌদ্ধ দর্শনের ভিত্তি। বুদ্ধদেব চারটি সত্য উপলব্ধি করে প্রচার করেন, যথা—দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি ও দুঃখনিবৃত্তির উপায়। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা জীব দুঃখের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে। দুঃখনিবৃত্তির আটটি উপায়; যথা—সম্যগ্‌দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যগ্‌বাক্, সম্যক্‌কর্মান্ত, সম্যগ্‌জীব, সম্যগ্‌ব্যায়াম, সম্যক্‌স্মৃতি, সম্যক্‌সমাধি। দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতিই হল নির্বাণ বা মোক্ষ। আত্মা বা ঈশ্বর বৌদ্ধদর্শনে স্বীকার করা হয়নি।

বৌদ্ধ

পালি সাহিত্য [দিগদর্শিকা]

(এর অধিকাংশ রচনা সিংহলের)



অন্যান্য পালিগ্রন্থ ঃ—

১। মিলিন্দ পঞ্‌হ (রচনাস্থান ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত)

২। নেত্তিপকরণ (বুদ্ধোপদিষ্ট সত্যধর্মের আলোচনা) —রচয়িতা বুদ্ধশিষ্য মহাকচ্‌চায়নক।

৩। নিদানকথা (বুদ্ধের জীবনকাহিনী), এর তিনটি ভাগ।

১। দূরে নিদান—সুমেধ বুদ্ধ থেকে তুসিত দেবতাদের গৃহে জন্ম পর্যন্ত কাহিনী।

২। অবিদূরে নিদান—এর পর বোধিলাভ পর্যন্ত জীবনকাহিনী।

৩। সন্তিকে নিদান—বোধিপ্রাপ্তি থেকে অনাথ-পিণ্ডিকের বণিকদের দান পর্যন্ত ঘটনা।

৪। বিসুদ্ধিমগ্‌গ—রচয়িতা বুদ্ধঘোষ, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির লেখক।

সমন্ত পাসাদিকা (বিনয়পিটকের টীকা), সুমঙ্গল বিনাসিনী (দীঘনিকায়ের টীকা), পপঞ্চসুদনী (মজ্ঝি-মনিকায়ের টীকা), সারত্থপাকাসিনী (সংযুক্তনিকায়ের টীকা), মনোরথপুরবী (অঙ্গুত্তরনিকায়)

ইনি বৌদ্ধধর্মে অনেক নতুন মৌলিক জিনিস দান করেছেন। তিনি এক জন বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন।

৫। দীপবংশ—বিক্ষিপ্ত কাহিনীর কাব্যায়ন (৪-৫ শতাব্দী)

৬। মহাবংশ—বৃহৎ মহাকাব্য, কবি—মহানাম, খৃঃ পঞ্চমশতাব্দী। গ্রন্থটি বেশ কাব্যরসসুরভিত।

৭। বোধিবংশ—গদ্য গ্রন্থ। লেখক—ভিক্ষু উপতিস্‌স। খৃঃ একাদশ শতাব্দী।

৮। দাঠাবংশ—৫ সর্গের মহাকাব্য। লেখক—ধম্মভিত্তি—১৩শ শতাব্দী।

৯। থূপবংশ—(স্তূপের ইতিহাস) লেখক—বাচিস্‌সর, ১৩ শতাব্দী।

পালিসাহিত্য

পালিভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত সম্রাট অশোকের অনুশাসন লিপিতে। এই ভাষা তৎকালে জনসমাজে প্রচলিত কথ্যভাষা ও সংস্কৃতের মিশ্রিত রূপ। অশোকের এক শতাব্দী পরে মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী বাণিজ্য ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে নানা কাজে আগত নানাদেশের লোকের চলতি ভাষা মিশ্রিত হয়ে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে এই অভিনব ভাষা বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচারলাভ করে। তাঁরা এই ভাষাকে সংস্কৃতের মিশ্রণে মার্জিত করে নিয়ে এই ভাষাতেই নিজেদের শাস্ত্র রচনা করেন।

তাই সাধারণভাবে বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটক' যে ভাষায় লেখা তাকে পালি বলা হয়। ভগবান বুদ্ধ মগধবাসী ছিলেন এবং মগধের ভাষা মাগধী। কালক্রমে মাগধী অর্ধমাগধী নামে

অভিহিত। বুদ্ধদেবের মাতৃভাষা ছিল এই প্রাচীন অর্ধমাগধী। বুদ্ধদেব তাঁর উপদেশ এই ভাষাতেই দিতেন। এই ভাষাই পালি বলে পরিচিত হয়। সম্ভবতঃ বুদ্ধের বচনগুলি অনেকদিন ধরে এই ভাষাতেই সংগৃহীত হতে থাকে। ৪৮৩ খৃঃ পূর্বাব্দে বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ রাজগৃহে এক সম্মেলনে সমবেত হয়ে প্রথম বুদ্ধবচন সঙ্কলন করেন। কাল-ক্রমে সংগ্রহ বাড়তে থাকে ও বুদ্ধশিষ্যরা তাঁর বচন ব্যাখ্যা করে অনেক গ্রন্থ লিখতে থাকেন। প্রথম বৌদ্ধ সম্মেলনের একশ বছর পর যখন বৈশালীতে দ্বিতীয় সম্মেলন হয় তখন বৌদ্ধধর্মে নানা মত গড়ে উঠেছে। সম্রাট অশোকের রাজত্ব-কালে (২৬৪—২৬৭ খৃঃ পূর্বাব্দ) তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন হয়। ইতিমধ্যে বৌদ্ধধর্মে মহাসাঙ্ঘিক ও থেরবাদী নামে দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। "অশোকের পুত্র মহেন্দ্র থেরবাদী বৌদ্ধশাস্ত্র সিংহলে প্রচার করিয়াছিলেন। সিংহলে সেই শাস্ত্র দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে যে রূপ লইয়াছিল তাহাই পালিসাহিত্যের প্রাচীন স্তর।……তবে অশোকের ভাবরা অনুশাসনে ভিক্খু-ভিক্খুনীদের অবশ্য পাঠ্য বলিয়া যে কয়টি 'সুত্ত' উল্লিখিত আছে তাহার ভাষা পালির মতোই। কিন্তু পালিসাহিত্যের কোন পুঁথি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নাই।… ভারতবর্ষে পালি যখনই আসুক তাহা সিংহল হইতে প্রচারিত হইয়া চীনে গিয়া সেখান হইতে আসিয়াছিল।"[১]

১। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ডাঃ সুকুমার সেন

Geiger সাহেবের মতে পালি অনেকগুলি প্রাচীন প্রাকৃতভাষার মিশ্রিত রূপ।

সে যাই হোক, এই ভাষাতেই লিখিত বৌদ্ধদের প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ ত্রিপিটক (তিপিটক)। পিটক অর্থে রত্নের আধার। বিনয়পিটক, সুত্তপিটক ও অভিধম্মপিটক—এই তিনটি পিটক একত্রে ত্রিপিটক।

বিনয়পিটকের বিষয়বস্তু হল,—বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের পালনীয় ধর্মকর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিয়ম-নির্দেশ ও অপালনে প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি। এই গ্রন্থের খন্ধকা অংশে আছে বৌদ্ধ সঙ্ঘ সংগঠনের নিয়মাবলী ও ভিক্ষুগণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বিবরণী। তাছাড়া এখানে গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে কতকগুলি ব্যাধির নিরাময়কর ঔষধের ব্যবস্থা আছে। বিনয়পিটকের শেষ 'পরিবার' অংশ প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির কিছু আলোক-সম্পাত করে।

সুত্তপিটকে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশিষ্যগণের সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া এই গ্রন্থটি পালিসাহিত্যে যথেষ্ট কাব্যগুণসমৃদ্ধ। বিশেষভাবে এই গ্রন্থের অন্তর্গত খুদ্দক-নিকায়ের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রাচীনতা ও কাব্যরস—উভয়েরই পরিচয় দেয়, যথা,—ধম্মপদ, সুত্তনিপাত, থেরগাথা, থেরীগাথা, উদান ও জাতক।

সুত্তপিটকের পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে খুদ্দকনিকায়ের কাব্য-মূল্য সকলের থেকে বেশি। এর অধিকাংশই পদ্য। এখানে

প্রথম শূন্যতার আলোচনা পাওয়া যায়, যেটি পরে বৌদ্ধদের একটি দার্শনিক তত্ত্বে পরিণত হয়েছে।

এই নিকায়ের অন্তর্গত বৌদ্ধদের সর্বাপেক্ষা আদরণীয় ও অত্যাবশকীয় ধম্মপদ গ্রন্থটিতে বুদ্ধদেবের সদুপদেশগুলি গদ্যে লিপিবদ্ধ। এখানকার সর্ববিষয় বৌদ্ধধর্মগত নয়, এখানে সমসাময়িক কালের অনেক ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও অনেক বাস্তব অভিজ্ঞাতালব্ধ জ্ঞানের কথা আছে। এই গ্রন্থের সদুক্তিগুলি জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল দেশের সকল মানুষের হিতকারী। পালি, প্রাকৃত, মিশ্রসংস্কৃত, সংস্কৃত, চীনা এই পাঁচটি ভাষায় লেখা এই গ্রন্থের পাঁচটি রূপ পাওয়া গেছে। এর দ্বারাই এই গ্রন্থটির সমাদর ও ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এটি ইংরাজিতে অনূদিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিতে মোট ৪২৩টি পদ্য ও ২৬টি বগ্‌গ।

সুত্তনিপাত গ্রন্থটি খুদ্দনিকায়ের অন্তর্গত। এখানে তিয়াত্তরটি সুত্ত (সূত্র) আছে। ধম্মপদের পরই কাব্যগ্রন্থরূপে এটির স্থান। এই গ্রন্থে ঋগ্বেদের কথোপকথনাত্মক আখ্যানের মতো দু'একটি আখ্যানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যেমন,—ধনিয়-সুত্ত, নালকসুত্ত ও পবজ্জাসুত্ত প্রভৃতি। এই গ্রন্থে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মমতের অনেক তথ্য জানা যায়।

থেরগাথা ও থেরীগাথা গ্রন্থ দুটি ধর্মতত্ত্ব ও কাব্যের একত্র মিশ্রণে এক অভিনবরূপ লাভ করেছে। প্রাচীন গীতিকাব্যরূপে এদের যথেষ্ট সমাদর। থেরগাথা বৌদ্ধভিক্ষুদের রচনা আর থেরীগাথা বৌদ্ধভিক্ষুণীদের। থেরী গাথাতে

ভিক্ষুণীদের ব্যক্তিগত জীবনের বাইরের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয় কিছু জানা যায় অথচ থেরগাথায় ভিক্ষুদের আন্তর অনুভূতির পরিচয় পাই। সে সময়ে সমাজে স্ত্রীলোকদের কতখানি স্থান ছিল সে সম্বন্ধেও এখানে কিছু কিছু তথ্য আছে। এছাড়া গ্রন্থটি কাব্যহিসাবে যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারী।

জাতক—এখানে বুদ্ধদেবের পূর্ব পূর্ব জন্মের অনেক কাহিনী আছে। জাতকে যেসব গল্প আছে, এগুলি এই গ্রন্থে সংগৃহীত হওয়ার আগে নীতি গল্পের আকারে জনসমাজে লোকমুখে প্রচলিত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। এখানকার কয়েকটি গল্পের সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের গল্পের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। হয়তো পঞ্চতন্ত্রের অনেক গল্পের উৎস জাতকের অনেক গল্প। জাতক নানাশ্রেণীর গল্পে পূর্ণ; যেমন—প্রাচীন কাহিনী, পরীর গল্প, অভিযানবিষয়ক কাহিনী, নীতি ও ধর্মমূলক কাহিনী। জাতকে গদ্য পদ্য দু'-এরই ব্যবহার করা হয়েছে। জাতকের অনেক গল্পের সূত্র বৈদিক যুগ পর্যন্ত। এমন কি এগুলি পরবর্ত্তীকালের পদ্যকাব্যের আদিমরূপ বলে অনেকে মনে করেন। শুধু সাহিত্যশিল্পরূপেই নয় সভ্যতার ইতিহাসে জাতকের অসাধারণ মূল্য আছে।[১]

অভিধম্মপিটক—এর সাতটি খণ্ড, যথা—ধম্মসঙ্গনি, বিভঙ্গ ধাতুকথা, পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি, কথাবত্থু, প্রশ্নগ্রন্থ ও পকরণ।

ধম্মসঙ্গনি—বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। **বিভঙ্গ**—খণ্ডে বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব ও জ্ঞানবিষয়ে

১। Hist of Lit—Winternitz. Vol II.

আলোচনা আছে। কথাবত্থু—বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি আবশ্যকীয় গ্রন্থ।

অন্যান্য পালিগ্রন্থ :—

নিদানকথা—একটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থটি খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত বুদ্ধঘোষ রচনা করেন। এটি গদ্যপদ্য মিশ্রিত রচনা। বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী এর মূল বিষয়। বুদ্ধঘোষ আরো অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন, যথা :—বিসুদ্ধিমগ্গো, সমন্তপাসাদিকা, সুমঙ্গলবিলাসিনী, পপঞ্চসূদনী, সাবত্থপাকাসিনী, মনোরথপূরণী প্রভৃতি। বুদ্ধ ঘোষের বৌদ্ধশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল বৌদ্ধদর্শনে তিনি অনেক নতুন জিনিস দান করেছেন। সুপণ্ডিত ও দার্শনিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যামদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

মহাবংশ—এটি একটি বৃহৎ মহাকাব্য। এটি রচনা করেন পঞ্চম শতাব্দীর কবি মহানাম। গ্রন্থটির কাব্যমূল্য সুধীসমাজে স্বীকৃত। এখানে অশোক ও বিজয়সিংহের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে, তবে এর ঐতিহাসিকতা কম।

কালক্রমে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দুইটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে—মহাযান ও হীনযান। সকল মানুষের দুঃখনিবৃত্তি ও নির্বাণলাভ—যাদের জীবনাদর্শ তারা মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত আর যাদের লক্ষ্য ব্যষ্টির দুঃখমুক্তি ও নির্বাণ, তারা হীনযান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। Winternitz বলেছেন মহাযানীদের

দার্শনিক মত ব্রাহ্মণ্য দর্শনের প্রভাবে হীনযানীদের ধর্মমতের বিস্তৃতিমাত্র।

...The philosophical side of the Mahayana is merely an elaboration of the Hinayana doctrines under the influence of Brahmanical Philosophy. [১]

পালিসাহিত্য ছাড়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রচিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। সেগুলি সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডে কালিদাস পূর্ব বৌদ্ধসাহিত্য অংশে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে, তাই এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

প্রাকৃত-অভ্রপংশ সাহিত্য

প্রাকৃতভাষার উৎপত্তি ও মৌলিকতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। কারও মতে 'প্রাকৃত' শব্দের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কথ্যভাষাকে বোঝায়। একদিকে প্রাচীন বৈদিক ভাষাই সে যুগে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আস্তে আস্তে প্রাকৃতে রূপান্তরিত হয় এবং অপরদিকে এই বৈদিক ভাষাই পরবর্তীকালে ব্যাকরণের পরিমার্জনে সংস্কৃত হয়ে 'সংস্কৃত' নামে অভিহিত হয়।

ভারতবর্ষীয় বৈয়াকরণিকগণের ব্যাখ্যানুসারে সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের উৎপত্তি।[২] প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণগুলি সব সংস্কৃতে রচিত। এই ভাষার ব্যাকরণ রচয়িতারা সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন।

১। Hist of Lit—Winternitz.

২। প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতম্—সিদ্ধ হেমচন্দ্র।

তাঁদের সংস্কৃতের ওপর অধিক আস্থা থাকার ফলে সংস্কৃতকেই তাঁরা প্রকৃতি বা মূলভাষা মনে করেছেন।

এইরকম পরস্পর মত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃত ভাষার আকৃতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে এই ভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত না হলেও সংস্কৃত থেকে বিকৃত এবং সেই কারণে এই ভাষা সেই প্রাচীন যুগে জনসাধারণের মধ্যে কথ্য ভাষারূপে প্রচলিত থাকারই বেশি সম্ভাবনা। মধ্যভারতীয় আর্যভাষা শব্দের দ্বারা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাচীনকালে বিভিন্ন স্থানের জনগণের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন কথ্যভাষাকেই বোঝান এবং সেগুলিই পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ নামে পরিচিত।

কালানুসারে প্রাকৃতের তিনভাগ—প্রাচীন, মধ্য ও অন্ত-প্রাকৃত। পালি প্রাচীন, অপভ্রংশ অন্ত আর প্রাকৃত বলতে মধ্যপ্রাকৃতকেই বোঝায়। এখানে মধ্য ও অন্ত প্রাকৃতের আলোচনা সংক্ষেপে করা হবে। নানাশ্রেণীর প্রাকৃতের পরিচয় ও নাম পাওয়া যায়, যেমন—মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, অপভ্রংশ এবং পালিও এদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাকৃতের প্রাচীনতম নিদর্শন অশোকের অনুশাসনের ভাষা। এখানকার ভাষাকে নিয়া প্রাকৃত, খরোষ্ঠী প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হলেও আসলে এই ভাষা প্রাকৃতই।

অশোকের সময় থেকেই প্রাকৃতভাষার লিখিতরূপ পাওয়া যায়। সুতরাং এর উৎপত্তি সময় আরো অনেক আগে মনে

করা যেতে পারে, যখন শুধু এভাষা মানুষের মুখের ভাষাই ছিল। সংস্কৃতের পরিমার্জনে এই ভাষাই আস্তে আস্তে লিখিত ভাষায় পরিণত হয় ও কালক্রমে এতে অনেক সাহিত্যও সৃষ্টি হয়। বররুচি, হেমচন্দ্র প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষার বৈয়াকরণিকগণ অনেকগুলি প্রাকৃতের নাম করেছেন। যেমন—মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, চূলিকাপৈশাচী ও অপভ্রংশ। এইগুলি প্রধান। অন্যান্য আরো অনেক প্রাকৃতের নাম পাওয়া যায়।

বররুচিরচিত প্রাকৃতপ্রকাশ প্রাকৃতভাষার প্রাচীনতম ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণের তিন ভাগ মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের আলোচনায় পূর্ণ। পরবর্ত্তী অংশে পৈশাচী, মাগধী ও শৌরসেনী প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এই গ্রন্থটি প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ হিসাবে অত্যন্ত প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য। আরো আটখানি প্রাকৃত ভাষার উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণ আছে।

প্রাকৃতভাষা কালক্রমে সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয়ে সাহিত্যরূপে যথেষ্ট গৌরব ও প্রশংসালাভ করে। রাজশেখর তাঁর কর্পূরমঞ্জরীতে (প্রাকৃতরচনা) বলেছেন—সংস্কৃত ভাষা কর্কশ আর প্রাকৃতভাষা সুকোমল। নারী ও পুরুষে যে পার্থক্য, সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে সেইরকম পার্থক্য।[২]

সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় প্রাকৃত সাহিত্যের বিস্তৃতি

২। পরুসা সক্কয়বন্ধা পাউসবন্ধো বিহোই সুউমারো।
পুরুস-মহিলাণং জেত্তিঅ-মিহন্তরং তেত্তিঅ মিমানং ॥

অনেক কম হলেও প্রাকৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত কম নয় এবং এদের মধ্যে কতকগুলি বেশ সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ।

কেউ কেউ মনে করেন প্রাকৃত সংস্কৃত থেকে প্রাচীনতর। তাঁদের মতে রামায়ণ মহাভারত প্রথমে প্রাকৃতে রচিত, পরে সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্য প্রাকৃত সাহিত্যের অনুসরণ করে। হালের গাথা সত্তশঈ সংস্কৃত গীতিকাব্যের পথপ্রদর্শক।

প্রাচীনত্ব

কিন্তু এ মত মেনে নেওয়া হয়নি। বরং এরকম মনে হয় যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য একসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠেছে।

শিলালিপি (প্রাচীন স্তর)

প্রাকৃতের প্রাচীনস্তরের নিদর্শন শিলালিপিগুলি। এর তিনটি ভাগ—

১। উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাহবাজগড়ী ও মান্‌সেহ্‌রা অনুশাসন। এগুলির খরোষ্ঠীলিপি, বাকিগুলির ব্রাহ্মীলিপি।

২। পূর্বভারতের কালসী, ধোলী, জৌগড় ও অন্যান্য অনুশাসন।

৩। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের গির্ণার অনুশাসন।

এগুলি ছাড়া রামগড় পর্বতের যোগীমারা গুহালিপি, যোধপুরের একটি লিপি, উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার শিলালিপি, উড়িষ্যার খারবেল শিলালিপি, তক্ষশীলার শিলালেখ, উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর ও বস্তীজেলার শিলালেখ প্রাচীন প্রাকৃত সাহিত্যের নিদর্শনরূপে গণনা করা হয়।

প্রাকৃত (মধ্যস্তর)—খৃঃ পূঃ ২০০ থেকে ৬০০ খৃষ্টাব্দ। এই স্তরের প্রাকৃত সাহিত্যের নিদর্শন—তক্ষশীলার কলওয়ান প্রস্তলিপি, খরোষ্ঠী লিপির ধম্মপদ ও অশ্বঘোষের নাটক। এর পরবর্ত্তী প্রাকৃতের নিদর্শন—শক, কুষাণ সম্রাটগণের খরোষ্ঠী প্রস্তলিপি। এর পরই যে প্রাকৃতসাহিত্য, তা বৌদ্ধগণের সংস্কৃত-মিশ্রিত রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ।

অপভ্রংশ (তৃতীয় স্তর)

প্রাকৃতের পরবর্ত্তী স্তর অপভ্রংশ। এভাষা সেই প্রাচীন কালের জনসাধারণের ভাষা। এই ভাষাই আস্তে আস্তে বিভিন্ন দেশের প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়।

প্রাকৃত কাব্য

প্রাকৃত কাব্যগুলি ঠিক সংস্কৃতকাব্যের লক্ষণযুক্ত না হলেও এখানে কাব্যগুণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাকৃত কাব্যের বহু গ্রন্থ বর্ত্তমানে লুপ্ত। তবে অনেক নাম জানা যায় মাত্র ; এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণাঢ্যের 'বৃহৎ-কথা'। গ্রন্থটির ভাষা পৈশাচী প্রাকৃত। বর্ত্তমানে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু, গল্প, কাহিনী প্রভৃতি তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে ; যেমন—(১) বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ, (২) ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, (৩) সোমদেবের কথাসরিৎ-সাগর।

মহাকাব্য

রাবণবহো বা সেতুবন্ধ—পঞ্চম ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে প্রবরসেন-রচিত প্রাচীনতম প্রাকৃত মহাকাব্য। রামায়ণের কাহিনী এর বর্ণনীয় বিষয়। নানা অলঙ্কার মিশ্রণে কাব্যটি মনোহর।

গউড়বহো—বাকপতিরাজ (৭৫০ খৃঃ) এই ঐতিহাসিক কাব্যটির রচয়িতা। এর ভাষা প্রাকৃত ও অলঙ্কারবহুল। এখানে কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা যশোবর্মণের প্রশস্তি করেছেন।

লীলাবঈ কথা—কোউহল রচিত অপর একটি সরস মহাকাব্য। এটির রচনাকাল আটশ খৃষ্টাব্দ, ভাষা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত। সিংহলের রাজা শীলামেঘের কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা সাতবাহনের বিবাহ-কাহিনী—গ্রন্থটির মূল বর্ণনীয় বিষয়। এর ভাষা সহজ ও সুখপাঠ্য।

জসহরচরিউ ও নায়কুমার চরিউ—অপভ্রংশ ভাষার দুটি কাব্য, রচয়িতা পুষ্পদন্ত। লেখক দশম শতাব্দীর লোক বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। জসহরচরিউ-র উপজীব্য রাজা যশোধরের কাহিনী আর নায়কুমার-চরিউ জৈন নাগকুমারের কাহিনীর কাব্যায়ন।

ভরিসয়ত্তকহা—ধনপাল-রচিত (খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী) একটি সরস মহাকাব্য। পঞ্চমীব্রতের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন এর প্রধান উদ্দেশ্য। ভবিষ্যদত্তের স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলন বর্ণনা এর আখ্যানাংশ। গ্রন্থটির ভাষা অপভ্রংশ।

করকণ্ডচরিউ—নয়নন্দী (১০৪৪ খৃঃ) রচিত আর একটি কাব্য। কুমারপালচরিত—আটসর্গে রচিত একটি মহাকাব্য। এর রচয়িতা জৈনাচার্য হেমচন্দ্র (১০৮৮—১১৭২ খৃঃ)। হৈমানু-শাসনম্ নামক একটি প্রাকৃত ব্যাকরণের উদাহরণরূপে লিখিত। এখানে রাজা কুমারপালের রাজধানীর ঐশ্বর্য, জৈনমন্দিরের গৌরব, প্রজাদের জৈনধর্মানুরাগ প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

সুরসুন্দরীচরিতম্—প্রাকৃত মহাকাব্যটি একাদশ শতকের শেষার্ধে আবির্ভূত ধনেশ্বর, রচিত।

কংসবহো ও উসাণিরুদ্ধ—মহাকাব্য ছুটি রচনা করেন রামপাণিবাদ (১৮শ খৃঃ)। এছুটি যথেষ্ট কাব্যগুণসমৃদ্ধ।

গীতিকাব্য

হালের 'গাথা-সপ্তশতী' প্রাকৃত গীতিকবিতার অতি মূল্যবান সংগ্রহ গ্রন্থ। হালের সঠিক সময় পাওয়া যায়না। কারও মতে তিনি প্রথম শতকের, আবার কেউ তাঁর আবির্ভাব-কালকে নিয়ে যান তৃতীয় শতকে। হাল ছিলেন দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা, তবে ইনি গ্রন্থ-রচয়িতা কিনা বলা মুস্কিল। কারণ শিলালিপিতে একাধিক হালের উল্লেখ আছে। সপ্তশতীর শ্লোকগুলি আর্যাছন্দে রচিত। অনেকে এটিকে কোষকাব্যের অন্তর্গত মনে করেন। এই কাব্যটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে মানুষের হৃদয়ানুভূতি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দভাবে অভিব্যক্ত। কাব্যটির শ্লোকগুলি শৃঙ্গাররসাত্মক।

এখানে ধর্মভাব প্রচারের কোন চিহ্ন নেই এবং গ্রন্থটি লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। এই গ্রন্থে সাধারণ মানুষের কামনাবাসনা, আশানিরাশা, স্নেহপ্রেম প্রভৃতি অতিশয় হৃদয়গ্রাহীভাবে চিত্রিত হয়েছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা চিত্তাকর্ষক। অনেকে মনে করেন সংস্কৃত গীতি কবিতার প্রেরণা এই গ্রন্থ। সংস্কৃত কোষ কাব্যেরও আদর্শ এই গাথাসপ্তশতী বলে অনেকের ধারণা। এখানকার রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক অংশের প্রভাব জয়দেবের গীতগোবিন্দ, শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত, রূপগোস্বামীর পদ্যাবলীর ওপর কিছু আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। প্রাকৃতসাহিত্যের ইতিহাসে গাথাসপ্তশতী অমূল্য রত্ন।

ধর্মবিষয়ক কাহিনী অবলম্বনে জৈনসম্প্রদায়ের কবিগণ অনেক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, তাদের মধ্যে, পাদলিপ্তাচার্যরচিত 'তরঙ্গদোলা' উল্লেখযোগ্য। এর ভাষা প্রাকৃত, রচনাকাল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী।

প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যে অনেকগুলি নীতিমূলক গীতিকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। জিনদত্ত সূরি এই শ্রেণীর তিনখানি কাব্য রচনা করেন। তাঁর সময় ১০৭৫ খৃঃ থেকে ১১৫০ খৃষ্টাব্দ। এঁর গুরু জিনবল্লভসূরি 'চচ্চরী' নামে একটি স্তুতিমূলক ও উপদেশরসায়নসার নামক একটি নীতিমূলক কাব্য রচনা করেন। গণধরসার্ধশতকম্ ও সুগুরুপারতন্ত্র্যম্— নামে ইনি আরো দুটি গ্রন্থের রচয়িতা।

তীর্থকল্প নামে একখানি অর্ধ-ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা

করেন জিনপ্রভসূরি। এই গ্রন্থে বহু জৈন তীর্থস্থান ও তার প্রতিষ্ঠাতার কথা লিপিবদ্ধ আছে। এটির কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও এখানে যথেষ্ট কাল্পনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটির ভাষা মহারাষ্ট্রী ও সংস্কৃত।

ঐতিহাসিক রচনা

প্রাকৃতে জৈনগণরচিত বহু গল্পগ্রন্থ আছে। এগুলি লোকসাহিত্যশ্রেণীর। 'কালকাচার্য-কথানক' প্রাকৃত গদ্য পদ্যে লিখিত কথাসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় গ্রন্থ। গ্রন্থটির লেখকের নাম জানা যায় না। রাজা কালকের জৈনধর্মে দীক্ষাগ্রহণ কাহিনী— এর বর্ণনীয় বিষয়।

গল্প

'কথাকোষ' নামে গ্রন্থটি নানা গল্পকাহিনীর সংকলন। সংকলন-কর্ত্তার নাম শ্রীচন্দ্র (খৃঃ ১০ শতক)। এখানকার শ্লোকগুলি প্রাকৃত আর কিছু অংশ ভাঙা ভাঙা অশুদ্ধ সংস্কৃতরচনা।

সাহিত্যিক প্রাকৃত বলতে মধ্যস্তরের প্রাকৃতকে বোঝায়। বিভিন্ন বৈয়াকরণিকগণ এই ভাষার বহু ব্যাকরণ রচনা করেছেন। তার মধ্যে বররুচি ও হেমচন্দ্রের ব্যাকরণ অধিক প্রসিদ্ধ। এঁরা মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, চুলিকাপিশাচী, অপভ্রংশ প্রভৃতি প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্যবিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই ভাষাগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষার সাহিত্যিকরূপ। এই সাহিত্যিক প্রাকৃত সাহিত্যিক রচনায় সমৃদ্ধ সংস্কৃতের

পাশাপাশি। এই ভাষায় লিখিত সাহিত্যিক গ্রন্থগুলি জনসাধারণের মধ্যে অধিক প্রচার ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। নিম্নে সংক্ষেপে এই ভাষায় লিখিত রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হল।

জৈনরচনা

প্রাকৃত সাহিত্যে বিশেষভাবে জৈনসম্প্রদায়ের লেখকদের দানই বেশি। জৈন আগম-সাহিত্য এই ভাষাতেই রচিত। জৈনদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। এই দুই সম্প্রদায়েরই আগমগ্রন্থ আছে। এদের মধ্যে শ্বেতাম্বর আগম গ্রন্থগুলি অধিক পরিচিত।

জৈন সিদ্ধান্ত বা আগম গ্রন্থগুলি আর্ষ প্রাকৃত (অর্ধমাগধী) ভাষায় লিখিত। শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের রচিত ৪৫—৫০টি আগম বা সিদ্ধান্ত গ্রন্থের নাম জানা যায়।[১] এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলিকে ছভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) দ্বাদশাঙ্গ (২) দ্বাদশ উপাঙ্গ (উবঙ্গ) (৩) দশ প্রকীর্ণ (দশ পইন্ন) (৪) ষট ছেদসূত্র (ছেদসুত্ত) (৫) চার মূলসূত্র (৬) অন্য দুটি গ্রন্থ—নন্দীসূত্র (নন্দীসূও), অনুযোগদ্বার (অনুওগদ্বার)।

এই সমস্ত গ্রন্থ এক সময়ের রচনা নয়। রচনা আরম্ভ থেকে সমাপ্তিতে বেশ সময় অতিবাহিত হয়েছে বলে মনে হয়।

পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি শ্রেণীর অনেকগুলি করে গ্রন্থ আছে। জৈনধর্মের মূল তত্ত্বালোচনা আগম বা সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলির মূল

১। Hist of Ind Lit, Vol—II, Winternitz দ্রষ্টব্য।

বিষয়। এগুলির মধ্যে জৈন সন্ন্যাসীদের জীবন যাপন পদ্ধতি, জৈনধর্মাবলম্বীদের আচার ব্যবহার ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতির বিবরণ এবং এই সঙ্গে নানা আখ্যান উপাখ্যান থাকায় গ্রন্থগুলিতে মাঝে মাঝে বেশ সাহিত্যরসেরও পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক কাহিনীর উৎস রামায়ণ মহাভারত। এদের মধ্যে জায়গায় জায়গায় কথোপকথন জাতীয় রচনারও সাক্ষাৎ মেলে।

দিগম্বর সম্প্রদায়ের কতকগুলি নিজস্ব গ্রন্থ আছে বটে তবে এরা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের অনেক বিষয় মেনে নিয়েছে। দিগম্বরদের স্বতন্ত্র গ্রন্থগুলিকে চারভাগে ভাগ করা হয়; যেমন,—(১) প্রথমানুযোগ (২) করণানুযোগ (৩) দ্রব্যানুযোগ (৪) চরণানুযোগ।

প্রথমানুযোগশ্রেণীর গ্রন্থে অনেক পৌরাণিক আখ্যান আছে। ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব করণানুযোগে আলোচনা করা হয়েছে। দ্রব্যানুযোগের আলোচ্যবিষয় দার্শনিক তত্ত্ব, চরণানুযোগে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান।

গ্রন্থ পরিচিতি

কসায়পাহুড়—গুণধরাচার্যরচিত একটি ধর্মগ্রন্থ। রচনার সময় প্রথম বা দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দ। এখানে ক্রোধ প্রভৃতি চারটি কসায় ও হাসি প্রভৃতি নয়টি রাগদ্বেষাদির বিষয়ের প্রকৃতি ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষট্‌খণ্ডাগম—পুষ্পদন্ত ভূতবলিরচিত একটি ধর্মগ্রন্থ। এর ভাষা শৌরসেনী, রচনা-সময়—দ্বিতীয় বা তৃতীয় খৃষ্টাব্দ।

আলোচ্য বিষয় দার্শনিক তত্ত্ব। গ্রন্থটির দুটি খণ্ড। শেষ খণ্ডের নাম মহাবন্ধ। এখানে জীবের নানাপ্রকারের বন্ধন ও তার থেকে মুক্তির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

ত্রিলোকপ্রজ্ঞপ্তি—শ্রীযতিবৃষভাচার্যরচিত অপর ধর্মগ্রন্থ। এখানে বিশ্বের উৎপত্তিতত্ত্ব, জৈনদের পৌরাণিক কাহিনী ও বিভিন্ন মতবাদের বিবরণ পাওয়া যায়।

অন্যান্য শ্রেণীর জৈনরচনা

শ্বেতাম্বর জৈনগণের ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থগুলিকে নির্যুক্তি বলা হয়। এই শ্রেণীর বহু গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। দিগম্বরগণের রচিত এই জাতীয় ব্যাখ্যা গ্রন্থকে চূর্ণিসূত্র বলা হয়। নির্যুক্তি ও চুর্ণিতে কিছু পার্থক্য আছে। পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা নির্যুক্তি আর চূর্ণিতে পাই শব্দ ও সূত্র—দুয়েরই ব্যাখ্যা। চূর্ণির সংখ্যাও কম নয়।

পউমচরিতম্—প্রাচীনতম প্রাকৃত কাব্যের নিদর্শন। রাম-কাহিনী এর মূল বিষয়, ভাষা মহারাষ্ট্রী, সর্গ—১১৮, শ্লোক-সংখ্যা—৯০০০। রামায়ণের আদর্শেই এই গ্রন্থটি রচিত কেবল চরিত্র নামগুলি পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। এস্থানে রাম হয়েছে পদ্ম। গ্রন্থটির রচয়িতা বিমলসূরি। এটিকে জৈন রামায়ণ বলা হয়।

হরিবংশ পুরাণ—কে প্রাকৃত মহাভারত বলা হয়। এর ভাষা অপভ্রংশ, রচনাকাল দশম একাদশ খৃষ্টাব্দ। এতে বলা হয়েছে পাণ্ডবরা সন্ন্যাস গ্রহণ করে নির্বাণলাভ করে। এই

গ্রন্থের সকল চরিত্র হয় জৈন অথবা জৈনমতে আস্থাবান ব্যক্তি।

প্রাকৃতপুরাণ—সংস্কৃত পুরাণের অনুসরণে ও জৈন তীর্থঙ্করদের জীবনী উপজীব্য করে রচিত। এর রচনাসময় খৃঃ আট থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। এই গ্রন্থে তেষট্টিজন জৈন তীর্থঙ্করের জীবনী পাওয়া যায়। গ্রন্থটি প্রাকৃত নাম—তিসট্টিলক্‌খণ মহাপুরাণ।

তেসট্টি-মহাপুরিসগুণালঙ্কার নামে আর একটি দিগম্বর জৈনগণের মহাপুরাণ আছে।

চম্পূ সাহিত্য

কুমারপালচরিত—গদ্যপদ্যমিশ্রিত ভাষায় অনেকগুলি কাহিনীর সংকলন। এটি প্রাকৃত রচনা তবে কিছু অশুদ্ধ সংস্কৃত আছে। গ্রন্থটির সংকলয়িতা সোমপ্রভ। এর রচনাকাল ১১৮৪ খৃষ্টাব্দ।

কথারত্নাকর—নামে গ্রন্থটির সংকলয়িতা হেমবিজয় (১৬০০ খৃষ্টাব্দ)। এখানে ২৫৮টি গল্প আছে। গ্রন্থের অধিকাংশ সংস্কৃত গদ্য কিন্তু শ্লোকগুলি সংস্কৃত ও মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ প্রভৃতি প্রাকৃতে লেখা।

কুবলয়মালা চম্পূ'র রচয়িতা উদ্যোতন (৭৭৮ খৃঃ)। এটি প্রাকৃত সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য রচনা।

গদ্য রচনা

বসুদেবহিণ্ডী—নামে গদ্যগ্রন্থটি রচিত হয় ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে। সঙ্ঘদাস ও ধর্মসেন গণিন গ্রন্থটির রচয়িতা। বাসুদেব ও কৃষ্ণের জীবনকাহিনী এর বিষয়-বস্তু। এখানে সম্মিল্লহিণ্ডি নামে আর একটি কাহিনী আছে।

প্রাকৃত নাটক সংস্কৃত নাটকের লক্ষণানুসারী নয়। এখানকার সব চরিত্রেরই ভাষা প্রাকৃত। আলংকারিকগণের মতে এর নাম 'সট্টক'। রাজশেখর লিখিত 'কর্পূরমঞ্জরী' প্রাকৃত নাটকের (সট্টক) শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই জাতীয় আরো

নাটক

৫টি নাটকের নাম পাওয়া যায়, যেমন—(১) নয়াচন্দ্রের রম্ভামঞ্জরী (১৩৬৫—১৪৭৮ খৃঃ); রুদ্রদাসের চন্দ্রলেখা (১৬৬০ খৃঃ), মার্কণ্ডেয়ের বিলাসবতী (১৭শ খৃঃ), বিশ্বেশ্বরের শৃঙ্গারমঞ্জরী (১৮শ খৃঃ), ঘনশ্যামের আনন্দসুন্দরী (১৭০০—১৭৫০ খৃঃ)।

প্রাকৃত সাহিত্যে রসোপজীব্য কাব্য, গীতিকবিতা, নাটক, গল্প প্রভৃতি যেমন সৃষ্টি হয়েছে তেমনি এই ভাষায় দার্শনিক

জৈন দর্শন

গ্রন্থও লিখিত হয়েছে। জৈনগণই প্রাকৃত ভাষায় দর্শনশাস্ত্র রচনা করেন। উপনিষদের আত্মার অস্তিত্ব ও বৌদ্ধগণের নাস্তিবাদ—এই দুয়ের সমন্বয়ে জৈনগণ এক নূতন দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন—তার নাম স্যাদ্বাদ। এই মতে সমস্ত জড়বস্তু শাশ্বত, এদের সবরকম আকৃতি ও এরা সব গুণের আধার। দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের কুন্দকুন্দ বা কুন্দাচার্য শ্বেতাম্বর জৈনগণেরও শ্রদ্ধার পাত্র। বিভিন্ন গবেষক তাঁর সময় খৃঃ পূঃ প্রথম শতক থেকে ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দ নিয়ে গেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮৩। এগুলিকে 'পহুড়' বলা হয়। আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচনার গ্রন্থকে 'পহুড়' বলা হয়। কুন্দাচার্যের লেখা সাতখানি গ্রন্থমাত্র পাওয়া যায়, এদের মধ্যে প্রধান—পঞ্চাস্তিকায়,

প্রবচনসার, সময়সার, নিয়মসার, ষট্‌প্রাভৃত প্রভৃতি গ্রন্থ।

মূলাচার ও ত্রিবর্ণাচার—গ্রন্থ দুটির রচয়িতা জৈন বট্টক। এদের বিষয়বস্তু চরিত্রগঠন সম্বন্ধে নৈতিক উপদেশ দান। 'কত্তিগেয়াণুপেক্‌খা' (কার্ত্তিকেয়ানুপ্রেক্ষা) গ্রন্থটির রচয়িতা কার্ত্তিকেয় স্বামী। সংসারের কর্মপাশ ছেদনের জন্য জৈন সন্ন্যাসী ও গৃহীর পালনীয় বিষয় বর্ণনা এর প্রধান বক্তব্য।

নেমিচন্দ্র জৈনধর্ম ও দর্শনের পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। যথা—দ্রবসংগ্রহ, গোম্মটসার, লব্ধিসার, ক্ষপণসার, ত্রিলোক-সার।

জীবগণের সংসারে আগমন, স্থিতি, কর্ম ও বন্ধন থেকে জীবের মুক্তি প্রভৃতি বিষয় গোম্মটসারে আলোচনা করা হয়েছে। জীববিয়ার (জীববিচার) শান্তিসূরির (১০৩৯ খৃঃ মৃত্যু) রচিত। এখানে একান্নটি শ্লোকে মুক্ত ও বদ্ধজীবদের প্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে। উদ্ভিদবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, পশুবিজ্ঞান বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা এখানে পাওয়া যায়।

ভবভাবনা নামে গ্রন্থটি ৫৩১ গাথার সমষ্টি, এর রচয়িতা মলধারি হেমচন্দ্র সূরি (১১১৬ খৃঃ)। নামেও বোঝা যায় পুনর্জন্ম আলোচনা এর বিষয়বস্তু। অধ্যাত্মপরীক্ষা নামে এক আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনা গ্রন্থ রচনা করেন যশোবিজয় (সপ্তদশ খৃষ্টাব্দ)।

ধনপাল-রচিত পাইয়লচ্ছীনামমালা ও হেমচন্দ্র প্রণীত দেশী-নামমালা নামে দুটি প্রাকৃত কোষ বা অভিধান গ্রন্থ আছে। ২য়টিতে বহু দেশী শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ আছে।

কোষগ্রন্থ

স্বয়ম্ভুরচিত স্বয়ম্ভুচ্ছন্দ, বিরহাঙ্করচিত বৃত্তজাতাতিসমুচ্চয়। নন্দিতাঢ্যরচিত গাথালক্ষণ, হেমচন্দ্রের ছন্দোনুশাসন-প্রভৃতি প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। পিঙ্গলাচার্য্য—রচিত প্রাকৃতপিঙ্গল অপভ্রংশভাষার একটি অতিশয় মূল্যবান ছন্দো-গ্রন্থ। গ্রন্থকার এখানে মাত্রাবৃত্ত ও বর্ণবৃত্ত এই দুইরকম ছন্দেরই আলোচনা করেছেন ও দুই শ্রেণীর ছন্দের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন।

বররুচির 'প্রাকৃতপ্রকাশ' চণ্ডের 'প্রাকৃত লক্ষণ,' হেমচন্দ্রের 'সিদ্ধহৈমশব্দানুশাসন' প্রভৃতি প্রাকৃতভাষার অনেকগুলি ব্যাকরণআছে। প্রাকৃত ভাষায় জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রের কিছু গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। দুর্গদেবাচার্যের 'রিষ্টসমুচ্চয়' উল্লেখযোগ্য জ্যোতিষ গ্রন্থ।

বিশেষভাবে জৈন সম্প্রদায়ের সাহিত্যসাধনায় প্রাকৃত সাহিত্য সাহিত্য-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে।

কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

অর্থশাস্ত্র—ভারতীয় রাজনীতিবিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ। রচয়িতা চাণক্য কৌটিল্য নামে পরিচিত। (৩০০ খৃঃ পূঃ)

অলংকার-সর্বস্ব—কাশ্মীরবাসী রয্যকরচিত সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। সময়—ত্রয়োদশ শতক।

অনর্ঘরাঘব—মুরারিরচিত একটি সপ্তাঙ্ক নাটক। রামায়ণের কাহিনী নাটকটি মূল উপজীব্য। সময়—৮ম খৃষ্টাব্দের শেষ বা ৯ম খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগ।

অভিনয়দর্পণ—অভিনয় সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্যবিষয় সম্বলিত একটি গ্রন্থ। এর তেরটি খণ্ড। এটি সম্ভবত নন্দিকেশ্বর-রচিত ভারতার্ণব গ্রন্থের অংশ।

আর্য-সপ্তশতী—গোবর্দ্ধনরচিত (১২ খৃঃ) একটি গীতি-কাব্য। এতে শৃঙ্গার রসাত্মক ৭০০টি শ্লোক আছে।

উজ্জ্বলনীলমণি—রূপ গোস্বামী রচিত অলঙ্কার গ্রন্থ (খৃঃ ১৪৯০-১৫৬৩)। এখানকার সমস্ত শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে লিখিত।

একাবলী—বিদ্যাধররচিত (১৫০ খৃঃ) একটি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ। মম্মটের কাব্যপ্রকাশের অনুসরণে এটি লিখিত।

কাব্যপ্রকাশ—মম্মটভট্টরচিত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (১১০০ খৃঃ)। এখানে গুণ ও অলংকার প্রধানভাবে আলোচিত।

কাব্যমীমাংসা—রাজশেখররচিত অলংকার শাস্ত্র গ্রন্থ (৯ম খৃঃ)।

কথাসরিৎসাগর—বাইশহাজার শ্লোকের একটি বিরাট গল্পগ্রন্থ। এতে রূপকথা শ্রেণীর বহু কাহিনী আছে। এর ১২৪টি তরঙ্গ। গুণাঢ্যের বৃহৎকথা গ্রন্থটির উৎস। কাশ্মীরী কবি সোমদেব এর রচয়িতা। তাঁর সময় ১০৩০ খৃষ্টাব্দ।

কাব্যাদর্শ—দণ্ডীরচিত একটি অলংকার গ্রন্থ। এতে প্রাচীন অলংকার মত লিপিবদ্ধ আছে। সময়—ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দ।

কর্ণসুন্দরী—সংস্কৃত ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য। কাশ্মীরের রাজশক্তির উত্থান-পতনের ইতিহাস এতে বিধৃত আছে। কাশ্মীরবাসী বিল্‌হন (১১০০ খৃষ্টাব্দে) গ্রন্থটির রচয়িতা।

কবিরহস্য—হলায়ূধ রচিত (১১০০ খৃষ্টাব্দে) একটি কাব্য-গ্রন্থ। এটি ভট্টিকাব্যের আদর্শে ব্যাকরণের সূত্রের উদাহরণ দেখাবার উদ্দেশ্যে লিখিত।

কৃষ্ণকর্ণামৃত—শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বনে কৃষ্ণলীলাশুক-রচিত একটি গীতিকাব্য।

চরক-সংহিতা—মহারাজ কণিষ্কের রাজবৈদ্য চরকের লিখিত আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ। আনুমানিক সময়—প্রথম শতাব্দী।

ছন্দোবিচিতি—দণ্ডীর রচিত বলে পরিচিত সংস্কৃত ছন্দ-বিষয়ক একটি গ্রন্থ।

দশরূপক—ধনঞ্জয়-রচিত (১০ম শতাব্দী) দশটি রূপকবিষয়ক আলোচনা গ্রন্থ।

দায়ভাগ—যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি অবলম্বনে জিমূতবাহন রচিত ধর্মরত্ন গ্রন্থের একটি অধ্যায়। এটি বাংলাদেশে প্রচলিত উত্তরাধিকার আইনের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। জীমূতবাহনের অবির্ভাব কাল একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে বলে মনে করা হয়। এই গ্রন্থের মতে সম্পত্তিতে পিতার অধিকার না গেলে পুত্রের অধিকার জন্মায় না।

নিরুক্ত—যাস্করচিত বেদের প্রাচানতম টীকা-গ্রন্থ। নিঘণ্টুর অর্থাৎ বেদের দুরূহ অপ্রচলিত শব্দের ব্যাখ্যা এর উদ্দেশ্য। বেদের এক একটি শব্দের অনেক প্রতিশব্দ রয়েছে এখানে। আনুমানিক সময় খৃঃ পূ—পঞ্চম শতক।

নাট্যশাস্ত্র—মহামুনি-ভরতরচিত নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রাচীনতম গ্রন্থ। এঁকে সংস্কৃত নাটকের জনক বলা হয়। গ্রন্থটিতে সাহিত্যতত্ত্ব, অলংকার, নাট্যরচনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্রহ্মসূত্র—মহর্ষি-বাদরায়ণরচিত বেদান্তদর্শন গ্রন্থ। আচার্য শঙ্কর (৭৮৮ খৃঃ) এর প্রধান ভাষ্যকার।

ভোজপ্রবন্ধ—বল্লাল সেন রচিত একটি চম্পূকাব্য। এটি ভোজরাজ সম্বন্ধে কতকগুলি কাহিনীর সংকলন।

মহিম্নস্তব—শিব ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত কতকগুলি স্তোত্রের সংকলন। শ্লোকগুলি গীতিধর্মী ও উচ্চশ্রেণীর কাব্যগুণমণ্ডিত। পুষ্পদন্ত (৯ম শতাব্দী) গ্রন্থটির রচয়িতা বলে মনে করা হয়।

মহানাটকম্—দামোদর মিশ্র রচিত চোদ্দ অংকের একটি

নাটক, এর অন্য নাম হনুমান্ নাটক। দামোদর মিশ্রের সময় ১১.শ শতাব্দী। হনুমানের সঙ্গে রামের সম্বন্ধ ও তার কার্যাবলী বর্ণনা নাটকটির মূল বিষয়। এটি উচ্চশ্রেণীর রচনা নয়।

মহাভাষ্য—পতঞ্জলি-রচিত পাণিনিকৃত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের মহাভাষ্য। ইনিই যোগসূত্র রচয়িতা কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা আছে।

মিতাক্ষরা—বিজ্ঞানেশ্বরকৃত (১১০০ খৃঃ অঃ) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রসিদ্ধ টীকা। বাংলাদেশ ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে এই মত প্রচলিত।

রাঘবপাণ্ডবীয়—কবিরাজ-রচিত (৮০৩ খৃঃ অঃ) একটি কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে কবি অতিশয় কৃত্রিমভাবে দ্ব্যর্থক পদপ্রয়োগে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

রোমকসিদ্ধান্ত—আর্যভট্টের চেয়েও প্রাচীন কোন জ্যোতির্বিদের রচিত জ্যোতিঃশাস্ত্রের একটি গ্রন্থ। এটি গ্রীক্ প্রভাবিত বলা হয়। আনুমানিক সময় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে।

সাহিত্যদর্পণ—বিশ্বনাথ রচিত (চতুর্দশ শতক) অলংকার-শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। রস, অলংকার, দোষ, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে এখানে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। মম্মটের কাব্যপ্রকাশের অনেক মত এখানে অনুসৃত আবার অনেক বিষয়ে ঐ মতের সমালোচনা করে নতুন কথা বলা হয়েছে।

সঙ্গীত-রত্নাকর—শার্ঙ্গদেবরচিত বিখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্র। প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে এখানে বহু তথ্য জানা যায়।

গ্রন্থটি লেখকের সঙ্গীতশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। সময়—দ্বাদশতক।

সঙ্গীতদামোদর—সঙ্গীতবিদ্যার আর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। লেখক শুভঙ্কর এখানে সাতটি অধ্যায়ে নৃত্য ও সঙ্গীত বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আনুমানিক সময়—খৃঃ পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দী।

শ্রীকণ্ঠচরিত—মঙখরচিত পঁচিশ সর্গের একটি বিরাট কাব্যগ্রন্থ। শ্রীকণ্ঠকর্ত্তৃক ত্রিপুরাসুরবধের কাহিনী কাব্যটির মূল বিষয়। সময়—খৃঃ দ্বাদশ শতক।

সুপর্ণাখ্যান—সর্পজননী কদ্রু ও পক্ষীজননী বিনতার পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত কতকগুলি গাথার সঙ্কলন। গরুড়ের সঙ্গে সর্পজাতির বিরোধের কাহিনী এর মূল বিষয়। এটি পরবর্ত্তীকালের বৈদিক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

সূর্যসিদ্ধান্ত—জ্যোতিঃশাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীনগ্রন্থ। এখানে আর্যভট্ট জ্যোতির্বিদ্যার মূল তত্ত্বগুলি সংক্ষেপিত করেছেন ও তিনি প্রথম ঘোষণা করেন পৃথিবী সূর্য প্রদক্ষিণ করে এবং তিনি সূর্যগ্রহণের কারণ বিশ্লেষণ করেন।

—গ্রন্থকার—

আনন্দবর্দ্ধন—(৯ম শতাব্দী) ধ্বন্যালোক নামে অলংকার শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থপ্রণেতা। তাঁর মতে কাব্যের আত্মা ধ্বনি বা গূঢ়ার্থ।

কুন্তক—বক্রোক্তিজীবিত নামে একটি অলংকার গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি আলংকারিক ভামহের মতানুসারী। তাঁর মতে বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণসত্তা।

কাত্যায়ন—সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে কাত্যায়নের নাম সুপরিচিত। তিনি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের বার্ত্তিকসূত্র রচনা করেন। তা ছাড়া তাঁর নামে শ্রৌতসূত্র, শুল্বসূত্র প্রচলিত আছে।

বৎসভট্টি—দশপুরে সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে লিখিত ৪৪টি শ্লোকের একটি প্রশস্তি এঁর রচনা বলে পরিচিত। এই লেখার ওপর কালিদাসের প্রভাব পড়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

বাৎসায়ন—কামসূত্র নামক গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি কালিদাসের পূর্ববর্ত্তী বলা হয়।

ভামহ—(৭ম শতক) কাব্যালংকার নামে অলংকার গ্রন্থ রচয়িতা।

ভোজ—ধারারাজ, ১১ শতকের লোক। ইনি প্রায় আশীটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এঁর সরস্বতী কণ্ঠাভরণ ও শৃঙ্গারপ্রকাশ নামে দুটি অলংকারশাস্ত্র গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ।

মাধ্বাচার্য—রাজা বুক্কের মন্ত্রী ও বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্যের জ্যেষ্ঠ সহোদর। এঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি সায়ণের লেখার সংশোধন ও পরিমার্জন করেন। সায়ণের বহু রচনা জ্যেষ্ঠের নামে উৎসর্গীকৃত মাধ্বীয় নামে পরিচিত।

মল্লীনাথ—বহু শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বহুগ্রন্থের বিশেষ ভাবে কাব্যের টীকা রচনা করে সাধারণ পাঠকের কাছে সংস্কৃতগ্রন্থগুলি সুবোধ্য করে দিয়েছেন। ইনি মাদ্রাজের তেলিঙ্গানা জেলার কোলাচল ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। এঁর আনুমানিক সময় পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দ। তাঁর রচিত রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ভট্টিকাব্য, শিশুপালবধের টীকা ও অলংকার গ্রন্থ 'একাবলী' প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। ছয়টি দর্শনশাস্ত্রেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল।

জগন্নাথ—(১৭ শতক) রসগঙ্গাধর নামে অলংকারগ্রন্থ প্রণেতা। এখানে বিস্তৃতভাবে অলংকার আলোচিত।

বোপদেব—(১৩শ শতক) মুগ্ধবোধ নামে ব্যাকরণ রচনা করেন। ইনি সর্ববিষয়ে পাণিনিকে অনুসরণ করেন নি।

মেধাতিথি—মনুসংহিতার প্রাচীনতম ভাষ্যকার। আনুমানিক আবির্ভাব কাল—নবম খৃষ্টাব্দ।

রুদ্রভট্ট—শৃঙ্গারতিলক নামে একটি খণ্ডকাব্য রচনা করেন। সময় ১১শ শতক।

রামানন্দ—খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে আবির্ভূত একজন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক। তাঁর মতে রাম বিষ্ণুর অবতার।

রামানুজ—দ্বাদশ শতাব্দীর একজন শাক্ত বৈষ্ণব। শঙ্করাচার্যের পর তাঁর রচিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বিখ্যাত।

শঙ্করাচার্য—সর্বশ্রেষ্ঠ বেদান্তবাদী। তাঁর জন্ম সময়—৭৪৪ খৃষ্টাব্দ। তিনি মায়াবাদ প্রচার করেন। ব্রহ্মসূত্রের ওপর তাঁর বিখ্যাত ভাষ্য রচনা করেন ৮০৪ খৃষ্টাব্দে।

সায়ণাচার্য—বেদের ভাষ্য রচয়িতা ও মাধবাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এঁরা ছিলেন বিজয়নগরবাসী।

হরিষেণ—গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির রচয়িতা। প্রশস্তিটি কাব্যগুণসমৃদ্ধ। আনুমানিক সময়—৩৫০ খৃষ্টাব্দ।

হাল—'সত্তসঈ' নামে ৭০০ শ্লোকবিশিষ্ট একটি প্রাকৃত কাব্য এঁর রচনা বলে পরিচিত। অনেকে মনে করেন—ইনি ১ম বা ২য় খৃষ্টাব্দের আবির্ভূত সাতবাহন রাজ। হালের রচিত এই কাব্য গ্রন্থটি বহু সংস্কৃত গীতিকাব্যের আদর্শ।
